প্রতিবিম্ব

গার্হস্থ্য উপন্যাস।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা
৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড্ সন্ এর পুস্তকালয় হইতে,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৫।

All rights reserved.

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা

Printed by Satish Chandra Roy,
at the Jagat Art Press, Dacca.

উৎসর্গ পত্র।

জননীর সুসন্তান,

সরল, অমায়িক, সাহিত্যানুরাগী, সুকবি,

স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু চিত্তরঞ্জন দাশ মহোদয়ের

করকমলে,

এই গ্রন্থখানি

ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ,

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

আমরা সদা সর্ব্বদাই শক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত। সেই শক্তির প্রধানতঃ তিন চরিত্র,—মহাকালী চরিত্র, মহালক্ষ্মী চরিত্র ও মহাসরস্বতী চরিত্র। শক্তির এই তিন চরিত্র শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রথম চরিতের, মধ্যম চরিতের ও উত্তর চরিতের দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—প্রথম চরিতস্য মহাকালী দেবতা, মধ্যম চরিতস্য মহালক্ষ্মীঃ দেবতা, উত্তর চরিতস্য মহাসরস্বতী দেবতা। এই শক্তি চরিত্র যেমন তিন প্রকার ইহার কর্ম্ম বা Characteristicsও তেমনি ত্রিবিধ। সুতরাং জীব যখন শক্তির যে চরিত্রে সঞ্চালিত হয়, তাহার কর্ম্মও তদনুরূপই সংঘটিত হইয়া থাকে। কারণ জীবচরিত্র এই শক্তি চরিত্রেরই অভিব্যক্তি মাত্র।

এই শক্তি চরিত্রে (বা Guiding spirit এ) সঞ্চালিত হইয়া মানব সম্প্রদায় মধ্যে কিরূপে বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া কিরূপে উহা আবার ভাবী মিলনের মঙ্গলময় ফলে পরিণত হইবে, তাহাই উপস্থিত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। কার্য্য যেমন জটিল, তেমনই সূক্ষ্ম। তবে, সূক্ষ্ম হইলেও ইহা হিন্দু শাস্ত্রের অতি পুরাতন ও অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়। তাই, স্বকীয় জ্ঞানবুদ্ধির ন্যূনতা সম্যক্ বিদিত থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত গ্রন্থ প্রণয়নে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুধীবৃন্দের বিচার সাপেক্ষ। তবে, উপস্থিত গ্রন্থ পাঠে যদি একটী হৃদয়ও প্রকৃতির লীলা মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, যদি একটী হৃদয়কেও ইহা আত্মদর্শন বা Self realisation এর পক্ষে কিঞ্চিৎ সহায়তা করে, তবেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি।

প্রতিবিম্ব

অবতরণিকা।

দুই ভাই।

দেখো যেন মনে থাকে।

'আর শুনেছ, বড় দাদা?'

'কি শুন্‌বো, ভাই!'

বৈশাখ মাস। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইযাছে। বিষ্ণুপুর সেনবাড়ীর বাবুদের বৈঠকখানায় ফরাসের উপর স্ফটিকাধারে একটি আলো জ্বলিতেছে। আলোক সন্নিধানে একজন যুবক উপবিষ্ট হইয়া অনেকক্ষণ যাবৎ জমিদারী সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র পাঠ করিতেছেন। যুবকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর, নাম রজনীকান্ত। রজনীকান্ত পাঠ কার্য্য সমাধা করিয়া কেবল সেই স্থান হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় কি এক প্রসঙ্গ লইয়া

হাসিতে হাসিতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবোধচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। সুবোধচন্দ্র, রজনীকান্ত অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট, বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র। সুবোধচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, 'সবাই শুনেছে আর তুমি শুন্‌তে পাওনি, দাদা! সে ভারি আশ্চর্য্য।

রজনী। কি আশ্চর্য্য, সুবু? (রজনীকান্ত আদর করিয়া সুবোধ চন্দ্রকে 'সুবু' সম্বোধন করিতেন।)

সুবো। এই ঘোষেরা তিন ভাইয়ে পৃথগন্ন হওয়ার জন্য কি কাণ্ডটাই না করলে। কি বল্‌বো, দাদা! শুন্‌লে তুমি বিশ্বাস করবে না। মায়ের পেটের ভাই, তাদের মধ্যে কি ভযানক ভাব। কেহ কাহারো সঙ্গে কথা বলে না। যেন একজন অপরের পরম শত্রু।

রজনীকান্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতার বালসুলভ সরলতাব্যঞ্জক কথাগুলি শুনিয়া স্নেহভরে কিয়ৎকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতার বর্ণিত ঘটনা তাঁহার নিকট বিশেষ কিছু আশ্চয্য জনক বলিয়া বোধ হইল না। তিনি ঈষৎ হাস্য করতঃ বলিলেন 'এই কথা, এরই জন্য এত!'

সুবোধচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার কথা শুনিয়া নিরতিশয় আশ্চর্য্যবোধ করিবেন। সুতরাং রজনীকান্তের কথায় সেরূপ ভাব প্রকাশ না হওয়াতে তিনি একটু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, 'তুমি কি ইহা আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে কর না, দাদা?'

রজনী। যাহা প্রতিদিন প্রতি পরিবারে সংঘটিত হইতেছে তাহা আর এখন আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয় না।

সুবো। সে কি! তবে কি প্রত্যেক পরিবারেই ওরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে?

রজনী। সুবু! আজিও তুমি বালক। তোমার বুদ্ধি এখনও ততদূর পরিপক্ক হয় নাই যে উপস্থিত প্রসঙ্গ বুঝিতে পার। কিন্তু তুমি দার পরিগ্রহ করিয়াছ। সুতরাং একরূপ সংসারী। সংসার সম্বন্ধে এখন তোমাব কিছু জ্ঞানলাভ করা নিতান্ত অন্যায় নহে।

সুবো। কৈ, পূর্ব্বে তো তুমি আমাকে এ বিষয়ে কিছু বল নাই।

রজনী। মনে করিয়াছিলাম পাঠ্যাবস্থায় সাংসারিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে পাঠের বিঘ্ন জন্মিবে। কিন্তু যে সমাজে শৈশবাবস্থাতেই সংসারে জড়ীভুত হইতে হয়, সেইস্থলে সংসার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিলে অনিষ্ট সংঘটন আশ্চর্য্য নহে। তাই উপস্থিত প্রসঙ্গ উপলক্ষে তোমাকে গুটীকতক কথা বলিতে হইতেছে।

সুবোধচন্দ্র এক দৃষ্টিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রজনীকান্ত বলিলেন, 'ভাল, যাহাদিগকে বিবাদ বিসংবাদ করিতে বা পৃথগন্ন হইতে দেখিযা তুমি এতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ, তাঁহাদেব মধ্যে কি কখনও সদ্ভাব ছিল না? তোমার কি মনে হয়?

সুবো। থাকিলেও, যেরূপ থাকা উচিত, বোধ হয় সেরূপ ছিল না।

রজনী। না, এইটী তোমার ভ্রম। এক রক্ত মাংসে বর্দ্ধিত হইয়া, এক মাতৃস্তন্যে জীবনধারণ করিযা, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সদ্ভাব ব্যতীত অসদ্ভাব নিতান্তই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবে যে অধিকাংশ স্থলেই অন্যরূপ ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা কুশিক্ষার কুফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নানারূপ সুশিক্ষা প্রদান করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানার্জ্জনে অমনোযোগী হইলে বা শৈথিল্য প্রকাশ করিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বস্তুতঃই মর্ম্মাহত হইয়া তৎপ্রতিবিধানে যত্নবান্ হয়েন। আবার কালে হয়তো সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পুনরায় সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার

সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। তুমি আজ যে ঘোষেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছ, ইহারাও হয়তো সময়ে একে অন্যের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিত। কেন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিবে, তাহা আমরাও আজ যে প্রকার ধারণা করিতে পারিতেছি না, সেই প্রকার উহারাও হয়তো কোন দিন তাহা ধারণা করিতে পারিত না। উহারা ভ্রাতায় ভ্রাতায় পৃথগন্ন হইয়াছে, বা কলহ করিতেছে বলিয়া আজ আমরাও যেই প্রকার উহাদিগকে উপহাস করিতেছি, উহারাও হয়তো সেইপ্রকার কতবার কত পরিবারে ভ্রাতৃবিরোধ দেখিয়া কত জনকে উপহাস করিয়াছে। আমরা পরস্পর পরস্পরকে যেরূপ স্নেহ করি ও ভালবাসি, উহারাও হয়তো পরস্পর পরস্পরকে সেইরূপ স্নেহ করিত ও ভালবাসিত। এইরূপ অধিকাংশ স্থলে।

সুবোধচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। তৎপর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রত্যেক স্থলেই যদি প্রথমে সদ্ভাব থাকে, তবে কেন এমন হয়?'

রজনীকান্ত বলিলেন, "তোমার প্রশ্নটি যত সহজ উত্তর তত সহজ নহে। সংযোগ, বিয়োগ—বিচ্ছেদ, মিলন—আকুঞ্চন, প্রসরণ সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য। যে কারণে কোন সমাজ বা সম্প্রদায় মধ্যে মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটে, আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যেও ঠিক সেই কারণেই পরস্পর মধ্যে সংযোগ বিয়োগ সংঘটিত হইয়া থাকে। ব্যষ্টি নিয়াই সমষ্টি। তবে, আজকাল বিচ্ছেদ বা বিয়োগের কার্য্যই সমাজে সমধিক প্রসার লাভ করিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে যত অধিক বিজাতীয় হাবভাব, রীতি নীতি প্রবেশ করিতেছে, প্রাচীন হিন্দুসমাজ ততোধিক বিধ্বস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। সমাজের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখিতে পাইবে,

যে পরিবারে ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি বহুলোকে চিরকাল একান্নবর্ত্তী থাকিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়া দেশের ও সমাজের উন্নতি বিধান করিয়া গিয়াছেন, সেই পরিবারে আর দুটী ভাই একত্র থাকিতে পারিতেছেন না। বৃদ্ধেরা 'আজ কালের ছেলেপেলেগুলি সব হলো কি' বলিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছেন। বৃদ্ধারা 'আজ কালের বউ ঝিরা আর ঘর গৃহস্থালীতে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছে না' বলিয়া মাথা কুটিয়া মরিতেছেন, কিন্তু সে কথা শুনে কে? শিক্ষিত সমাজ, সভ্য সমাজ, তাহা বুড়া বুড়ীদের প্রলাপ বাক্য বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। কিন্তু উহা সত্য সত্যই কি বুড়া বুড়ীদের প্রলাপ বাক্য? উহার তাৎপর্য্য কি কিছুই নাই? স্থূল কথা এই যে, নবীন সমাজ আর প্রাচীন সমাজের সহিত মিশিতেছে না। এ শিক্ষা অপূর্ণভাবে সমাজ শরীরে যত অধিক প্রবেশ করিতেছে, আমাদের সামাজিক বন্ধন তত অধিক শিথিল হইয়া পড়িতেছে, আমরা ততোধিক পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িতেছি। তবে এই শিক্ষার মধ্য দিয়াই আমাদিগকে মিলনের রাজ্যে পৌহুঁছিতে হইবে। এই ভগ্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড দ্বারাই আবার হিন্দু সমাজের দৃঢ় ভিত্তি সুগঠিত করিতে হইবে। এমন কি, এই ইংরেজী শিক্ষা দ্বারা ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের ঐকান্তিক মিলন হইতেই জগতের মহাকল্যাণ সংসাধিত হইবে।"

এইরূপ ভ্রাতৃবিচ্ছেদের প্রসঙ্গ লইয়া যখন উভয় ভ্রাতা আন্দোলন করিতেছিলেন, তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। বাবুদের বৈঠকখানার অনতিদূরে একটী গোলাপ বৃক্ষে দুইটী গোলাপ পাশাপাশি ফুটিয়া বড়ই সুন্দর শোভা প্রকটিত করিতেছিল। রজনীকান্ত ক্ষণকাল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

'সুবু! ঐ দেখ এক বৃক্ষে দুইটী গোলাপ পাশাপাশি ফুটিয়া কি সুন্দর শোভা প্রকটন করিতেছে, সমীরণ যখন একটিকে অন্যটির নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া লইতেছে, তখন আর তত সুন্দর দেখাইতেছে না। যাহা প্রকৃতিতে সুন্দর, তাহাই সুখপ্রদ। তবে আমরা দুটী ভাই, এক মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথক্ হইয়া কেন অসুখী হইব? পক্ষান্তরে একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবার যে কিরূপ সুখসম্পদপূর্ণ শান্তির নিকেতন হইতে পারে আমরা তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিব।'

সুবোধচন্দ্র ছল ছল নেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন,

'তা দাদা! দেখো যেন মনে থাকে।'

রজনীকান্ত কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বাহিরে এক পাগলিনী আসিয়া 'হাঃ হাঃ" রবে অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। সুবোধ-চন্দ্র ও রজনীকান্ত চকিত নেত্রে সেই দিকে দৃষ্টি করিলেন। পাগলিনী ইত্যবসরে করতালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,

'শক্তির শক্তি, রোধ্‌বে তুমি,
এম্‌নি মস্ত বীর,
কার ইঙ্গিতে ঘুরছ, যাদু,
নাইকো মতি স্থির।'
অহংভাবে, বুদ্ধির দোষে,
বল্‌ছ যাহা তা,
হাসি এলো, হাসি এলো,
হাঃ হাঃ হাঃ!!'

———०———

প্রথম খণ্ড।

প্রতিবিম্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্নেহের মহিমা।

যশোহর জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর একখানা ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে ভৈরবী নদী ঈষৎ বক্রভাবে প্রবাহিতা। এই গ্রামে অন্যূন পঁচিশ ত্রিশ ঘর বৈদ্য সন্তানের বাস। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেই একটী নূতন মঠ দৃষ্টিগোচর হয়। এই মঠ রমাপ্রসাদ সেন নামক জনৈক মধ্যবিত্ত তালুকদার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ী সেনবাড়ী বলিয়াই বিখ্যাত। সেন মহাশয়ের তালুকদারীর বাৎসরিক আয় প্রায় দুই হাজার টাকা। তাঁহার বাড়ী তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বাহির বাড়ী, দ্বিতীয় খণ্ডে অন্দর বাড়ী, তৃতীয় খণ্ডে পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চারিদিকে নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষ।

আমরা যেই সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় রমাপ্রসাদ বাবু ও তাঁহার পত্নী কমলকামিনী উভয়েই জীবনের শেষ দশায় উপনীত

হইয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবুর কন্যা গিরিজাসুন্দরীর বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ পুত্র রজনীকান্তের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর। কনিষ্ঠ পুত্র সুবোধচন্দ্র ত্রয়োদশ বৎসরের নাবালক। জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ প্রভাবতী বিংশতি বর্ষীয়া যুবতী। কনিষ্ঠ পুত্রবধূ হেমলতা একাদশ বর্ষীয়া বালিকা গিরিজাসুন্দরীর পুত্র ও কন্যা. নরেন্দ্র ও চারুবালার বয়ঃক্রম যথাক্রমে দেড় বৎসর ও দুই মাস মাত্র। প্রায় ছয় মাস হইল গিরিজাসুন্দরীর বৈধব্য দশা সংঘটিত হইয়াছে। রজনীকান্তের একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। নাম যতীশচন্দ্র ও ক্ষেমদা। যতীশচন্দ্র সপ্তম বৎসরের বালক। ক্ষেমদা পঞ্চম বৎসরের বালিকা। পিতার বার্দ্ধক্য নিবন্ধন রজনীকান্ত এখন বিষয়াদি সংরক্ষণ করিতেছেন। সুবোধচন্দ্র এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা অধ্যয়ন করিয়া, কিছুকাল যাবৎ কলিকাতায় থাকিয়া প্রচলিত প্রথা অনুসারে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। রজনীকান্ত কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একজন বিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী লোক ছিলেন। সামাজিক রীতি নীতি এবং লোকচরিত্রে তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ইংরেজী ও কিছু সংস্কৃত জানিতেন এবং স্ত্রীচরিত্র পর্য্যালোচনা সময়ে প্রায়ই বলিতেন,'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু খলজনেষু চ'।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বৃদ্ধ রমাপ্রসাদ জ্বরোগে একরূপ অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া অনেকক্ষণ পর এই মাত্র শয্যার উপর একটু উঠিয়া বসিয়াছেন। প্রায় মাসাধিক কাল অবধি সেন মহাশয় জ্বররোগে পীড়িত থাকিয়া মধ্যে কতিপয় দিবস কিঞ্চিৎ সুস্থ ছিলেন কিন্তু এইক্ষণ পুনরায় পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি যার পর নাই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তদ্দর্শনে বৃদ্ধের আত্মীয় স্বজন এমন কি চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত

বৃদ্ধের প্রাণরক্ষায় সন্দিহান হইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। বৃদ্ধের পীড়ার প্রারম্ভেই সুবোধচন্দ্র ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন এবং উভয় ভ্রাতা মিলিয়া পীড়িত পিতার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। গিন্নি কমলকামিনী বৃদ্ধের পীড়ার সূত্রপাত হইতেই একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। এখন তিনি সর্ব্বদাই বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকেন এবং বৃদ্ধকে কিঞ্চিৎ সুস্থ না দেখিলে তিনি কখনই তাঁহাকে ফেলিয়া অন্যত্র গমন করেন না। এইক্ষণ জ্বরের প্রকোপ অনেক পরিমাণে উপশম হওয়াতে এবং পীড়িত পতিকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া গিন্নি অনেক্ষণ পর বাহিরে আসিলেন এবং এদিক্ ওদিক্ কাহাকে অনুসন্ধান করিয়া গিরিজাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'গিরি! গিরি!—অ গিরিজা!' 'কেন মা! যাই মা!' বলিয়া গিরিজাসুন্দরী রন্ধন গৃহ হইতে ধীরে ধীরে আসিয়া মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। গিন্নি তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি রান্নাঘরে কি কচ্ছিলে, মা!'

গিরি। রাঁধ্‌ছিলুম।

গিন্নি। সে কি মা! তুমি বিধবামানুষ প্রায়ই মাছের ঘরে রাঁধতে যাও। বড় বউ মা কোথায়?

গিরি। তার অসুখ করেছে।

গিন্নি। কি অসুখ মা! এ বেলা খাবে কি?

গিরি। জানি নে।

গিরিজাসুন্দরীর কথা শুনিয়া গিন্নি ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। তৎপর বলিলেন, 'হাঁ মা! আমি এখন বুঝ্‌তে পেরেছি। গৃহস্থের ঘরের কাজ কর্ম্ম রান্নাবাড়া কত্তে হলেই ওর ব্যামো হয়। এতো ভাল নয় মা! এ তো ভাল নয়।'

এই বলিয়া গিন্নি কমলকামিনী পুত্রবধূ যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন ধীরে ধীরে সেই গৃহাভিমুখে চলিলেন। গিরিজাসুন্দরীও জননীকে অনুসরণ করিলেন।

প্রায় নয় বৎসর হইল প্রভাবতীর বিবাহ হইয়াছে। বিবাহান্তে স্বামিগৃহে আসিয়া প্রভাবতী প্রথম প্রথম শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিতেন না। একে নূতন বউ, তাহাতে সংসারে একটী, তাহাতে নূতন গৃহে পদার্পণ করিয়াছে, ইহা ভাবিয়া গিন্নি কমলকামিনী প্রভাবতীর উপর বিশেষ কোন সাংসারিক কাজ কর্ম্মের ভার অর্পণ করিতেন না। অধিকন্তু নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া স্বীয় পতিপুত্রকে আহার করাইতে না পারিলে গিন্নি কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেন না। এমন কি,কার্য্যগতিকে দুই এক দিবস স্বয়ং রন্ধন করিতে না পারিলে তিনি মনে মনে যৎপরোনাস্তি কষ্টানুভব করিতেন এবং পতি ও পুত্রদিগের তৃপ্তিমত আহার হইল না বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিতেন। বিবাহের পূর্ব্বেও প্রভাবতী কোন প্রকার কাজ কর্ম্ম করিতেন না। তাঁহার মাতা তাঁহাকে কাজ কর্ম্ম করিতে বলিলে তিনি তাঁহাকে বেশ দু'চারি কথা শুনাইয়া দিতেন। এই জন্য স্বামিগৃহে আসিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে প্রভাবতীর বড়ই কষ্ট বোধ হইত। কিন্তু কি করিবেন, একে হিন্দুপরিবার, তাহাতে শাশুড়ী বৃদ্ধা, একেবারে মুখ ফুটিয়া অস্বীকার করিতেও পারেন না। তাই, আজ 'মাথা চন্ চন্' কাল, গা 'বমি বমি' পরশ্বঃ 'আঃ উহু পেট ব্যথায় গেলুমরে' ইত্যাদি প্রকারে পীড়ার ভাণ করিয়া মধ্যে মধ্যে গৃহকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতেন। ছোট বধূ হেমলতা গৃহে পদার্পণ করিবার পর প্রভাবতীর এই পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। হেমলতা সাংসারিক কাজ কর্ম্মে সাধ্যমত সাহায্য করিলেও তাঁহার দ্বারা তখনও প্রতিদিন এত লোকের

রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং যখন প্রভাবতী ঐরূপ কাতরতার ভাণ করিতেন, তখন গিরিজাসুন্দরীকেই অধিকাংশ সময়ে রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। ঐরূপে অনাথাকে মৎস্যাদি বিধবার অস্পৃশ্য বস্তু রন্ধন করিয়া অনেক দিবস রজনীযোগেও স্নান করিতে বাধ্য হইতে হইত। পক্ষান্তরে যেই দিবস তিনি দিবা-ভাগেও ওঘরে রন্ধন করিতেন, সেই দিবস স্নান আহ্নিক করতঃ নিজ হবিষ্যান্ন পাক করিয়া আহার করিতে বেলা প্রায়ই তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া যাইত। এই সমস্ত কারণ সত্বেও মাতৃ-আদর্শে গঠিতা গিরিজা-সুন্দরী কাজ কর্ম্ম করিতে কোনপ্রকার ঔদাস্য বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন না।

প্রভাবতীর ওরূপ আচরণে গিন্নি কমলকামিনী মনে মনে যার পর নাই কষ্ট অনুভব করিলেন কিন্তু ইহার জন্য তিনি প্রভাবতীকে কোন প্রকার দুর্ব্বাক্য না বলিয়া হিতোপদেশ দ্বারা তাঁহার স্বভাবের মলি-নতা দূর করিবার জন্য ধীরে ধীরে যাইয়া প্রভাবতীর শয্যাপার্শ্বে উপ-বেশন করিলেন। শাশুরীকে আগতা দেখিয়া 'মাগো—গেলুম গো' বলিয়া প্রভাবতী প্রতি মুহূর্ত্তে শয্যার উপর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গিন্নি তখন আদর করিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নেহজড়িতকণ্ঠে বলিলেন, 'দেখ মা! ব্যামো হয়েছে বলে, রাত দিন শুইয়ে থাক, গৃহস্থের কাজ কর্ম্মে হাত দেও না, এটা কি ভাল? তুমি হলে বড়, তোমারই ঘর, তোমারই সংসার তোমাকেই সব দিক্ দেখ্‌তে হয়। আমি বুড়ো হয়েছি, কদিনই বা বেঁচে থাক্‌বো। এখন কি আমার কাজকর্ম্ম করবার শক্তি আছে মা! কোথায় আমার সেবা কর্ব্বে, তা নয় আমাকে দিয়েই দাসীর মত খাটিয়ে নিচ্ছ। তোমার শ্বশুরের ব্যারাম, একদণ্ডের বিশ্বাস নাই। কোথায় তার

সেবা কর্ব্বে, তা না ক'রে এইরূপ আচরণ আরম্ভ করেছ। ছিঃ মা! আর এরূপ পাগলামি করো না, এখন থেকে ভাল হও।'

প্রভাবতী শাশুড়ীর কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে রহিলেন। তার পরে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, 'পোড়া যমেও যদি আমাকে নিত, তবু ভাল ছিল। এমনই অদৃষ্ট করেছি যে ব্যামো হলেও একদণ্ড সোয়াস্তি নাই'।

গিন্নি। ষাট্—ষাট্—যমে নেবে কেন বাছা! আমরা দশজন রয়েছি;—তোমার স্বামী রয়েছে—

প্রভাবতী পূর্ব্ববৎ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, 'আমার যদি কেউ দুঃখ বুঝ্‌তো, তা হলে আমার অদৃষ্ট এমন হবে কেন? ব্যামো দেখ্‌লে একটু দয়া না ক'রে থাক্‌তে পারতো না।'

গিন্নি। কৈ তোমার তো কোন ব্যামো দেখ্‌তে পাই নি মা! দিব্বি খাচ্ছ—দাচ্ছ—

শাশুড়ী আহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিলেন দেখিয়া প্রভাবতীর নিরতিশয় ক্রোধ জন্মিল। তিনি একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, 'এ দেশের কি রকম বিচার গো! খেলে দেলে বেদনা একটু কম হয়, তাই বলে কি খেতে নাই। বেদনায় কষ্ট পাই এই তো সকলের ইচ্ছা'।

প্রভাবতীর উক্তি শুনিয়া গিন্নি তাঁহার উপর যারপর নাই চটিয়া গেলেন। বলিলেন, 'তুমি ভেবেছ কি? তোমাকে যত বুঝাই, যত মিষ্টি কথা বলি, ততই তোমার নষ্টামি বেড়ে যাচ্ছে? তোমাকে আজও আবার বল্‌ছি, যদি ভাল চাও তবে গৃহস্থের কাজ কর্ম্ম রান্না বান্নায় মন দেও। নইলে রজনীকান্তকে সব কথা বলে দিব। সে অমন ছেলে নয়। একটু জান্‌তে পেলে, তোমার হাড়ে মাংসে আলাহেদা কর্ব্বে।'

প্রভাবতীর কখনও কটুকথা সহ্য হইত না। কেহ তাঁহাকে

কোনরূপ রূঢ় কথা বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ না করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। শাশুড়ীর কথার প্রত্যুত্তর তিনি তাঁহার মুখের উপরই শুনাইয়া দিলেন। বলিলেন, 'তা ছেলেকে কাণমন্ত্র দিলেই হয়। দিয়ে যে যা কর্ত্তে পারে করুন না কেন? না করে যদি জলগ্রহণ করে, তবে ছেলের মাথা খায়। আমার বাপ মা তো আমাকে বেচে খায় নি, যে আমি দাসীর মত খাটবো, আর এক মুঠো ভাত খাব।'

যে পুত্রের স্নেহবশবর্ত্তী হওয়াতে প্রভাবতী তাহার নিকট স্নেহের পাত্রী হইয়াছেন, প্রভাবতী সেই পুত্রকে লক্ষ্য করিয়াই ওরূপ ভাবে উক্তি করিতেছেন শুনিয়া গিন্নি মর্ম্মস্থলে বড়ই গুরুতর ব্যথা পাইলেন। কিন্তু পুত্রবধূকে আর বিশেষ কিছু বলিতে তাঁহার ভরসা হইল না। তিনি নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। নিজ পুত্রবধূ ওরূপ বলিয়াছেন, ইহা অন্য কাহারও নিকট বলিবার নহে। এরূপ স্থলে, স্ত্রীলোকের সান্ত্বনা একমাত্র স্বামী। কিন্তু সেই স্বামী এখন রোগগ্রস্ত। যদি রমাপ্রসাদ বাবু এখন সুস্থ থাকিতেন, তবে হয়তো গিন্নি তাঁহার নিকট হৃদয়ের কপাট খুলিয়া তাঁহাকে দুঃখের অংশী করিয়া স্বীয় মনঃকষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব করিয়া আসিতেন; কিন্তু তাঁহার পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে এই সমস্ত বলিয়া যন্ত্রণা দিতে গিন্নি যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। অথচ, অসহ্য হৃদয়াবেগে তিনি বারাণ্ডার একপ্রান্তে বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পর রজনীকান্ত কার্য্যগতিকে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জননীকে বারাণ্ডার একপ্রান্তে বসিয়া রোদন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন, মা?'

'না বাছা' বলিয়া গিন্নি অঞ্চল দ্বারা স্বীয় চক্ষু মুছিয়া লইলেন। রজনীকান্ত পুনরায় বলিলেন,

'বাবা তো এখন দিব্বি একটু ভাল আছেন, তবে তুমি ওরূপ করছ কেন, মা!'

প্রিয় পুত্রের প্রিয় সম্ভাষণে বৃদ্ধার হৃদয়ে তাড়িত প্রবাহ ছুটিল। যে পুত্রের বধূ তাঁহার এইরূপ মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছেন সেই পুত্রের এইরূপ কাতরতাব্যঞ্জক বিনীত বচনে বৃদ্ধা সত্য সত্যই বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভাবতী-ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে পুত্রের নিকট প্রকাশ করিয়া অঞ্চল দ্বারা স্বীয় চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। রজনীকান্ত অত্যন্ত পিতৃমাতৃ-ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার অসাবধানতায় তাঁহার গর্ভধারিণী এরূপ যন্ত্রণা পাইয়াছেন ভাবিয়া রজনীকান্ত লজ্জায় ও ক্ষোভে একেবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। কিন্তু জননীকে তখন আর কোন প্রকার সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা না করিয়া তিনি বরাবর নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং পত্নীকে নিজ ব্যবহারের দরুণ যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে সেই মুহূর্ত্তেই জননীর পাদস্পর্শ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। প্রভাবতী স্বামীর নিকট কি বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কিন্তু বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। রজনীকান্তের ভ্রুকুটীও আরক্তলোচন দেখিয়া প্রভাবতী কোন কথাই বলিতে সাহস পাইলেন না। তাঁহাকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তদ্দণ্ডেই রজনীকান্তের হুকুম তামিল করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রভাবতী রোগশয্যা পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন এবং যেই স্থানে শাশুড়ী বসিয়াছিলেন ধীরে ধীরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দুই হস্তে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া জড়িত

কণ্ঠে বলিলেন, 'মা! আমার অপরাধ হইয়াছে; আমাকে ক্ষমা কর।' পুত্রবধূর এইরূপ আচরণে মুহূর্ত্ত মধ্যে গিন্নির মনঃকষ্ট বিদূরিত হইল। তখন তিনি আদর করিয়া প্রভাবতীকে ক্রোড়ে বসাইয়া স্নেহভরে তাঁহার গায়ে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। হর্ষে দুঃখে আনন্দাশ্রু বৃদ্ধার গণ্ডস্থল বহিয়া ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং পুত্রের নিকট প্রভাবতীর বিষয়ে কোন কথা বলিয়া ভাল করেন নাই, না জানি, সে ইহার জন্য প্রভাবতীকে কত অধিক তিরস্কার করিয়াছে, ইহা ভাবিয়া গিন্নি যার পর নাই কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। আহা! স্নেহের কি অপার মহিমা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কুসুমে কীট

কুসুমকোরক ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া মন প্রাণ বিমোহিত করিল, জানিতে চাহি না উহাতে কীট আছে। যদি বা জানিতে পারিলাম তবু শীঘ্রই তাহা বিস্মৃত হইলাম। কারণ সে ধারণা আমাকে কষ্ট দেয়, আমি মানসিক সুখ হইতে বঞ্চিত হই। সান্ধ্য সমীর সৌরভ রাশি বিকীর্ণ করিয়া মৃদুল গতিতে প্রবাহিত হইতেছে, ভাবিতে চাহি না, উহা প্রভঞ্জনবেশ ধারণ করিবে। কারণ সে ধারণার সহিত আমার পর্ণ কুটীর পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যা প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনার কুটিল হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে আমি পর মুহূর্ত্তেই তাহা বিস্মৃত হইতেছি। কারণ তাহা না হইলে আমি সুখী হইতে পারি না। তাঁহার দোষ গুণের উপর আমার জীবনের সুখ দুঃখ অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। স্বার্থপরতা মানব প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, প্রাণ সুখের জন্য লালায়িত। এই স্বার্থপরতার জন্যই হউক বা এই সুখের জন্যই হউক আমরা

যাহাকে ভালবাসি তাঁহার দোষভাগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। সে সহস্র দোষে দোষী হইলেও আমরা অতি শীঘ্র তাহা ভুলিয়া যাই। রজনীকান্ত প্রভাবতীকে ভাল বাসিতেন তাই প্রভাবতীর দুর্ব্যবহারে রজনীকান্তের মনে যার পর নাই কষ্ট হইল— তিনি অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেখানে দুঃখ আছে, সেই খানেই দুঃখ নিবারণ করিবার ইচ্ছা আছে, হৃদয়ের কোন লুক্কায়িত প্রকোষ্ঠে সেই দুঃখাপনয়নের একটী অপরিজ্ঞাত আগ্রহ রহিয়াছে। সুতরাং প্রভাবতীর দুশ্চরিত্রের কথা ভুলিয়া যাইয়া আপনাকে সুখী করিতে যে রজনীকান্তের আগ্রহ হইতে পারে, তাহা অস্বাভাবিক নহে, কেননা এইখানে তাঁহার স্বার্থ রহিয়াছে।

রাত্রি দেড় প্রহর। প্রভাবতীর কঠোর চরিত্রের কথা ভুলিয়া যাইবার জন্য হৃদয়ের কোন নিভৃতকক্ষে একটী অজ্ঞাত ও অলক্ষিত বাসনা লইয়া রজনীকান্ত স্বগৃহে বসিয়া আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বন করিতেছেন। তাঁহার প্রাণ যেন মনের অজ্ঞাতসারে প্রভাবতীর দিকে ঢুলিয়া পড়িয়াছে কিন্তু রজনীকান্ত তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছেন না। প্রভাবতী নিতান্ত বিমর্ষমুখে শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া আছেন। কেহই কোন কথা কহিতেছেন না। কিয়ৎকাল পর রজনীকান্ত পত্নীকে বলিলেন, 'এ তোমার নিতান্ত অন্যায়। কোথায় নিজ ব্যবহারের দরুণ অনুতপ্ত হবে, তা নয় আবার অভিমান করে বসে আছ'।

প্রভাবতী কোন উত্তর না করিয়া স্বামীর দিকে পৃষ্ঠ দিয়া একটু ঘুরিয়া বসিলেন। রজনীকান্ত ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, তোমার স্বভাব দেখে বস্তুতঃই আমি মর্ম্মাহত হয়েছি। যে জননী আমাদের জন্য এত যত্ন এত কষ্ট স্বীকার করেন, তুমি কিনা অনায়াসে তাঁহাকে ওরূপ দুর্ব্বাক্য বল্লে ?'

এইবার প্রভাবতীর মুখ ফুটিল। তিনি মৃত্তিকার দিকে মুখ অবনত করিয়া বলিলেন, 'আমার ঘাড়ে মিছামিছি দোষ চাপালে আমি কি কর্ব্ব? আর তার জন্য আক্কেল দিতে তো কসুর কর নি। কেবল মার পিট বাকী। তাও যদি ইচ্ছা থাকে, না হয় এই বেলা করে নেও। যদি সত্যি সত্যি কোন দোষ থাক্‌তো, তা হলে না জানি কিই কর্ত্তে।' এই বলিয়া প্রভাবতী মুখে অঞ্চল দিয়া একবার স্বীয় চক্ষু মুছিয়া লইলেন। তদ্দর্শনে রজনীকান্তের একটু দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বলিলেন, 'কোথায় শাশুড়ীকে মান্য করিয়া চলিবে, তা নয় এই ব্যবহার। আচ্ছা, তোমার কার্য্যটা কি ভাল হইয়াছে, তা নিজেই একবার চিন্তা করে বল দেখি?'

প্রভা। অসুখ করেছে বলে দু'সন্ধ্যা রাঁধ্‌তে যাই নি, এইতো অপরাধ;

বলা বাহুল্য রজনীকান্ত প্রভাবতীর পীড়ার সংবাদ কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং তিনি বলিলেন, 'অসুখ করেছে—কৈ—আমিতো কিছু জানিনে।

প্রভা। তা জান্‌বে কেন? আর কারো জেনেই বা দরকার কি?' যার যার সময় মত আহার হলেই তো হলো। আমার জন্য কার কি মাথা ব্যথা।'

কোথায় প্রভাবতীর পীড়া হইলে রজনীকান্ত তজ্জন্য ভাবনায় অস্থির হইবেন তাহা না হইয়া তিনি তাঁহার পীড়ার সংবাদও অবগত নহেন, ইহা ভাবিয়া রজনীকান্ত নিজকে পত্নীর নিকট নিতান্ত অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। বলিলেন, 'আমায় কেউ না বল্লে আমি কি করে জান্‌বো। আর তুমিও তো তোমার পীড়ার সংবাদ আমাকে কিছু বল নি।'

প্রভা। বল্লে তোমার কষ্ট হতো বইত নয়, ঠাকুরের ব্যারাম তার জন্য ভাব্‌তে ভাব্‌তে একেবারে কি রকম হয়ে গেছ। তার মধ্যে আমার ব্যারামের কথা শুন্‌লে তুমি কি আর স্থির থাক্‌তে? নিজে কষ্ট পাই সেও ভাল, তোমার কষ্ট আমার সহ্য হয় না।

অশ্রুজলের সহিত মিশাইয়া প্রভাবতী এই কথাগুলি বলিলেন। সুতরাং রজনীকান্তের মনে বড়ই গুরুতর আঘাত লাগিল। কিন্তু প্রভাবতী তাঁহাকে এতদূর ভালবাসেন যে তাঁহার কষ্ট হইবে আশঙ্কায় প্রভাবতী তাঁহাকে স্বীয় পীড়ার সংবাদও জানিতে দেন নাই, ইহা ভাবিয়া তাঁহার দুঃখের মধ্যেও একটু সুখের সঞ্চার হইল। যেন অমাবস্যা রজনীতে ক্ষীণ বিজলি খেলিল। প্রাণ যেন প্রভাবতীর গুণের কথা শুনিবার জন্য আপনা আপনি নৃত্য করিয়া উঠিল। রজনীকান্ত পত্নীর নিকটবর্ত্তী হইয়া স্নেহভরে তাঁহার করপল্লব ধারণ করিলেন। বলিলেন,

'যা হ'ক মাঁকে দুর্ব্বাক্য বলা তোম্মার ভাল হয় নাই'।

এইবার প্রভাবতীর একটু সাহস বাড়িল। তিনি হস্তদ্বারা নাসিকা মুছিয়া লইয়া বলিলেন,

"কেন, এমন কি অন্যায় বলেছি? বেদনার গতিকে দু'দিন রাঁধ্‌তে যাই নি, তাই মা এসে জিজ্ঞাসা কল্লে´ন —'বৌ! রাঁধ্‌তে গেলে না'? আমি বল্লুম—'আমার অসুখ করেছে'। তাতেই তিনি বলে উঠলেন কিনা —'ওমা! খাওয়ার বেলা তোমার কোন অসুখ দেখ্‌তে পাই নে—কাজকর্ম্ম কর্ব্বার সময়ই তোমার যত অসুখ হয়।"

রজনী। তাতে তুমি কি উত্তর কল্লে´?

প্রভা। শুনে আমার বড়ই কষ্ট হলো। তবু আমি বল্লুম—'অসুখ কল্লে´ কি কর্ব্ব মা! দাসী বাঁদিরাও তো অসুখ হলে এক দণ্ড সোয়াস্তি

পায়' তাতেই তিনি রেগে উঠে বল্‌তে লাগ্‌লেন'—'আমাকেই তোমাদের দাসী পেয়েছ কিনা, তোমরা সবে রাজরাণীর মত ব'সে থেক, আমি দাসী মাগী আছি তোমাদের জন্য খেটে দিব'। আমি দেখে শুনে অবাক্।'

রজনীকান্ত আজ অতর্কিত ভাবেই পত্নীর অলীক কথাগুলি বিশ্বাস করিলেন। কারণ প্রভাবতী তাঁহার জননীকে কোন প্রকার দুর্ব্বাক্য বলেন নাই, ইহা তাঁহার মনে কোন প্রকারে প্রবোধ জন্মিলেই তিনি সুখী হইতে পারেন। প্রভাবতীর যে সমস্ত কথা বাটীর অন্য কেহই সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না, স্বার্থের বশীভূত হওয়াতে রজনীকান্তকে আজ তাহাই বিশ্বাস করিতে হইল। তিনি পত্নীকে বলিলেন, 'বাবার অসুখ, মার মন এখন নানারূপ দুশ্চিন্তায় পূর্ণ থাকে, একটী বল্‌তে আর একটী বলেন। না হয় তিনি না বুঝেই তোমাকে দু'টো কথা বলেছেন'।

রজনীকান্ত তাঁহার কথাগুলি বিশ্বাস করিলেন দেখিয়া প্রভাবতী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। এইবার তিনি স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত করিয়া লইবার জন্য বলিলেন, 'তিনিই না হয়, না বুঝে বলেছেন। তুমিও আমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে এতটা অপমান কল্লে'।

রজনীকান্তের বড়ই কষ্ট হইল। কারণ এখন তাঁহার মনে হইল যে তিনি বিনা অপরাধেই প্রভাবতীকে তিরস্কার করিয়াছেন। নিজ অন্যায় ব্যবহারের জন্য মনে মনে একটু আক্ষেপও হইল। কিন্তু পত্নীর নিকট সেই ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, 'শাশুড়ীর নিকট ক্ষমা চেয়েছ, এতে আর অপমান হলো কি? তিনি তোমার পূজনীয়া তো বটেন। এতে তোমার কোনরূপ মনঃকষ্ট করা উচিত নয়'।

প্রভা। তাতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। কিন্তু তুমিও যে আমার দুঃখ বুঝ্‌লে না, এই কষ্ট। কথায় কথায় সকলে আমাকে যে জ্বালাতন করে, তা ভুলেও আমি একদিন তোমার নিকট বলি নি। ঠাকুর ঝি আছেন, কিসে একখানা কথাকে তিন খানা করে মায়ের কাছে লাগাবেন। মা সোজা মানুষ, তাকে যেরূপ বলা যায়, তিনি সেইরূপই বিশ্বাস করেন। বলতো এরূপ কল্লে কি এক সংসারে বাস করা যায় ?

রজনী। কেহ যদি না বুঝে কোন কথা বলে, তাতে কাণ না দিলেই হলো।

প্রভা। ঐ তোমাদের এক কথা। আচ্ছা একটা কথাই ধর না কেন ? পূর্ব্বে হেমলতাকে আমি কোন কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে দিতুম না। তাতে ঠাকুর ঝি মার নিকট বল্‌তো কিনা 'ওছেলে মানুষ ওকে একটু কাজ কর্ম্ম শেখান দূরে থাকুক, বড় বউ ওকে একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না। তার পর যখন কিছু কিছু কাজ কর্ম্ম শেখাতে লাগ্‌লুম, তখন বলতো কিনা হেমলতাকে পেয়ে বড় বউ কুটো গাছটিও আল-গোচ করে না। ছুঁড়ীকে খাটিয়ে খাটিয়ে মার্‌লে। বলতো এ সব না বুঝে বলার কোন কথা হলো ?'

প্রভাবতী জানিতেন যে রজনীকান্ত জননীকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। এবং ইহাও জানিতেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে অধিক কোন কথা রজনীকান্ত বিশ্বাস করিবেন না। এই জন্য তিনি গিরিজাসুন্দরীর উপরই বেশী দোষারোপ করিলেন। প্রভাবতীর কোন কথায় অবিশ্বাস করিতে বা উহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে রজনীকান্তের আজ কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহার মনে ইহাও প্রত্যয় জন্মিল যে প্রভাবতীকে অনেক সময় অনর্থক লাঞ্ছনা পাইতে হয়। আর প্রভা-

বতী নিজগুণে সমস্তই নীরবে সহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার মনোগত ভাব প্রভাবতীর নিকট প্রকাশ করা অনুচিত মনে করিয়া বলিলেন,

'ত্রিশ দিন একখানে থাক্‌তে হলে, ওরূপ নানা কথা হয়েই থাকে। ওসব মনে করা কিছুই নয়। তবে নিজে কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলিওনা বা কাহারও সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করিও না। তাহা হইলে আমি বড়ই অসন্তুষ্ট হইব। তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করিও'।

প্রভাবতী আর কোন উত্তর করিলেন না। রজনীকান্ত পত্নীর সৎ স্বভাবের প্রমাণ পাইয়া মনে মনে যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন। কিন্তু হায়! একবার ভাবিয়া দেখিলন না, যে সেই দিন—সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মনোরত্নাগারে চোর ঢুকিল। অজ্ঞাতে, নিদ্রা আসিয়া তাঁহার জ্ঞাননেত্র অধিকার করিতে লাগিল। কুসুমে কীট পশিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী।

আমাদের সমাজের প্রত্যেক পরিবার এক একটি ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য বিশেষ। সাম্রাজ্যের যে কারণে উত্থান পতন, উন্নতি অবনতি হয়, এই ক্ষুদ্র রাজ্যেরও ঠিক সেই কারণেই উত্থান পতন, উন্নতি অবনতি ঘটিয়া থাকে।

সুসময়ে মানবচরিত্রে যেমন লক্ষ্মীচরিত্রের বিকাশ দেখা যায়, অসময়েও সেই প্রকার অলক্ষ্মী চরিত্রের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। এই-রূপে, যখন রমণীচরিত্রে প্রকৃতির লক্ষ্মীভাবের বিকাশ, তখনই রমণী লক্ষ্মীস্বরূপিনী, আবার যখন অলক্ষ্মীভাবের বিকাশ তখন তাঁহারা অলক্ষ্মী রূপা। লক্ষ্মীচরিত্রে সঞ্চালিত রমণী যেমন নানা প্রকারে সংসারে সুখ, শ্রী সম্বর্দ্ধন করে, অলক্ষ্মীচরিত্রে পরিচালিত রমণীও পক্ষান্তরে ঠিক তেমন বিপরীত ভাবে সংসারে নানাপ্রকার অশান্তি সৃষ্টি করতঃ উহাকে দগ্ধ মরু শ্মশানে পরিণত করিয়া তুলে। লীলাময়ী প্রকৃতির সাক্ষাৎ অনন্তপ্রতিমূর্ত্তি রমণীর হৃদয়ের মধ্য দিয়া মহাশক্তির যেরূপ ভাবচিত্র পরিস্ফুট হয়, সংসারের ভাগ্যচক্রও তদনুরূপই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। মনুষ্য শত চেষ্টা করিয়া, শত প্রতিকূলাচরণ করিয়াও সেই মহাশক্তির গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না।

প্রভাবতীর চরিত্রে এই অলক্ষ্মীভাব দিন দিনই বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার মন সদা সৰ্ব্বদাই অশান্তিতে পূর্ণ থাকিত। সংসারের কোন কার্য্যই তিনি মনোযোগের সহিত নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে অধিকাংশ সময়ই তিনি একান্ত উন্মনস্ক ভাবে অতিবাহিত করিতেন। এমন কি পীড়িত শ্বশুরের দিকেও তিনি একবার চাহিয়া দেখিতেন না। কেমন একটা নিরুৎসাহ ও অবসাদ তাঁহাকে সৰ্ব্বক্ষণই যেন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিত। তাঁহার প্রকৃতি যেমন উচ্ছৃঙ্খল ছিল, তাঁহার দৈনন্দিন কাৰ্য্য কলাপও ঠিক তদ্রূপই পরিচালিত হইত। প্রাতঃকালে গৃহ প্রাঙ্গণাদিতে গোময় প্রক্ষেপ ও সন্ধ্যাকালে ধূপ প্রদীপ দেওয়া প্রভৃতি যে সমস্ত কাৰ্য্য হিন্দুগৃহের গৃহলক্ষ্মীগণ সাতিশয় স্বাস্থ্যকর—সুতরাং লক্ষ্মীসমাগমের অন্যতম কারণ বলিয়া নিতান্ত ভক্তি সহকারে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, প্রভাবতীর সেই সমস্ত কার্য্যে কোনই আস্থা ছিল না। হৃদয়ের চঞ্চলতা তাঁহার সমস্ত কার্য্যের মধ্য দিয়াই ফুটিয়া বাহির হইত। এমন কি তিনি ধীর স্থিরভাবে গমনাগমন করিতেও সমর্থ হইতেন না। গমন কালে দূর হইতে তাঁহার পাদবিক্ষেপধ্বনি শুনা যাইত। বাসন পত্রাদি সংস্থাপিত করিবার সময়ও ঝন্ ঝন্ করিয়া নিরতিশয় শ্রুতিকটুধ্বনি উত্থিত হইত। কখন কখন বা হস্ত হইতে বাসন পত্রাদি পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। পুত্রবধূর স্বভাবে প্রকৃতির এরূপ অলক্ষ্মীরূপ চঞ্চলভাবের বিকাশ দেখিয়া গিন্নি কমলকামিনী যারপর নাই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রথম প্রথম "প্রাতঃকালে গোবরছড়া, সাঁজের বেলায় বাতি এবং ধীরে ধীরে চলে নারী, মৃদু কথা কয়" প্রভৃতি লক্ষ্মীর পাঁচালীর অবশ্য পালনীয় বাহ্যিক নিয়মগুলির অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবতীর স্বভাব সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভাবতী

কিছুতেই সেই নিয়মগুলি অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেন না। কুটিলভাবে বিভোর হইয়া তিনি নিতান্ত অশান্ত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে কেহই তাঁহার শত্রু ছিল না; তথাপি প্রভাবতী কাহারও প্রতি সুনজরে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেন না। নিতান্ত আত্মীয়ের সংস্পর্শও তাঁহার নিকট নিতান্ত বিষবৎ বোধ হইত। ছেলে মেয়ে দুইটীকে তিনি প্রায়ই বিনা কারণে প্রহার করিতেন। কি এক অজ্ঞেয় শক্তিতে যে তিনি সঞ্চালিত হইতেছেন, কি করিলে যে তাহার সুখশান্তি হয়, প্রভাবতী নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেন না। এইরূপে নিজের মনের আগুনে দগ্ধ হইয়া প্রভাবতী সংসার-কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেন মহাশয়ের পীড়া উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কবিরাজ রামরতন কাব্যনিধি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘকাল ঔষধ প্রয়োগেও কোন ফল হইল না দেখিয়া তিনি রজনী-কান্তকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! রোগ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। আপনারা অন্য চেষ্টা করুন।'

কাব্যনিধি মহাশয়ের এইরূপ কথা শুনিয়া রজনীকান্তের সমস্ত শরীরে তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চালিত হইল। ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। কথা শুনিয়া তিনি হঠাৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যদিও রমাপ্রসাদ বাবু অনেক দিন যাবৎ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, তথাপি রোগ এরূপ সাংঘাতিক হইয়াছে বলিয়া রজনীকান্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এইটী মনুষ্যের বড় সাধারণ ভ্রম নহে! দেখি-তেছি, দেশে পীড়ায় শত শত লোক চক্ষুর উপর মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইতেছে,কিন্তু সেই পীড়া কখনও আমাদের পরিবারমধ্যে প্রবেশ

করিবে বলিয়া আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে চাহি না। কারণ সেই বিশ্বাসের সহিত আমার সুখ যায়। মৃত্যু নরকের শত বিভীষিকা লইয়া আসিয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। তাই সুখের আশায়, স্বার্থের প্ররোচনায়, আমরা নিজকে নিজে আশ্বাসিত করি। হায়! মনুষ্যের কি স্বার্থান্ধতা! ক্ষণকাল পর রজনীকান্ত নিতান্ত কাতর-কণ্ঠে বলিলেন, 'এদেশে ভাল কবিরাজ আর কে আছে যাহার দ্বারা চিকিৎসা করান যেতে পারে।' অন্য কবিরাজের কথা শুনিয়া কাব্য-নিধি মহাশয়ের একটু অভিমান হইল। বলিলেন, 'মহাশয়! প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তন্ন তন্ন করিতেছি। আমিই যখন কিছু করিতে পারিলাম না, তখন অন্য কবিরাজ কি করিবে?'

রজনী। তবে আপনার মতে কি করা কর্ত্তব্য?

রাম। আমার মতে একবার ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। এরূপ পরিবর্ত্তনে অনেক সময় সুফল ফলে দেখা গিয়াছে। আর বিলম্ব করিবেন না। আপনি শীঘ্র অবিনাশ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসুন। ততক্ষণ না হয় আমি ঔষধ চালাই।

বিষ্ণুপুর হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ডাক্তার অবিনাশ বাবুর বাস। রজনীকান্ত আর কালবিলম্ব না করিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি লইয়া পত্নীকে বলিলেন,

'বাবার অসুখ বেড়েছে। আমি ডাক্তার আনিতে চলিলাম। আসিতে বিলম্ব হইতে পারে'।

এই বলিয়া রজনীকান্ত তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। রজনীকান্ত চলিয়া গেলে প্রভাবতী পূর্ব্বাপেক্ষা একটু নির্ভীকচিত্তে গৃহপ্রাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রভাবতীর দুর্ব্বাক্য—গিরিজাসুন্দরীর মনস্তাপ।

বেলা এক প্রহর। ছোট বউ হেমলতা রন্ধন করিবার জন্য রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিয়াছেন। গিরিজাসুন্দরী রন্ধনগৃহের এক কোণে বসিয়া কুটনা কুটিতেছেন এবং 'এরূপে কর, ওরূপে কর' বলিয়া হেমলতাকে রন্ধন করিবার কার্য্যপ্রণালী সকল দেখাইয়া দিতেছেন। হেমলতা কেবল উনন জ্বালিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় প্রভাবতী মুখখানাকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ভ্রূ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া টানো টানো স্বরে বলিলেন, 'আর কারো হেঁসেলে গিয়ে দরকার নেই। আমি কি আর রাঁধ্‌তে জানিনে?'

তৎশ্রবণে গিরিজাসুন্দরী প্রভাবতীকে বলিলেন, 'তুমি দু' দিন ধরে রাঁধছ। না হয় সেই এই বেলা রাঁধুক'।

প্রভাবতী ব্যঙ্গ স্বরে বলিলেন, 'বাপ্‌রে! তার রাঁধ্‌তে আছে! সে যে ছেলে মানুষ!'

গিরিজাসুন্দরী প্রভাবতীর ব্যঙ্গোক্তি বুঝিতে পারিয়াও বলিলেন, 'ছেলে মানুষ হলে কি আর রাঁধ্‌তে নাই। কেবল বসে থাক্‌লে কি চলে?"

প্রভাবতী চক্ষু দুইটী জড় সড় করিয়া পূর্ব্ববৎ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'আর গোরা কেটে আগায় জল ঢাল্‌তে হবে না। কাউকে চিন্‌তে আমার বাকী নাই'। গিরিজাসুন্দরী ভাব বুঝিয়া আর কোন উত্তর করিলেন না। হেমলতা উননের নিকট বসিয়া ছিলেন। প্রভাবতী ক্রোধভরে সেইদিকে অগ্রসর হইলেন এবং হেমলতার হাত ধরিয়া বল পূর্ব্বক উঠাইয়া দিয়া আপনি সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। ভাব বুঝিয়া গিরিজাসুন্দরী হেমলতাকে বলিলেন, 'থাক্ বৌ! ওকেই রাঁধ্‌তে দেও তুমি এই দিকে এস'।

হেমলতা গিরিজাসুন্দরীর নিকট যাইয়া নিতান্ত অপরাধিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। গিরিজাসুন্দরী আব কোন কথা না বলিয়া পূর্ব্ববৎ কুট্‌না কুটিতে লাগিলেন। হেমলতা ও গিরিজাসুন্দরীকে জব্দ করাই প্রভাবতীর উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য ভালরূপ সিদ্ধ হইল না দেখিয়া প্রভাবতী ক্রোধভরে উঠিয়া যাইয়া গিরিজাসুন্দরীর সম্মুখীন হইলেন। বলিলেন,

'আবার কুট্‌না কোটা হচ্ছে কেন'? ওসব কি আর আমি জানিনে? পোড়ারমুখীরা আমাকে জ্বালিযে জ্বালিয়ে মাব্‌লে'।

গিরিজাসুন্দরী বলিলেন, 'গালাগালি কর্চ্ছ কেন বউ? এক জন রাঁধ্‌লে, অন্যের কি কাজ কর্ত্তে নাই?" এই বলিয়া গিরিজাসুন্দরী পূর্ব্ববৎ কুট্‌না কুটিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রভাবতীর ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল। তিনি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া গিরিজাসুন্দরীর বঁটি ধরিয়া হঠাৎ আকর্ষণ করিলেন। বঁটির সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ লাগিয়া

গিরিজাসুন্দরীর বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর একস্থান কাটীয়া গেল। তিনি আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া বঁটি ছাড়িয়া দিলেন এবং ম্লানমুখে তথায় বসিয়া রহিলেন। হেমলতা একখানা নেকড়া দ্বারা গিরিজা-সুন্দরীর ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও প্রভাবতীর ক্রোধের উপশম হইল না। এইবার তিনি গিরিজাসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ভাতারখাকী মাগীদের যদি কিছু বুদ্ধি থাক্‌তো, তবু হতো। মাছের ঘরে রাঁধ্‌তে হলেই ভাতারখাকী-দের যেন মরণদশা উপস্থিত হয়। তা রাঁধ্‌বে না তো ভাতারখাকীদের পেট চল্‌বে কেমন করে?'

প্রভাবতীর বাক্যবাণে গিরিজাসুন্দরীর কোমল প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। যে স্বামীর মৃত্যুতে গিরিজাসুন্দরী বিষের মুর্ম্মুরদাহনে দগ্ধ হইতেছেন, যে স্বামীর মঙ্গল কামনায় গিরিজাসুন্দরী আপনার সমস্ত সুখ শান্তি বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনিই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন, প্রভাবতীর এরূপ ভাবব্যঞ্জক উক্তিতে গিরিজাসুন্দরী অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'তা কি করবো বৌ! ভগবান্ এ দশা করেছেন, তাই তার ফলভোগ কর্চ্ছি। পেট চল্‌বার কথা কি বল্‌ছ! পেট চলবার যদি অন্য জায়গা থাক্‌তো, তা হলে কি আর তোমাদের চক্ষুঃশূল হই'।

গিন্নি কমলকামিনী পীড়িত পতির শুশ্রূষা করিতেছিলেন। প্রভা-বতীর উচ্চরব ও গিরিজাসুন্দরীর ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণে পৌঁছছিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিলেন। জননীকে দেখিয়া গিরিজা সুন্দরীর শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভা-বতীকে বলিলেন, 'আমি কি বুঝ্‌তে পারি নি বৌ! তুমি কেন

বল্‌বে। আমার অদৃষ্ট মন্দ বলেই তো মাথার সিঁদূর উঠেছে। আর তোমাদের দাসীপনা না কর্ল্লে তোমরাই বা খেতে দিবে কেন?'

কন্যার বৈধব্যনিবন্ধন কাতরোক্তি শুনিয়া মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, এবং পুত্রবধূ প্রভাবতীই সেই-সময় কন্যার মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া ক্ষোভে ক্রোধে গিন্নির দু'নয়নে প্রস্রবণ ছুটিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'আয় মা! ও পাগল হয়েছে। তুমি ওর কথায় মনঃকষ্ট পেও না। তুমি ওরটা খাচ্ছ, না ওরটা পড়্‌ছ। ও কে? কেনা বাঁদী বই তো নয়? রজনীকান্ত বাড়ী আসুক আজ ওর দাঁত ভেঙ্গে দেওয়াব"।

এই বলিয়া গিন্নি গিরিজাসুন্দরীকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গিরিজাসুন্দরী মাতৃবক্ষে মস্তক রক্ষা করিয়া নিতান্ত বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। মৃতপতিশোক আজ থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। গিন্নিও ক্রন্দন করিতেছিলেন। উভয়ের নয়ননীরে উভয়ের বসন সিক্ত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গরলে গরল ক্ষয়

অপরাহ্ণ সময়ে রজনীকান্ত অবিনাশ ডাক্তারকে লইয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল্ স্কুল হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তার বাবু প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। চিকিৎসা বিষয়ে এতদ্দেশে ডাক্তার বাবুর বিলক্ষণ খ্যাতি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে উপহাস করিয়া নিজকে সুচিকিৎসক বলিয়া প্রতিপাদন করা, পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের আজকাল এক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিনাশ বাবুর এই রোগটী ছিল না। তিনি কোন চিকিৎসাপ্রণালীই অবিশ্বাস করিতেন না এবং নিজেও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে অনেক সময় ঔষধ প্রয়োগ করিতেন। উৎকট রোগের অবস্থা বিশেষে তিনি কাহাকে মাদুলী গ্রহণ করিতে, কাহাকে বা সাধু-সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার পরিশ্রমের কোনও মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না এবং রোগীকে শোষণ করিয়া তিনি কখনই অর্থ সংগ্রহ করিতেন না। একাধারে এই সমস্ত গুণরাশির সমাবেশে এবং নিজের স্বাভাবিক দক্ষতা ও বহুদর্শিতাগুণে তিনি এতদ্দেশে একজন সুচিকিৎসকের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছেন।

ডাক্তার বাবুকে বহির্ব্বাটীতে উপবেশন করিতে বলিয়া রজনীকান্ত অন্দরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, জননী ও ভগিনী নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বারাণ্ডার একপ্রান্তে বসিয়া আছেন। পীড়িত পিতার রোগের আতিশয্যই তাঁহাদের ওরূপ মনঃকষ্টের কারণ, ইহা মনে করিয়া রজনীকান্ত কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। ডাক্তার বাবু গ্রামান্তরের লোক। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সম্মুখে বহির্গত হয়েন না। রজনীকান্ত জননী ও ভগিনীকে অন্তরালে যাইতে বলিয়া ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আনিলেন। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বাবু কি বলেন, তাহা জানিবার জন্য গিন্নি কমলকামিনী দরজার নিকট উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। ডাক্তার বাবু যন্ত্রদ্বারা প্রথমে বৃদ্ধের শরীরের উত্তাপ গ্রহণ করিলেন। তার পর বক্ষঃস্থল ও পৃষ্ঠদেশ ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তৎপর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, বৃদ্ধের জীবনস্রোতঃ ক্রমেই রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তথাপি নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য একবার রামরতন কাব্যনিধিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কবিরাজ মহাশয় বৃদ্ধের নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনোগতভাব মুখে ব্যক্ত হইল। কিন্তু ডাক্তার বাবু রুগ্নের সম্মুখে তাঁহার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ করা অনুচিত মনে করিয়া কবিরাজ মহাশয় ও রজনীকান্তকে লইয়া বহির্ব্বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। সুবোধচন্দ্রও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। যাইতে যাইতে রজনীকান্ত ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরূপ দেখলেন, মহাশয়! অবস্থা কি খারাপ বোধ হইতেছে?'

ডাক্তার। হাঁ, এবার রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। বোধ হয় আর অধিক দিন টিকিবেন না।

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া রজনীকান্ত ও সুবোধচন্দ্রের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সুবোধচন্দ্র নিতান্ত বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। রজনীকান্তের লোচনও জলভারাক্রান্ত হইল। তাঁহাদের অধীরতা দেখিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'বৃথা অস্থির হইবেন না। বৃদ্ধবয়স কখন কি হয়, বলা যায় না। এখনও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে।'

রজনীকান্ত বলিলেন, 'আপনি একবার সাধ্যমত চিকিৎসা করিয়া দেখুন। চেষ্টার ত্রুটি হইলে মনকে প্রবোধ দিতে পারিব না।'

ডাক্তার। আপনারা সেই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। চেষ্টার কোন অংশে ত্রুটি হইবে না। আজ ছয় দাগ ঔষধ দিতেছি! তিন ঘণ্টা অন্তর ইহা সেবন করাইতে থাকুন। ইহাতে জ্বরের উপশম না হইলে পুনরায় যে বিহিত হয়, করা যাইবে।

অতঃপর ডাক্তার বাবু ভ্রাতৃদ্বয়কে নানা প্রকার আশ্বাস দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে রজনীকান্ত তাঁহাদের কুলগুরু বামদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট পিতার পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ দিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে আনিবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর রজনীকান্ত অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার লোচন আরক্ত, মুখ ভার। পতির শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বাবু কি বলিয়া গেলেন তাহা জানিবার জন্য গিন্নি কমলকামিনী নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন। রজনীকান্ত অন্দরে প্রবেশ করিলে গিন্নি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা! ডাক্তার বাবু দেখে কি বলে গেলেন? কোন ব্যাঘাত হবে না তো?'

রজনী। বল্লেন ব্যারাম তত কঠিন নয়। শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন।

এই বলিয়া রজনীকান্ত ছল্ ছল্ নেত্রে এক পায়ে দু'পায়ে মাতৃ-সন্নিধান হইতে প্রস্থান করিলেন। জননীকে আর কোন প্রশ্ন করিতে অবকাশ প্রদান করিলেন না। কিন্তু পুত্রের প্রবোধবাক্যে আজ গিন্নির মনে প্রবোধ মানিল না। রজনীকান্তের বিষাদমূর্ত্তি দেখিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে গিন্নির বিলম্ব ঘটিল না। পীড়িত পতির অমঙ্গল চিন্তা আজ তাঁহার অন্তঃস্থলে প্রবলবেগে আঘাত করিতে লাগিল। প্রভাবতীর উপর গিন্নির যে ক্রোধ জন্মিয়াছিল, তাহা লোপ পাইল। পুত্রদ্বারা প্রভাবতীকে শাসিত করিবার যে ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহা আর তাঁহার মনোমধ্যে স্থান পাইল না। কিন্তু প্রভাবতীর ব্যবহারে তিনি যে মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা বাড়িয়া গেল। এক খণ্ড মেঘের উপর আর এক খণ্ড গাঢ় মেঘ চাপিল। ছোট তরঙ্গের উপর প্রবল তরঙ্গ আসিল। সে তরঙ্গে পড়িয়া গিন্নি আপনা আপনি হাবু ডুবু খাইতে লাগিলেন।

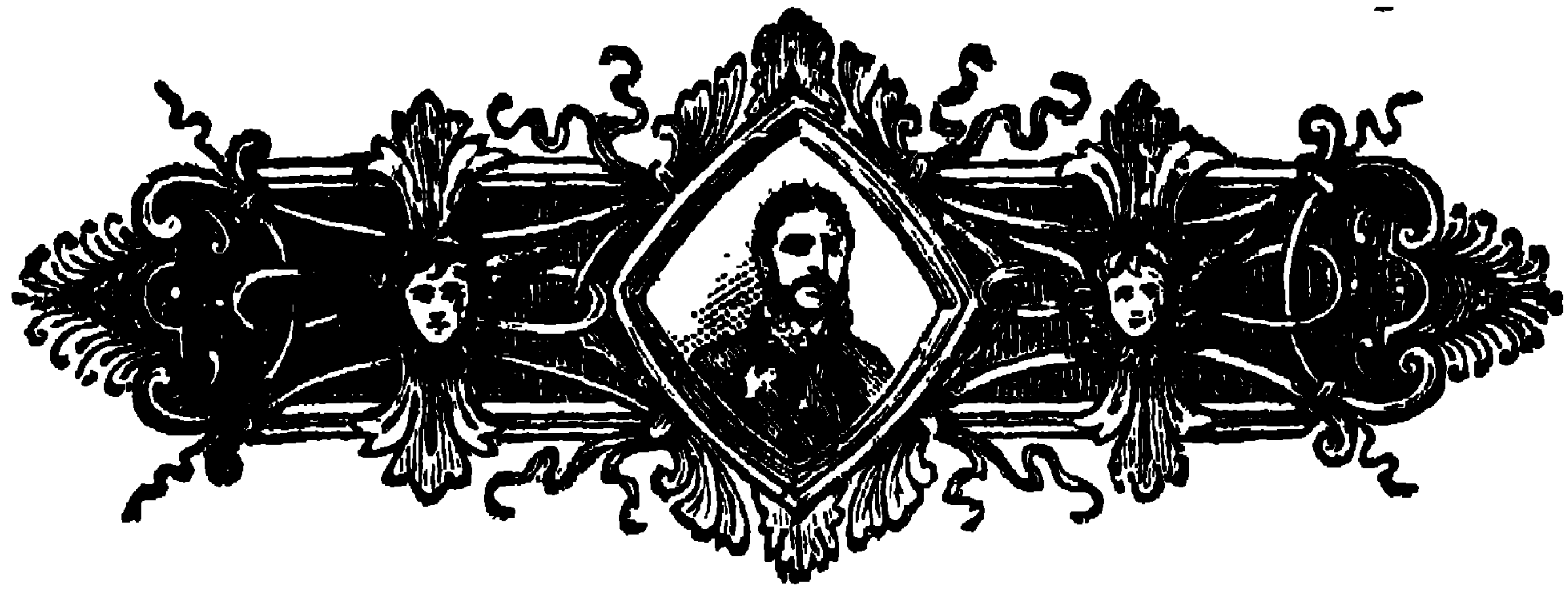

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

-o()o-

শেষ অশ্রু

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, সেন মহাশয়ের সেই কালব্যাধির আর কিছুতেই উপশম হইল না। চিকিৎসকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কোন প্রতীকার করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্রমে সেন মহাশয়ের আসন্নকাল উপস্থিত হইল। সেন মহাশয় নিতান্ত সৎপ্রকৃতি ও পরোপকারী লোক ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে দেখিবার জন্য গ্রামের স্ত্রী পুরুষ ছোট বড় অনেকেই এ সময়ে আসিয়া সেনবাড়ী উপস্থিত হইতে লাগিলেন। দূরদেশ হইতেও অনেক আত্মীয় স্বজন সেন মহাশয়কে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। সেন মহাশয় নিজ শারীরিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া একে একে সকলের নিকট চির-কালের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় একমনে আপনার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এক দিবস বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সেন মহাশয়ের শরীরের অবস্থার বড়ই পরিবর্ত্তন

সংঘটিত হইল। নিকটে সেনদের কুলগুরু বামদেব সার্ব্বভৌম ও পারিবারিক বৈদ্য রামরতন কাব্যনিধি আসীন ছিলেন। তাঁহারা বৃদ্ধের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতা একসঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। রজনীকান্ত ও সুবোধচন্দ্র পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিতান্ত বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। বামদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য নানাপ্রকারে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইতে লাগিল। বৃদ্ধ অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আপনার ইষ্টমন্ত্রজপে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। বালক নরেন্দ্র এতক্ষণ তাহার দিদিমায়ের ক্রোড়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিল। সকলকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে তথা হইতে উঠিয়া আসিল, এবং দুইহস্তে বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অবোধ শিশু 'ঠাকুদ্দা—ঠাকুদ্দা' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এইবার বৃদ্ধের হৃদয়ের আবেগ অপরিমিত হইল। তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। অজ্ঞাতে. তাঁহার নয়নকোণ দিয়া ফোটা ফোটা অশ্রুজল বহির্গত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধ ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়া গেলেন। তিনি বিচলিতান্তঃকরণে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং দুই হস্তে বালককে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'মায়ার পুত্তলী, তুই আমার ইষ্টমন্ত্রজপে ব্যাঘাত কর্চ্ছিস ?'

এই বলিয়া বৃদ্ধ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিলেন। অশ্রুজল তাঁহার গণ্ড বহিয়া ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ক্ষণকাল কথা বলিতে পারিলেন না। অতঃপর হৃদয়ের আবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে বৃদ্ধ স্বীয় পরিজনবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তোমাদের

সহিত বেশী বাক্যালাপ করি, এমন শক্তি এখন আমার নাই। তবে এইমাত্র বলিয়া যাইতেছি, যে, বৃথা শোক করিয়া শরীর নষ্ট করিও না। এ সংসার মায়ার খেলা। মায়াসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জীব এখানে দারাপুত্রপরিজন সাজিয়া দুই দিনের জন্য খেলা করে। আমার খেলা ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাই আমি চলিলাম। কিন্তু এমনই সেই মায়ার আকর্ষণ, যে জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তেও নিজ স্ত্রীপুত্রপরিজনের সহিত এই মায়ার খেলা শেষ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কি করি আমার সময় হইয়াছে।'

গৃহিণী কমলকামিনী এ পর্য্যন্ত অঞ্চলদ্বারা স্বীয় চক্ষু মুছিতেছিলেন। বৃদ্ধের বাক্য শেষ হইলে, তিনি তাঁহার চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, 'ভাগ্যবান্! তুমি তো চলিলে আমাকে কি বলিয়া যাও?'

এইবার বৃদ্ধের স্বর একটু অধিক কাঁপিয়া আসিল। তিনি স্নেহবিজড়িত কণ্ঠে পত্নীকে বলিলেন 'গুণময়ি! তোমার গুণের সীমা নাই। এ পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিয়া নারীজন্মের পরকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, এখন বাকী জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন কর। আর্য্যবিধবাদের ইহা অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই'।

অতঃপর বৃদ্ধ পুত্রদ্বয়কে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা নিকটে আসিলে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন. "আর অত্যল্প সময়ের মধ্যে তোমরা সংসারের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু সাবধান, সংসার সমুদ্র বড় ভীষণ। ইহাতে নানাপ্রকার ঘাত প্রতিঘাত আছে। নানাপ্রকার আবর্ত্ত আছে। দেখিও তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া যাইও না। স্রোতোবেগ প্রবল হইলে, ধীর গম্ভীরভাবে বক্ষে ধারণ করিও। স্থূলকথা, জীবনে মন্ত্রহীন বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না।

জন্ম মৃত্যুতে অতি অল্প ব্যবধান। মনুষ্য মায়াপ্রপঞ্চে ভুলিয়া সেই মৃত্যুর কথা সর্ব্বদাই ভুলিয়া থাকে। তাই 'আমার আমার' করিয়া পাপার্জ্জন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। তাই আত্মদ্রোহ, আত্ম-দলাদলীতে জীবের অশান্তি দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে৷ পরকালের বিষয় সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। তাহা হইলে অনেক যন্ত্রণা ও বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। সংসারে অনর্থ ঘটিবার উপক্রম দেখিলে বিচলিত হইও না। ধীরস্থিরভাবে তাহার প্রতিবিধান করিও ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ করিও না। কনিষ্ঠ ভাই, দোষ করিলে সংশোধন করিও। আর কি বলিব। আমার কথা বলিতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছে। গুরুদেব বিদায় দিন্।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ মৌনাবলম্বন করিলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্ষণকালপরই তিনি প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, 'আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর!! স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে, কত রঙের ফুল ফুটিয়াছে। প্রমোদবনে, দেবকন্যাগণ কি সুন্দর কেলি করিয়া বেড়াইতেছে। শোক নাই, তাপ নাই। কি শান্তি! কি শান্তি!!'

বামদেব সার্ব্বভৌম অবিচলিত অন্তঃকরণে এতক্ষণ নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনপ্রদীপের অন্তিমকার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বৃদ্ধের শেষবাক্য শুনিয়া তিনি আনন্দোৎফুল্ললোচনে কিয়ৎকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপর স্নেহবিজড়িতকণ্ঠে বলিলেন, 'বৎস! যাও, যেখানে বিবাদ নাই, বিসংবাদ নাই, যেখানে পাপের বৃশ্চিকদংশন নাই, সেই চিরশান্তিনিকেতনে যাও। যেখানে বিশ্বাসঘাতকতার অরুন্তুদ তীব্রযাতনা নাই, যেখানে প্রকৃতি নিত্য নবপুষ্পপল্লবে পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকিরণ করিতেছে,

যেখানে বিগঙ্গকণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুর গীতিধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইতেছে, যেখানে আনন্দস্রোতঃ সদাপ্রবহমান, বৎস! সেইখানে যাও, সেই মনোহর উপবনে সুখে বিচরণ কর। জগদ্‌গুরু তোমার মঙ্গল করুন।'

এই বলিয়া বামদেব সার্ব্বভৌম অতিকষ্টে মৌনাবলম্বন করিলেন। দেখিতে দেখিতে মুমূর্ষুর শরীরে অত্যন্ত পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল। বৈদ্য মহাশয় ইঙ্গিত করিলেন। মুমূর্ষুকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনা হইল।

মুমূর্ষুকে বাহিরে আনা হইলে অতিক্রত মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্যসকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। পত্নী কমলকামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পদযুগল ধারণ করিয়া বসিলেন। এমন সময় বৃদ্ধের মস্তক একবার কাঁপিয়া উঠিল এবং সেই প্রকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নয়নকোণদিয়া স্নেহমায়াবিসর্জ্জনের চিহ্নস্বরূপ একফোটা অশ্রুজল একবার পড়িল। নয়নগোলকদ্বয় একবার ঘুরিল। সেই সময় চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদিসমন্বিত এই বিশাল বিশ্বরূপ বুঝি, সেই আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে একবার প্রকটিত হইল। তারপর? তারপর বিপরীত আবর্ত্তনের ঊর্দ্ধাকর্ষণে পড়িয়া সেই বৃদ্ধের প্রাণপাখী কে বলিবে, কোথায় কোন্ দূরবর্ত্তী কল্পনাতীতদেশে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

-০()০-

বিপদের উপর বিপদ

নবাব মরিলেন, সাহজাদা নবাব হইলেন, সাহজাদাপত্নী বেগম না হইবেন কেন? রমাপ্রসাদ বাবু মরিলেন, রজনীকান্ত বাড়ীর কর্ত্তা হইলেন সুতরাং প্রভাবতীই বা কর্ত্রী না হইবেন কেন? স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গী, এই সূত্রে, প্রভাবতী আপনাকে কর্ত্রী সাব্যস্ত করিলেন। কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না, কাহাকে কিছু বলিতেও হইল না কিন্তু প্রভাবতী বাড়ীর ষোলআনা কর্ত্রী হইলেন। রামের মা, শ্যামের মা, হেলার মা, ভেলার মা প্রভৃতি সকলেই বুঝিল, যে প্রভাবতী কর্ত্রী। আইনতঃ ধর্ম্মতঃ কর্ত্রীপনার প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী।

যেমন প্রভু হইলে প্রভুত্ব চাই, তেমন কর্ত্রী হইলেও কর্ত্রীপনার আবশ্যক। নূতন পদবী গ্রহণ করিয়া প্রভাবতী কর্ত্রীপনা দেখাইবার

জন্য যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মৃত সেন মহাশয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রভাবতীর কর্ত্রীপনার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। ইহার পর প্রভাবতী ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। প্রভাবতীর প্রথমেই ভাঁড়াবের উপর দৃষ্টি পড়িল। ভাঁড়ার হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দেওয়া ও ক্রীত দ্রব্যাদি যথাস্থানে সংস্থাপিত করা ইত্যাদি যে সমস্ত কার্য্য গিন্নি কমলকামিনীর ও তৎপরিবর্ত্তে গিরিজাসুন্দরীর একচেটিয়া ছিল, প্রভাবতীর প্রথমেই তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িল। তিনি প্রথমেই সেই কার্য্যটুকু কাড়িয়া লইলেন। কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বে প্রভাবতীকে শাশুড়ীর নিকট প্রার্থনা করিতে হইত। এখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তিনি নিজ হস্তেই বাহির করিয়া আনেন, শাশুড়ীকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন না। বাজার হইতে কোন দ্রব্যাদি আনীত হইলে প্রভাবতী তাড়াতাড়ি তাহা ভাঁড়ারে পূরিয়া রাখেন। হেমলতা বা গিরিজাসুন্দরী এই সমস্ত কার্য্য করিতে গেলে প্রভাবতীর ক্রোধের পরিসীমা থাকে না এবং বলা বাহুল্য, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তদ্দণ্ডেই কিছু উত্তম মধ্যম উপভোগ করিয়া আসিতে হয়। গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতা প্রথম হইতেই প্রভাবতীকে সাতিশয় ভয় করিতেন। এখন প্রভাবতীর ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদাই তটস্থ থাকেন। ভাল হউক মন্দ হউক, তাঁহারা সাধ্যমত প্রভাবতীর বাক্যে দ্বিরুক্তি করেন না এবং সর্ব্বদাই প্রভাবতীর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে যত্নবতী হয়েন। পতির মৃত্যুতে গিন্নি কমলকামিনীর মন এখন প্রায় সর্ব্বক্ষণই অশান্তিতে পূর্ণ থাকে। তিনি প্রভাবতীর কার্য্যকলাপ বুঝিয়া শুনিয়াও কোন প্রতিবাদ করেন না। সুতরাং প্রভাবতী কর্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া একরূপ স্বেচ্ছামত কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল, কিন্তু প্রভাবতী ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে পৃথগন্ন হইবার আশা বলবতী হইতে লাগিল। কে যেন তাঁহার অন্তর হইতে বলিয়া দিতে লাগিল, যে হেমলতা তাঁহার সংসারক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিনী. গিরিজা-সুন্দরী তাহার সুখের পথে অন্তরায়। তিনি যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিতে না পারিলে তাঁহার সুখের মাত্রা পূর্ণ হইয়া উঠিবে না।

এই সময় হইতে রজনীকান্ত ক র্য্যগতিকে কখনও অন্যত্র গমন করিলে বা বাটিতে অনুপস্থিত থাকিলে প্রভাবতী কোন না কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া গিরিজাসুন্দরী, হেমলতা ও শাশুড়ীর উপর গালাগালি বর্ষণ করিতেন। গিন্নি কমলকামিনী প্রথম প্রথম দুই তিন দিবস রজনীকান্তের নিকট প্রভাবতীর দুর্ব্যবহারের কাহিনী বলিয়া প্রভা-বতীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত ও শাসিত করাইলেন, কিন্তু তাহাতেও প্রভাবতী নিরস্ত হইলেন না দেখিয়া এবং রজনীকান্তও প্রভাবতীর ব্যবহারে নিরতিশয় কষ্টানুভব করেন বুঝিতে পারিয়া গিন্নি পুত্রের নিকট প্রভাবতীর বিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপন করিতেন না। যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি একান্তে বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেন। রজনীকান্তও পত্নীর স্বভাব সংশোধিত হইয়াছে মনে করিয়া নিজকে নিজে প্রবোধ দিলেন।

এইরূপে অশ্রুজলে ভাসিয়া গিন্নি সময় ক্ষেপন করিতে লাগিলেন। পতিবিয়োগশোকে ও সর্ব্বদা মানসিক যন্ত্রণায় গিন্নির শরীর অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। সহসা তিনি উৎকট জ্বর ও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাহাতে প্রভাবতী ব্যতিরেকে বাটীর সকলেরই নিতান্ত ভাবনার কারণ হইয়া উঠিল। রজনীকান্ত ও

সুবোধচন্দ্র জননীর সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা কিছুতেই ঔষধ ব্যবহার করিবেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে সেই চেষ্টা হইতে নিরস্ত করিলেন। গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া জননীকে ঔষধ ব্যবহার করিতে কত অনুরোধ করিলেন কিন্তু গিন্নি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। বিনা চিকিৎসায় বৃদ্ধার শরীর অতিদ্রুত ক্ষয় পাইতে লাগিল।

সন্ধ্যাকাল। মিটি মিটি জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। গিন্নি কমলকামিনী শারীরিক যন্ত্রণায় মুহুর্মুহুঃ শয্যার উপর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন। রজনীকান্ত ও সুবোধচন্দ্র জননীর অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া ছল্ ছল্ নেত্রে বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন; গিরিজাসুন্দরী জননীর পাদমূলে উপবেশন করিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। ক্ষণকালপর বৃদ্ধা রজনীকান্তকে বলিলেন, 'বাবা! আমার শরীরে আজ বড় যন্ত্রণা বোধ হইতেছে। বোধ হয় আজ রাত্রি পার হইব না।'

রজনীকান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'মা! মা! নিজে ইচ্ছা ক'রে মারা গেলে। ঔষধ খেলে বোধ হয় আরো দু'দিন বেঁচে থাক্‌তে।'

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে বলিলেন, 'তোমার পিতা স্বর্গারোহণ করেছেন। আমারও বয়স হয়েছে। ঔষধ খেয়ে এখন কি আর বাঁচিবার সাধ আছে, বাবা!'

গিরিজাসুন্দরী জননীকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'মা! মা! আবার আমি মাতৃহীন হলেম।'

বৃদ্ধা অতিকষ্টে হস্ত উঠাইয়া ধীরে ধীরে গিরিজাসুন্দরীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিলেন। তার পর রজনীকান্তকে বলিলেন, 'বাবা! গিন্নি

আমার অনাথিনী ; ওর প্রতি দৃষ্টি রেখ। তোমরা বই ওর এসংসারে কেউ নাই। বড় বউমা ওকে বড় কষ্ট দেয়। তুমি দেখ বাবা! আর নরেন,—নরেন আমার এক মুঠো অন্নের কাঙাল।'

রজনীকান্ত বস্ত্রদ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'মা! মা! গিরি ও তার ছেলে মেয়ে কি আমার পর ? তুমি ওরূপ বলো না। তা হ'লে আমার মনঃকষ্টের পরিসীমা থাক্‌বে না।'

রজনীকান্তের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিলেন। তাঁহার মনোগত ভাব মুখে ব্যক্ত হইল। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'বড় সুখী হলেম বাবা। আর আমার মরিতে কষ্ট নাই।'

এই বলিয়া বৃদ্ধা ধীরে ধীরে নয়ন মুদ্রিত করিলেন এবং ইহজন্মে আর তাহা উন্মীলন করিলেন না। রজনীযোগেই বৃদ্ধার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। পরিজনবর্গের বিপদের উপর বিপদ পড়িল। অশ্রুজলে ভাসিয়া ভ্রাতৃদ্বয় মাতৃশ্রাদ্ধও কোনরূপে নির্ব্বাহ করিলেন। কিন্তু এবার বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। গ্রাম্যদেবতাগণের বিশেষ পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও এইবার পাকাফলাহার জুটিয়া উঠিল না। অগত্যা তাঁহারা ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধে প্রায় সমস্ত নগদ টাকাগুলি ব্যয় হইয়াছিল, সুতরাং এই কার্য্যোপলক্ষে তাঁহারা কিছু ঋণী হইয়া পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্র পরিগ্রহ

দিন যায়, থাকে না। কাহারো সুখে, কাহারো দুঃখে, একভাবে দিন কাটিয়া যায়। তুমি সসাগরাধরণীর অধীশ্বর, নিয়ত দাসদাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আরাম সম্ভোগ করিতেছ, সংসারের সর্ব্বপ্রকার বিলাস সামগ্রী সতত তোমার পদলেহন করিতেছে;—তোমারও দিন কাটিয়া যাইতেছে; আর আমি পর্ণকুটীরে পড়িয়া ক্ষুৎপিপাসায় ছট্‌ফট্ করিতেছি, নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্র, বর্ষার অবিরাম বারিধারা সমভাবে আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, সহায় নাই, সম্বল নাই, অনশনে উত্থানশক্তিরহিত হইয়াছি, আমারও দিন কাটিয়া যাইতেছে। সময় কাহারও হাতধরা নহে। মনুষ্যজীবন সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে কত পরিবর্ত্তন, কত আবর্ত্তন সহ্য করিতেছে; কতবার উত্তালতরঙ্গনিক্ষিপ্ততরণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া কত প্রকার ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিতেছে কিন্তু সময় তবুও ভ্রূক্ষেপ

করিতেছে না। সে আপনার গতিতে প্রমত্ত রহিয়া মনুষ্যকে স্বকীয় অদৃষ্টের অনুশাসনে অনুশাসিত করিয়া একই রূপে একই ভাবে অগ্রসর হইতেছে।

রজনীকান্ত ও সুবোধচন্দ্রের দিনও অতিবাহিত হইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি পিতৃমাতৃবিয়োগে অধীর হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় নিতান্ত উদাসীনের ন্যায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। সংসার তাঁহাদের নিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে, এক মাস, দুই মাস করিয়া ক্রমে তিন মাস কাল অতিবাহিত হইল। ক্রমে তাঁহাদের মনঃকষ্ট অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া আসিল। সংসার ধীরে ধীরে পুনরায় নন্দনকাননের শোভা ধারণ করিতে লাগিল। রজনীকান্ত বিষয়কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। সুবোধচন্দ্র ডাক্তারি পড়িবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

শাশুড়ীর কাল হইলে প্রভাবতী একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন। যাহা কিছু আপদ ছিল, চুকিয়া গেল। তিনি অনায়াসেই হেমলতার উপর রন্ধন করা, বাসন মাজা প্রভৃতি কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিজে নিরেট গিন্নিটি সাজিয়া কেবল ভাঁড়ার ঘরের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্রী হইয়া রহিলেন। প্রভাবতী রন্ধনাদি করেন না বলিয়া গিরিজাসুন্দরী বা হেমলতা ভয়ে কখনও তাঁহাকে কিছু বলিতেন না। রজনীকান্ত কোন সময়ে এ বিষয়ে কিছু বলিলে, প্রভাবতী বলিতেন 'আমাকে এখন কত বিষয় দেখ্‌তে হয়, ওসব কাজকর্ম্ম নিয়ে থাকা কি চলে? আর ওকেও তো কিছু কিছু কাজকর্ম্ম শেখান উচিত, এখন উঠন্ত বয়স, এখন থেকে না শিখ্‌লে, শিখ্‌বে কবে?' রজনীকান্তও তদ্রূপই বুঝিতেন। এইরূপে সাত আট মাস কাল কাটিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে প্রভাবতী বিশেষ কোন শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। হেমলতা ও গিরিজা-

সুন্দরীকে পৃথক্ করিয়া দিতে না পারায় তাঁহার মন সর্ব্বদাই অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতে লাগিল। কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিতে পারিবেন, প্রভাবতী দিবানিশি তাঁহারই কল্পনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বামীর জন্য সে বাসনা কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠি:ত পারিলেন না এবং তজ্জন্য রজনীকান্তের উপর তাঁহার নিরতিশয় ক্রোধ জন্মিল। কেননা যদি রজনীকান্ত তাঁহার মনের মত হইতেন, যদি তিনি তাঁহার কথা শুনিতেন, তবে প্রভাবতীর এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না। তিনি অনায়াসেই গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতাকে পৃথক্ করিয়া দিতে পারিতেন। ধরিতে গেলে, প্রভাবতীর মতে, রজনীকান্তই সমস্ত অনিষ্টের মূল। প্রভাবতী স্বামীর উপর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন। স্বামীর অবিমৃষ্যকারিতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে এক দিবস প্রভাবতীর ক্রোধের মাত্রা এতই অপরিমিত হইল, যে তিনি সেই দিন কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। সেই দিবস রাত্রিতে আহারান্তে রজনীকান্ত শয্যার উপর উপবেশন করিলে প্রভাবতী ক্রোধে অন্ধ হইয়া আসিয়া স্বামীকে বলিলেন, 'আর আমার এ সংসারে বাস করা চল্‌বে না।'

পত্নীর মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া রজনীকান্তের বড়ই ক্রোধ জন্মিল। তিনি ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, 'কেন তোমাকে আমাকে পৃথক্ হ'তে হবে নাকি ?'

স্বামীর ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া প্রভাবতী আরো চটিয়া গেলেন। কিন্তু রজনীকান্তের মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিয়া বিশেষ কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'এ আবার কোন কথা হলো! কেন, ভাইয়ে ভাইয়ে কি পৃথক্ হয় না ?'

রজনী। হয় হউক্। সে বিষয়ে তোমাকে পরামর্শ দিতে হবে না।

প্রভা। কেন হবে না? এক শ বার হবে। যখন আমাকে ভুগ্‌তে হয়, তখন আমাকে বল্‌তেও হয়। আমি সকলের জন্য ভূতের বোঝা বইতে পার্ব্ব না। হয় ভাই বোন্‌কে পৃথক্ ক'রে দেও, নইলে আমি এ সংসারে কেউ নই। আমার স্পষ্ট কথা। রজনীকান্তের অসহ্য হইল। তিনি মুখ বিকৃত করিয়া পত্নীকে বলিলেন, 'কি বল্লে, ভাই বোন্‌কে পৃথক্ ক'রে দিব, আর তোমাকে নিয়ে, ঘরে ব'সে জুজুটীর মত লয়লামজনুপ্রেমালাপ কর্ব্ব? সর্ব্বে সর্ব্বেশ্বরী আর কি! দেখো, ঐ দিক্‌টা পানে তোমার বাপের বাড়ী যেতে হয়। সেই পথ দেখো। তোমা হ'তে আমার পোষাবে না।'

রজনীকান্তের কথা শুনিয়া প্রভাবতীর কান্না আসিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীর কথার প্রতিবাদ করিতে তাঁহার বড় ভরসা হইল না। রজনীকান্ত ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পত্নীকে শুনাইয়া নিতান্ত ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন, 'সংসারে এই স্ত্রীলোকগুলা যত কূট অভিসন্ধির আকর। ইহাদিগকে যত বল, যত উপদেশ দেও, তবু প্রেমময়ীরা সোজা রাস্তায় যেতে শিখেন না। এ গুলোকে বিশ্বাস করার চেয়ে, সংসারে গুরুতর আহাম্মুকি আর কিছুই নাই

প্রভাবতীর বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। মনের আগুনে জ্বলিয়া তিনি আপনা আপনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এই সময় হইতে রজনীকান্ত অতি সতর্কতার সহিত প্রভাবতীর চরিত্রে লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং পত্নীকে শুনাইয়া যখন তখনই বলিতেন 'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু খলজনেষু চ।'

এদিকে প্রভাবতী যখন বুঝিতে পারিলেন যে সহজ পথ অবলম্বন করিলে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন তিনিও কৌশলে মায়াজাল বিস্তার করিয়া নিজকার্য্যসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন এবং

আপনার গত দুর্ব্যবহারের দরুণ যেন একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়া সকলের প্রতিই অত্যন্ত ভালবাসা ও স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রজনীকান্তের পায়ে কাটাটী ফুটিলে প্রভাবতী রজনীকান্ত অপেক্ষাও কষ্টানুভব করিতেন। রজনীকান্ত যেই স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেন, প্রভাবতীর তথায় বুক পাতিয়া দিতে ইচ্ছা হইত। গিরিজাসুন্দরীর পুত্র, কন্যা কাঁদিয়া উঠিলে, সর্ব্বাগ্রে প্রভাবতীর চক্ষে জল আসিত। সুবোধচন্দ্রের কোন পীড়া হইলে প্রভাবতী কাঁদিয়া ঠাকুরঘরে মাথা কুটিয়া জয়কালীর পূজা মানস করিয়া আসিতেন। রজনীকান্তও পত্নীর স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে মনে প্রবোধ পাইলেন। কিন্তু প্রভাবতী একদৃষ্টে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃত্তিকায় দুইহস্তের অঙ্গুলী ফুটাইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রায়ই বলিতেন 'আমি যদি খাটি বৈদ্যের ঝি হইয়া থাকি, তবে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিব,—করিব,—করিব।'

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রভাবতী বারাণ্ডায় বসিয়া মনে মনে ঐরূপ শপথ করিতেছেন এবং এক এক বার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এমন সময় কোথা হইতে পূর্ব্বকথিত পাগলিনী সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পাগলিনী উপস্থিত হইয়াই করতালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,

'হাঃ হাঃ
করবে তুমি, করবো আমি,
ঘটাবো মোরা ভাই,
ভাইয়ে ভাইয়ে,— ঘরে ঘরে,
ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই।

মায়া দিয়ে, ঘুম পাড়ায়ে,
নাচবো বাহা—বা,
প্রেতের নাচনা, প্রেত পুরেতে,
হাঃ হাঃ হাঃ।'

প্রভাবতী একদৃষ্টিতে পাগলিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পাগলিনী দুই তিনবার উক্ত পদাবলী আবৃত্তি করিয়া নাচিতে নাচিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভেকারাম তথা ভেকার মা

ছিন্নজিহ্বা বাঘিনীর ন্যায় প্রভাবতী প্রায় দুই বৎসর কাল নীরবে কাটাইলেন। ক্রমে তাঁহার উপর রজনীকান্তের বিশ্বাস যখন বদ্ধমূল হইল, তখন প্রভাবতী অতি সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রজনীকান্ত ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ ও ভগিনীকে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন, তাই রজনীকান্ত তাঁহাদের সহিত পৃথগন্ন হইবার কথা কাণে তুলিতেন না। প্রভাবতী ইহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। রজনীকান্ত বলিতেন যে, স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিতে নাই। কিন্তু প্রভাবতীও যেই স্ত্রীলোক, গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতাও সেই স্ত্রীলোক। রজনীকান্ত ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূকে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু প্রভাবতীকে বিশ্বাস করিতেন না। রজনীকান্ত প্রভাবতীকে অবিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়াছিলেন কিন্তু গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতাকে অবিশ্বাস করিবার কারণ পান নাই। গিজিাসুন্দরী ও হেমলতা তখন সৎ—তিনি অসৎ। তাঁহারা ভাল, তিনি মন্দ।

প্রভাবতী এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে পৃথগন্ন হইতে হইলে অগ্রে তাঁহাদিগকে স্বামীর নিকট বিষতুল্যা করিয়া লইতে হইবে। সুন্দরকে কুৎসিত বলিয়া, কুৎসিতকে সুন্দর বলিয়া, রজনীকান্তের ভ্রম জন্মাইতে হইবে। স্বামীর চক্ষুতে ধূলি দিয়া আপনার কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। সুতরাং প্রভাবতী এখন সেই চেষ্টায় মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে নিজে হস্তক্ষেপ করিলে পাছে রজনীকান্ত তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন, এইজন্য তিনি নিজে অন্তরালে থাকিয়া অন্য স্ত্রীলোকদ্বারা গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতাকে স্বামীর নিকট বিরাগভাজন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং সেই উদ্দেশে তিনি এক দিবস অপরাহ্নে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে গজেন্দ্রগমনে ভেকার মা নাম্নী একজন স্ত্রী-সেনানীর বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেনবাড়ী হইতে পাঁচ সাত খানা বাড়ীর উত্তরে ভেকার মার বাড়ী। এই বাড়ীতে স্বয়ং ভেকার মা ও তাহার পুত্র—সবে ধন নীলমণি—ভেকা ওরফে ভেকারাম, বাস করে। কোঁদল বিদ্যায় ও কূটবুদ্ধিপরিচালনে ভেকারমার বিষ্ণুপুর গ্রামে বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। ভেকার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর। কিন্তু এই ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমেও ভেকারাম ভেকারমায়ের দুলাল ছেলে। ভেকারাম কোন কাজকর্ম্ম করিত না। ভেকার মা মাসিক বেতনে ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে জল যোগাইত ও পর্য্যায়ক্রমে সেই সমস্ত বাড়ীতে আহার করিত। বেতন বাবদ যাহা পাইত তাহা দ্বারাই ভেকারামের আহার খরচ নির্ব্বাহ হইত। ভেকারামের এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই বলিয়া ভেকার মা বড়ই আক্ষেপ করিত। ভেকারাম নিজ হস্তে রন্ধন করিতে গেলে মায়ের অন্তরে পুত্রের গৃহশূন্যতা জনিত শোক উথলিয়া উঠিত।

এইজন্য নিজের কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া আসিয়া ভেকার মা প্রতিদিবসই পুত্রকে রন্ধন করিয়া দিত এবং ভেকারামের রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না বলিয়া ভেকার মা দুলাল তনয়কে একটী বাঁশের বাশী কিনিয়া দিয়াছিল। ভেকারাম তাহা লইয়া অর্দ্ধরাত্রি অতি-বাহিত করিয়া দিত। যখন বিষ্ণুপুরের জনপ্রাণী সুষুপ্ত থাকিত, তখন মধ্যে মধ্যে ভেকারামের মুরলীধ্বনি শুনা যাইত। তদ্ভিন্ন ভেকার মা, ভেকারামকে একখানা ছোট রকমের গোল আয়না, একখানা কাষ্টের চিরুণী, একজোড়া বহুকালের জীর্ণ চটিজুতা, একটী কাল ছেঁড়া জামা, একগাছি বেতেরছড়ী ও একখানা পুরাতনচাদর সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। বংশীবাদনক্রিয়া সমাপন করিয়া ভেকারাম এই সমস্ত দ্রব্যে সুসজ্জিত হইয়া প্রত্যহ রজনীতে বিষ্ণুপুর গ্রামখানা ঘুড়িয়া আসিত। ভেকারাম বিবিধ পশুর ডাক ডাকিতে বড়ই কৃতবিদ্য ছিল। সে রাত্রিতে কখনও বাঘের ডাক ডাকিয়া,কখনও ক্ষিপ্ত শৃগালের ডাক ডাকিয়া গ্রামবাসীদের আতঙ্ক জন্মাইত। কখনও বা মুখোস পরিয়া অন্ধকার রাত্রিতে গাছের তলায় বসিয়া থাকিত। কেহ সেই স্থান দিয়া গমন করিলে ভেকারাম বিকট আওয়াজ করিয়া লম্ফ দিয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িত। সে ব্যক্তি চমকিয়া উঠিলে বা চীৎকার করিলে ভেকারামের আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। তখন সে দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিয়া হাসিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিত। নষ্টচন্দ্র রাত্রিতে দলে দলে বালকগণ আসিয়া ভেকারামকে নেতৃত্বপদে অভিষেক করিত। ভেকারাম দলবল লইয়া গভীর রজনীযোগে বহির্গত হইয়া যাইত। পর-দিবস প্রাতঃকালে দেখা যাইত যে নানাবিধ ফল মূলের ত্বকে বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত ময়দান ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কারণ সত্বেও ভেকারাম বড় পরোপকারী ছিল। কাহারো বাড়ীতে বধূকন্যা

আনিবার কার্য্যটি ভেকারামের একচেটিয়া ছিল। দ্বিপ্রহরের রবি-কিরণে যখন কেহই বাহির হইতে সমর্থ হয় না, দেখিতে পাইবে, যে ভেকারাম হন্ হন্ করিয়া পাল্কীবাহকের সহিত চলিয়াছে। ভেকারামকে আদর করিয়া এক কল্‌কি তামাক খাওয়াইয়া বল, 'ভেকারাম, বাছাধন, আমাকে দশটী গাছের নারিকেল পাড়িয়া দিতে হইবে, দেখিবে মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার গৃহপ্রাঙ্গণে নারিকেলের স্তূপ পড়িয়াছে। পাড়ায় একটা দুর্দ্দান্ত গাভী ছিল. সে ছুটিলে সহজে কেহই তাহাকে ধরিতে পারিত না। ভেকারামের এমনি আশ্চর্য্য গুণ ছিল যে, সে একবার মাঠে দাঁড়াইয়া 'হম্বা—হম্বা, মঙ্গলী, মঙ্গলী' বলিয়া দু'চারি বার ডাক ছাড়িলেই গাভী দৌড়িয়া আসিয়া ভেকারামের সম্মুখে হাজির হইত। ভেকারাম শূদ্র বলিয়াই বিষ্ণুপুর গ্রামে প্রচার ছিল। কিন্তু তাহার পিতা কে তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারিতেন না। কিন্তু বসুজ মহাশয়ের সুন্দর নাসিকাটির মত ভেকারামের নাসিকাটি ছিল। দত্ত মহাশয়ের ডাগর ডাগর চোক্ দুটির ন্যায় তাহার চোক্ দুটি ছিল। কানাই চৌকিদারের গলার আওয়াজের ন্যায় ভেকারাম গলার আওয়াজ পাইয়াছিল। ভেকারামের গায়ের রঙ্‌টি সাদাও নয়, কালোও নয়, শ্যামও নয়, পাট্‌কিলেও নয়। তবে এই সমস্ত রঙের বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে যেরূপ বর্ণ হয়, ভেকারামের গায়ের বর্ণটী প্রায় ঠিক সেইরূপ ছিল। কিন্তু এই সমস্ত সুলক্ষণ সত্ত্বেও গ্রামের কতিপয় দুষ্ট লোক ভেকারামকে সমাজে বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। পুত্রকে শূদ্রবংশোদ্ভব বলিয়া প্রমাণিত করিতে ভেকার মা কানাই চৌকিদারকে সঙ্গে করিয়া মাজায় কাপড় বাঁধিয়া অনেক ভদ্র সন্তানকে সাক্ষী হাজির করিয়াছিল। সেই সময় হইতে ভেকারাম সমাজে একরূপ চলনসই রকমের হইয়া আছে।

ভেকারাম খায় দায়, বাঁশী বাজায়। আহার সম্বন্ধে ভেকারামের কখনও অরুচি হইত না। তাহার মাতা নিজে যাহা রন্ধন করিত, তাহার উপরও এবাড়ী হইতে ঝোলটুকু, ওবাড়ী হইতে ব্যঞ্জনটুকু আনিয়া পুত্রকে পরিতোষ মত আহার করাইত। কোন দিবস ভোজন-সামগ্রী অপ্রচুর হইলে ভেকারাম মায়ের উপর অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিত। সেই দিবস 'ভেকার মার 'দুলাল আমার, মানিক আমার, চাঁদ আমার' ইত্যাদি প্রকার কত মিষ্ট কথা বলিয়া পুত্রকে আহার করাইতে হইত।

এইরূপ দুলাল তনয়ের সহিত ভেকারমা বসিয়া কথোপকথন করিতেছে, এমন সময় প্রভাবতী মৃদুমন্দ গতিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে ভেকার মা বলিল, 'ও মা! বৌ ঠাকুরুণ যে, কি মনে করে?'

প্রভাবতী বলিলেন, 'বেশী কিছু নয়। জমি হ'তে কতকগুলো কুম্‌ড়ো এসেছে, এতগুলো খাবে কে, যদি পারিস্ কাল অবসর মত একবার যাস্, গোটা কত নিয়ে আসিস্।'

তখন ভেকার মা আদর করিয়া প্রভাবতীকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিল। বলিল 'তা যাব, বৌ ঠাকুরুণ, তা যাব। গরীবের বাড়ী এসেছ, এখন একটু বসো।'

এই বলিয়া ভেকার মা গৃহ হইতে একখানা কাষ্ঠাসন আনিয়া প্রভাবতীর সম্মুখে রাখিল। প্রভাবতী তাহাতে উপবেশন করিয়া ভেকার মার সহিত কিয়ৎকাল অন্যান্য বিষয়ের কথাবার্তা বলিলেন। তৎপর ভাবিতে ভাবিতে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

-০০০-

সখী-সংগ্রহ

পরদিন প্রভাতে প্রভাবতী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কেবল হস্তমুখ প্রক্ষালন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় 'কৈ গো! এ বাড়ীর কর্ত্রী ঠাক্‌রুণ কোথায়?' বলিয়া ভেকার মা তথায় উপস্থিত হইল। প্রভাবতী ভেকার মাকে লইয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তৎপর উভয়ে উপবেশন করিলে প্রভাবতী বলিলেন, 'তা মনে ক'রে এসেছিস্ বোন্, ভালই হয়েছে। গোটা কত কুম্‌ড়া দিব বলেছিলুম, এনে দি।'

ভে—মা। রাম! রাম! অম্‌নি কি আর আস্‌তে নাই?

প্রভা। তবু বোন্, তোরা দুঃখী লোক। দশ দুয়ারে মেগে খাস্। আমাদের তো তোদের বিষয় একটু একটু দেখা উচিত। এ আর বেশী কি? সময় সময় তোদিগকে দু'চার আনা দিতেও হয়।

ভে—মা। তা—তা—বউ ঠাক্‌রুণ,—তা—তা। তুমি হলে বড় মানুষের মাগ, বড় বাপের ঝি, তোমার হলো উচু নজর।

প্রভাবতী এই কথার পর একটি উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বলিলেন, 'ইচ্ছা তো কতই করে, বোন্। কিন্তু হলে কি হয়? এম্নি সংসার, যে হাত ওপর কর্ব্বার যোটি নাই।'

ভেকার মা একদৃষ্টে প্রভাবতীর মুখেরদিকে চাহিয়া রহিল। কি উত্তর প্রদান করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। প্রভাবতী পুনরায় বলিলেন, 'ঠাকুরঝির তো এম্নি পরাণ, কাউকে কিছু দিলে তার যেন কলিজা খসে পড়ে। আর বউটি আছেন, কিসে শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভাগ বাটারা ক'রে পৃথক্ হবেন, যেন কে কি লুটে খেলে।'

ভেকার মার এতক্ষণে জ্ঞানোদয় হইল। বলিল, 'ঠিক্ বলেছ ঠাক্‌রুণ। বউটি বড় ভাল নয়। ওর বড় নষ্টবুদ্ধি। মনে বড় কূট।'

প্রভা। তাতে কার কি হবে? ভালোর তরে, বলে দেখ্‌লুম, বুঝিয়ে দেখ্‌লুম, কিছুতেই যখন কিছু হলো না, তখন মরুন গিয়ে। আমারও ইচ্ছা, আর কর্ত্তারও ইচ্ছা ছিল, যে সবাই মিলে মিশে ঘর গৃহস্থালী চালাই। কিন্তু এরা যেরূপ আরম্ভ করেছে, তাতে পৃথক্ না হ'য়ে যে আমাকে সোয়াস্তি দেয় এরূপ তো বোধ হয় না।

ভে—মা। না, না,—তা দেবে না ঠাক্‌রুণ, তা দেবে না। শীগ্‌গির শীগ্‌গির পৃথক্ করে দেও।

প্রভাবতী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'আমার কি আর হাত আছে বোন্। সে কাহিনী কি বল্‌বো। দুঃখের কথা মনে হলে রেতে ঘুম হয় না' এই বলিয়া প্রভাবতী ভেকার মার নিকট নানাপ্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তার পর উপস্থিত কথা বন্ধ করিয়া ভেকার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'গ্যাখ্ ভেকার মা! তোর ভেকাকে বিয়ে করাবি না?'

ভেকার মা একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, 'এমন কি অদৃষ্ট করেছি ঠাক্‌রুণ। আমরা গরীব মানুষ, এত টাকা কোথায় পাব?'

প্রভা। কত টাকা হলে বিয়ে হয়?

ভে—মা। সাত কুড়ি দশ টাকা। তা দশ টাকা হাতে আছে, আর টেনে খিচে সাত কুড়ি টাকা হলেই যাদুকে বিবাহ করা'তে পারি।

প্রভা। দেখি যোগাড় ক'রে। যদি পৃথক্ই হতে হয়, তা হলে তো আর কিছুতে আট্‌কাবে না; আমিই না হয় টাকাটা চালিয়ে দেব। তার পর পারিস্, টাকা দিস্, পারিস্ খেটে শোধ করিস্।'

ভে—মা। তা—তা ঠাক্‌রুণ—তা তা। তুমি ইচ্ছা কর্‌লে কি না পার। তোমার দয়ার কি আর পার কূল আছে?

এই কথার পর প্রভাবতী ভেকার মার আরো একটু সম্মুখে যাইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, স্থাখ্ বোন্, যখন পৃথক্ হতেই হবে, তখন যত সকাল সকাল হয়, ততই ভাল। এবার বাড়ী হ'তে চলে গেলে আমি সেইরূপ চেষ্টা কর্ব্বো। তোকেও বোন্, একটু সাহায্য কর্ত্তে হবে।'

ভেকার মা প্রভাবতীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বীকৃতা হইল। বলিল, 'তা আর কর্ব্ব না ঠাক্‌রুণ! আমাকে যা কর্ত্তে বল, আমি তাই কর্ব্ব।'

তখন প্রভাবতী আর কোন কথা না বলিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে কতকগুলি কুম্‌ড়া আনিয়া ভেকার মার সম্মুখে রাখিলেন। বলিলেন, 'বৈকালে আবার বেড়াতে বেড়াতে এদিকে আসিস্।'

'তা আস্‌বো' বলিয়া ভেকার মা কুম্‌ড়াগুলিকে ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে একটীর এক স্থানে অঙ্গুলী দ্বারা টিপিয়া ধরিয়া অতি ক্ষীণ, অথচ শুনা যায়, এইরূপ স্বরে বলিল, 'এইটের এই জায়গায় খানিকটা দাগ লেগেছে, তা যাক্।' 'তবে ওটা রেখে দে'

বলিয়া প্রভাবতী আর একটি কুম্‌ড়া আনিয়া ভেকার মার সম্মুখে রাখিলেন। ভেকার মা সেগুলি লইয়া হৃষ্টমনে তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু যাইবার সময় নষ্টটিও রাখিয়া গেল না। ভেকার মাকে এত সহজে হস্তগত করিতে পারিয়া প্রভাবতী নূতন সেনাবলে বলীয়ান্ রণপণ্ডিতের ন্যায় দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন, এবং ভেকার মার দ্বারা গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার সহিত কলহ বাঁধাইবার অবসর খুজিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কলহের সূত্রপাত।

বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন যে মনুষ্যের আত্মার প্রভাব তাঁহার প্রতি রোমকূপ দিয়া বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং তদ্দরুণ কি প্রাণী জগতে কি উদ্ভিদ্ জগতে, এক অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের স্রোতঃ সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতেছে। কথাটা এক তিলও মিথ্যা নহে। তীর্থাদি স্থানে ধর্ম্মপ্রবণ পূতচরিত্র মহাপুরুষদের আত্মার প্রভাবে সেই স্থানের বায়ুমণ্ডলী এমন পবিত্র হয়, যে সেই স্থানে প্রবেশ করিবা মাত্র মন আপনা হইতেই যেন পবিত্র হইয়া উঠে। এমন কি, হিংস্র জন্তুরাও হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করে। তরুলতা পর্য্যন্ত নানারূপ ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়া দর্শকের হৃদয়ে এক স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যেখানে কুক্রিয়ান্বিত দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের বাস, সেই স্থানে প্রবেশ মাত্রই যেন মনে নানারূপ কুভাবের উদ্রেক হয়, কি এক পূতিগন্ধময় অশান্তির বাতাসে যেন মনুষ্য-আত্মাকে

সহসা নিরয়গামী করিয়া তুলে। এইরূপে, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের নৈকট্য ও সংসর্গের তারতম্যানুসারে একের অধিকতর শক্তিশালী আত্মা অপরের অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন আত্মার উপর অল্পাধিক পরিমাণে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া জীবচরিত্রে এক অত্যাশ্চর্য্য ভাবপরিবর্ত্ত আনয়ন করে। আবার, যেখানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে, প্রথমে একজন সদ্ভাবে ও আর একজন অসদ্ভাবে প্রণোদিত থাকেন. সেই স্থলে পুরুষ হৃদয়ই রমণীর আত্মার প্রভাবে ক্রমে বশীভূত হইয়া পড়ে। কারণ প্রকৃতিরূপিণী রমণীর শক্তির তুলনায় পুরুষহৃদয় স্বভাবতঃই—নিষ্ক্রিয় ও শক্তিহীন।

রজনীকান্তের অবস্থাও তদ্রূপই ঘটিল। প্রভাবতীর বাহ্যিক আচরণে যদিও ইদানীং কোনরূপ অশান্তির কারণ বিদ্যমান ছিল না, তথাপি রজনীকান্তের মনের শান্তি দিন দিনই হ্রাস হইতে লাগিল। কেমন একটা অবসাদ ও নিরুৎসাহ তাঁহাকে সর্ব্বদাই যেন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিত। যেরূপে সৎসঙ্গে সাধুদিগের আত্মার সদ্ভাবগুলি অপরের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। যেরূপে অসৎসঙ্গে দুষ্ট লোকের জঘন্যভাবনাগুলি আসিয়া মনুষ্যের আত্মাকে কলুষিত করিয়া তুলে, তেমনই প্রভাবতীর হৃদয়ের অলক্ষ্মীভাবগুলি অলক্ষিতভাবে রজনীকান্তের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া দিন দিনই তাঁহার অশান্তির বৃদ্ধি করিতে লাগিল। প্রভাবতী যদিও মুখে কোনরূপ অসদ্ভাব প্রকাশ করিতেন না, তথাপি তাহার হিংসাদ্বেষপরিপূর্ণ কুটিল অন্তঃকরণের ভাবপ্রবাহে রজনীকান্ত ক্রমেই নিস্তেজ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রকৃতি ক্রমে উন্মাদিনী-বেশে ধীরে ধীরে তাঁহার আত্মার উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল এবং তদ্দরুণ তাঁহার বৈষয়িক কার্য্যেও নানারূপ বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হইল। রজনীকান্ত অশেষ চেষ্টা

করিয়াও আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত বৈষয়িক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। ক্রমে আলস্য, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষা প্রভৃতি অলক্ষ্মীর সহচরীশক্তিগুলি আসিয়া রজনীকান্তকে আশ্রয় করিতে লাগিল। এদিকে হৃদয়ে অলক্ষ্মীর ভাব সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতেও অধঃপতনের আনুষঙ্গিক দৈব কারণগুলি দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমাগত দুই বৎসর উপর্য্যুপরি ফসল না হওয়ায় প্রজারা অনেকেই খাজানা দিতে পারিল না। এদিকে পাওনাদারগণ টাকার জন্য রজনীকান্তকে দিবারাত্রি তাগাদা করিতে আরম্ভ করিল। পিতৃ-শ্রাদ্ধে যে ঋণ হইয়াছিল, তাহার সুদ অনেক বাড়িয়া যাওয়ায়, মহাজনগণ টাকা আদায় করিয়া লইবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া রজনীকান্ত প্রজাদের নামে বাকী-খাজনার নালিশ করিয়া খাজনা আদায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন সুবিধা হইল না। প্রজারা সব একজোট হইয়া ধর্ম্মঘট করিল। যাহা কিছু আদায় হইত, তাহাও বন্ধ হইল। ক্রোধান্ধ হইয়া রজনীকান্ত প্রজাদের নিকট হইতে জোর জবরদস্তি করিয়া খাজনা আদায় করিতে তহশীলদারের উপর হুকুম প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে আরো অনর্থ ঘটিল। প্রজারা সকলে বিদ্রোহী হইয়া তহশীলদারকে মারপিট্ করিল। কাছারী ঘর আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দিল। সময় পাইয়া একজন মুসলমান তালুকদার পাঁচ ছয় শত টাকা মুনাফার এক তালুকে রজনীকান্তকে বেদখল করিয়া প্রজাগণের নিকট হইতে কবুলিয়ত গ্রহণ করিতে লাগিল। চারিদিকে বিপদ দেখিয়া রজনীকান্ত বড়ই বিব্রত হইয়া উঠিলেন। অনন্যোপায় হইয়া তিনি বিদ্রোহী প্রজাগণ ও মুসলমান তালুকদারের নামে নালিশ করিলেন। মোকদ্দমার ব্যয় সঙ্কুলনার্থ তাঁহাকে পুনরায় ঋণগ্রস্ত

হইতে হইল। উকিলদের সহিত পরামর্শ, সাক্ষী সংগ্রহ, মোকদ্দমার তদ্বির ইত্যাদি নানা প্রকার কার্য্যে, রজনীকান্তকে এই সময় হইতে প্রায়ই বাটীতে অনুপস্থিত থাকিতে হইত। মধ্যে মধ্যে দুই এক দিবস বাটীতে থাকিলেও তিনি কাহারো সহিত বিশেষ বাক্যালাপ করিতেন না। পাওনাদারগণের তাগাদা ও মাম্‌লা মোকদ্দমার চিন্তায় তাঁহার স্বভাব দিন দিনই খিট্‌খিটে হইয়া উঠিতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে কোনরূপ ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি হঠাৎ চটিয়া উঠিতেন এবং বিনা কারণেও লোকের উপর কটূক্তি প্রয়োগ করিতেন। পতির এইরূপ উগ্রস্বভাব দর্শনে প্রভাবতী মনে মনে যারপরনাই আনন্দ লাভ করিলেন এবং তাঁহার বাসনা চরিতার্থ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া ভেকার মার সহিত নানারূপ পরামর্শ আটিতে লাগিলেন, এবং এই সুযোগে গিরিজাসুন্দরী ও তাঁহার পুত্রকন্যাকে পৃথগন্ন করিয়া দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। অবশেষে সাত পাঁচ ভাবিয়া রজনীকান্ত একবার দুই তিন দিবসের জন্য বাটী হইতে চলিয়া গেলে, প্রভাবতী গিরিজাসুন্দরীর রন্ধন করিবার আতপ তণ্ডুল লুকাইয়া রাখিলেন এবং উহা বাড়ন্ত হইয়াছে বলিয়া কথোপকথনচ্ছলে সকলের নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গিরিজাসুন্দরী সে কথা শুনিতে পাইয়াও প্রভাবতীর অভিসন্ধি সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি অভ্যস্তমত প্রভাবতীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'বেলা হয়েছে, আমায় রাঁধ্‌বার চাল্ দেও না, বৌ ?'

প্রভাবতী নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বলিলেন, 'এই যে একশো বার চাল্ নেই, চাল্ নেই, ব'লে বলা হচ্ছে, শুন্‌তে পাও না !'

গিরি। সে কি বউ! সে দিন আধ মণ চাল্ এসেছে, এতগুলো চাল্ কি ক'রে খরচ হলো?

প্রভা। কিসে হলো, জান না? এক এক জনের পেটের গহ্বর আর তো কম নয়, পার তো আধ মণ চাল দু'দিনেই সাবার কর। (তারপর ভ্রূ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিতে লাগিলেন) আবার কথা বল্‌বার ভঙ্গিমে দেখ, এতগুলো চাল্ কি ক'রে খরচ হলো! কচি খুকী যেন আর খেতে জানেন না। মাগো মা! কি রাক্ষস গো, খেয়ে খেয়ে একটা সংসারকে একেবারে উচ্ছিন্ন কল্লে।'

প্রভাবতীর কথা শুনিয়া গিরিজাসুন্দরীর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং নিজ গৃহে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। জননীকে রোদন করিতে দেখিয়া নরেন্দ্র, চারুবালাও ক্রন্দন করিতে লাগিল; হেমলতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে ভাসিয়া গিরিজাসুন্দরী সমস্ত দিন অনাহারে কাটাইলেন। অপরাহ্ণ সময়ে হেমলতা, নরেন্দ্রকে আহার করাইয়া আনিলেন কিন্তু নিজে আহার করিতে আজ তাঁহার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। রাত্রিতেও প্রভাবতীর ভাতের থালাটী রীতিমত তাঁহার গৃহে রাখিয়া আসিয়া হেমলতা স্বয়ং অনাহারে রহিলেন।

পরদিবস বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু প্রভাবতী গিরিজাসুন্দরীর রন্ধন করিবার জন্য তণ্ডুলাদি দ্রব্যজাত কিছুই বাহির করিয়া দিলেন না। হেমলতা, গিরিজাসুন্দরীকে কোন পাড়া প্রতি-বেশিনীর বাড়ী হইতে তণ্ডুলাদি ধার করিয়া আনিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন কিন্তু গিরিজাসুন্দরী তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন না। অশ্রুজলে ভাসিয়া অভাগিনী কেবল আপনার দুরদৃষ্টের বিষয়ই চিন্তা

করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব দিবস সমস্ত দিন অনাহারে অতিবাহিত হইয়াছে এবং অদ্যও মধ্যাহ্ন সময় পর্য্যন্ত আহারের কোন উদ্যোগ হইতেছে না, দেখিয়া হেমলতা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি প্রভাবতীর অজ্ঞাতসারে ভাঁড়ার ঘর হইতে তণ্ডুলাদি বাহির করিয়া আনিলেন এবং গিরিজাসুন্দরীর রন্ধনের জন্য নিজেই উদ্যোগ করিয়া দিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রভাবতীর মনে অত্যন্ত সন্দেহ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং যে হাঁড়ীতে তণ্ডুল লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। হাঁড়ীর মুখ তিনি যেই প্রকার বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, দেখিলেন, উহা ঠিক সেই প্রকার নাই। অধিকন্তু গুটী কতক তণ্ডুল হাঁড়ীর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রকৃত বিষয় বুঝিতে প্রভাবতীর বিলম্ব হইল না। হেমলতা ভাঁড়ার ঘরে যাতায়াত করেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারা যে এই কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রভাবতী সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। ক্রোধে তাঁহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং রোষকষায়িত-লোচনে হেমলতার দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'কিলা ছোট বৌ! বড় নাকি গিন্নিপনা কর্চ্ছিস্?'

হেমলতা ত্রস্তভাবে উত্তর করিলেন, 'ঠাকুর ঝি আজ দু'দিন কিছু খায়নি; তাই চারটি চাল্ এনে দিয়েছি, এ আর গিন্নিপনা কি, বড়দিদি!'

প্রভা। নয় কিসে? এই যে চাল্ দেওয়া হচ্ছে, এ যাচ্ছে কার?—তোমার, না ইজমালী?

হেম। কি বল্‌ছ, দিদি?

প্রভা। কেন শুন্‌তে পাও না, কাণ বন্ধ হয়েছে নাকি ?

হেম। বুঝ্‌তে পারি নি।

প্রভা। চুপি চুপি এত কর্ত্তে পার, আর এইটুকু বুঝ্‌তে পার না ?

হেম। বুঝ্‌তে পাল্লে তোমায় জিজ্ঞেস কর্ব্ব কেন, বড় দিদি ?

প্রভা। এর আর বোঝাবুঝি কি! এ সোজা কথা। ঠাকুর পো এখনও নাবালক। তার বিষয় আশয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার এখন এদের উপর। এই যে দ্রব্য ক্ষতি করা হচ্ছে ; এর দায়ী হবে কে ?

হেম। আমি তো কোন দ্রব্য ক্ষতি করি নাই, বড়দিদি। নরেন চারু সারাদিন কিছু খায় নি। ঠাকুর ঝি আজ দু'দিন উপোষ কর্চ্ছে, তাই—

প্রভা। থাক্, আর গিন্নিপনায় কাজ নেই। বলি, ইজমালী তহবিল হইতে এখন দেওয়া দেয়ি বন্ধ কর। এর পর পৃথক্ হ'য়ে যা কর্ত্তে হয় করো।

এই বলিয়া প্রভাবতী গিরিজাসুন্দরীর উপর দু' চারিবার বিদ্রূপ-কটাক্ষ করিয়া এবং হেমলতাকে নানারূপ রূঢ় ভাষায় গালাগালি করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রভাবতী চলিয়া গেলে হেমলতা 'ভগবন্! এই কি তোমার মনে ছিল' বলিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সময় কতিপয় রমণী ও ভেকার মা, সেনবাড়ীর পুকুর হইতে জল লইয়া ফিরিতেছিল। ভেকার মা, একটা গোলযোগ বাঁধাইবার জন্য সর্ব্বদাই অবসর খুজিতেছিল। সে কৌশল করিয়া হীরি ও বামা নাম্নী দুইজন স্ত্রীলোককে সেইস্থানে দাঁড়া করাইল। তৎপর হিতোপদেশচ্ছলে হেমলতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'ছিঃ মা! দিন দু'পরের বেলা অমন করে হাঁ হুতাশ কর্ত্তে আছে ? এতে অমঙ্গল হবে যে। ঘরে লক্ষ্মী থাক্‌বে না'।

গিরিজাসুন্দরী নিজে মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছিলেন, এমন সময় ভেকার মা'র এই হিতবাক্য তাঁহার সহ্য হইল না। 'বৌকে কি বল্‌ছিস্ লা ভেকার মা ? দূর হ' বলিয়া তিনি ভেকার মাকে ভৎর্সনা করিলেন। ভেকার মা অমনি প্রস্তুত হইল। সে আর কালবিলম্ব না করিয়া জলের কলসী মাটিতে রাখিল। তৎপর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গিরিজাসুন্দরীর প্রতি মুখ বক্র করিয়া বলিল, 'ইস্' একেবারে তেড়ে উঠ্‌লে যে, মার্ব্বে না কি ?'

সেই সময় 'কি হয়েছে লা, ভেকার মা, তোরা সব বল্‌ছিস্ কি' বলিয়া প্রভাবতী অনতিবিলম্বে আসিয়া অভিনয়ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তখন ভেকার মা মায়াকান্না কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, 'এই দেখ না বড় বউ ঠাক্‌রুণ! ছোট বৌ কাকে শাপ দিচ্ছিল, আর 'ভগবান্ ভগবান্' ব'লে ডাকছিল। আমি যেই হিতকথা বল্লুম—'মা ! তুমি গৃহস্থের বউ এ ছেলেপিলের ঘর, অমন ক'রে কি শাপ দিতে আছে বাছা! অমনি দিদি ঠাক্‌রুণ একেবারে তেলে বেগুনে জলে উঠ্‌লেন আর আমাকে যা ইচ্ছা তাই বল্‌তে লাগ্‌লেন'।

প্রভা। তা মনে কিছু করিস্ নে বোন্, মনে কিছু করিস্ নে। এরা যদি সব মনুষ্যি হবে, তবে আর আমার ভাবনা ছিল কি ?'

ভেকার মা পুনরায় বলিল, 'না, বৌ ঠাক্‌রুণ এর একটা বিহিত কর। আমরা গরীব লোক। তোমাদের পুকুর হ'তে জল নি ব'লে কি এতটা অপমান কর্ব্বে ? না হয়, আজ হ'তে ঘোষেদের দীঘিতে যাব'। ভেকার মা এইবার একবিন্দু অশ্রু নিক্ষেপ করিল। প্রভাবতী বলিলেন, 'কেন ? তোকে কেউ জল নিতে নিষেধ করেছে নাকি ? এ ইজমালী পুকুর। এর উপর আবার মালিকানা হচ্ছে নাকি ?

ইস্, একরত্তি বউ, তার এতটা আস্পর্দ্ধা। না, এর একটা বিহিত কর্ত্তেই হবে। হীরি! বামা! তোরা সব ছিলি কোথা?'

হীরি। এইখানেই ছিলুম, বউ ঠাক্রুণ, এইখানেই ছিলুম।

প্রভা। তোরা কিছু বল্লি নি?

বামা। আমরা দেখে শুনে অবাক্ হয়েছি।

'তোরা সব দাঁড়া, একবার জিজ্ঞেস করে দেখি' বলিয়া প্রভাবতী দুই এক পা অগ্রসর হইলেন, এবং হেমলতার দিকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'কিলা, ছোট গিন্নি, এরা সবে বল্‌ছে কি?' গিরিজাসুন্দরী সেই কথার উত্তর প্রদান করিলেন। বলিলেন, 'দেখ বড় বউ! এ ছেলে মানুষ। একে অমন ক'রে জ্বালাতন করো না, এ ধর্ম্মে সইবে না।'

ভে—মা। এই শোন বড় বউ ঠাক্রুণ, এই শোন। তোমরা তো আমাদের গরীব লোকের কথা বিশ্বাস করো না। দিদি ঠাক্রুণ কাকে কি বলেন তার ঠিকানা নাই।

প্রভা। বিশ্বাস না কর্ব্বারই কথা। (অতঃপর একটু কোমলকণ্ঠে বলিলেন) তা কি করবি বোন্! দেখ্‌লি তো, আমি যে একজন আছি, আমাকে এরা বিড়াল কুকুর বলেও গ্রাহ্য করে না।

হীরি। ওমা! তুমি হ'লে বাড়ীর কর্ত্রী। সংসারের ভাল মন্দের ভার তোমার উপর! তোমাকে গ্রাহ্য করে না গা?

প্রভা। হলে কি হয়। আমি যাই ভাল বলি, এরা বোঝে উল্টো। পোড়া মন বোঝেনা, তাই এদের জন্য কেঁদে মরি।

এই বলিয়া প্রভাবতী একটি কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং এই ঘটনা হইতেই পৃথগন্ন হইবার সূত্রপাত করা হইবে, মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখি-

লেন। প্রভাবতী চলিয়া গেলে হীরি বামাও প্রস্থান করিল। ভেকার মাও এক পায়ে দুই পায়ে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

সেই দিবস হইতে প্রভাবতীর গুণরাশি এবং হেমলতা ও গিরিজা-সুন্দরীর দোষরাশি হীরি বামা ও ভেকার মা প্রভৃতির মুখে নানা প্রকারে রঞ্জিত হইয়া বিষ্ণুপুরের প্রতিবাড়ীতে প্রচারিত হইতে লাগিল এবং এই সময় হইতে প্রভাবতীর প্রয়োজন ও অভিপ্রায় অনুসারে ভেকার মা কখনও বা তাহার নিজের বাড়ীতে কখনও বা প্রভাবতীর গৃহে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নবীনা ঠান্‌দিদি।

বেলা অপরাহ্ন। হেমলতা গৃহমধ্যে একখানা ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনের উপর নরেন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া আছেন। এমন সময় হাসিতে হাসিতে দুলিতে দুলিতে চপলকুমারী নাম্নী একজন যুবতী পৌর স্ত্রী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চপলকুমারী বৃদ্ধ শ্যামসুন্দর রায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বর্ণ গৌর, দেখিতে সুশ্রী। চপলকুমারী বর্ষাকালের স্ফীতসলিলা গঙ্গার ন্যায় যৌবনের পূর্ণজোয়ারে উছলিয়া উঠিয়াছেন। বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ। চপলকুমারী অত্যন্ত আমোদপ্রিয়া। চপলকুমারীর মুখে সদাই হাসি। এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার মলিন মুখ দেখিতে পায় নাই। তিনি যেই স্থানে গমন করেন, সেই স্থানই হাস্য কৌতুকে উল্লসিত হইয়া উঠে। চপলকুমারী কথায় কথায়ই ছড়া বলেন ও কবিতা আবৃত্তি করিতে ভালবাসেন। চপলকুমারীর নিজের কোন সন্তান হয় নাই। তবে, তিনি শিশু মাত্রকেই অত্যধিক স্নেহ করিতেন। শিশু পাইলেই তিনি হয় চিম্‌টী কাটিয়া নতুবা তাঁহার গণ্ডস্থলে ছোট রকমের একটি চাপড় দিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিতেন। আবার পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে তাহাকে

ক্রোড়ে করিয়া নানারূপ মিষ্টকথায় আশ্বস্ত করিতেন। কোন কোন সময় তিনি তিনটি চারিটি বা ততোধিক বালক বালিকা ধরিয়া, ছেলেগুলিকে মেয়ের মত এবং মেয়েগুলিকে ছেলের মত কাপড় পড়াইয়া দিয়া রঙ্গ করিতেন। কখনও বা তাহাদের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া বাঁধাইয়া কৌতুক দেখিতেন। ছেলেপিলেগুলি চপলকুমারীকে বড় ভাল বাসিত এবং তাঁহার হস্তে খাবার বস্তু দেখিলেই ছুটিয়া আসিত। চপলকুমারীও খাবার বস্তু পাইলেই দুর হইতে তাহা দেখাইয়া বালক বলিকাগুলিকে নীরবে আহ্বান করিতেন। আবার তাহারা আসিতে না আসিতেই পুনরায় উহা লুকাইয়া ফেলিতেন এবং সকলকে একবার না কাঁদাইয়া কিছুতেই তাহা প্রদান করিতেন না।

বৃদ্ধ শ্যাম সুন্দর রায়ের পরিবার মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি লোক। স্বয়ং রায় মহাশয়, তাঁহার দুইটি বিধবা ভগিনী, একজন চাকর ও চপলকুমারী। চপলকুমারী ঠাকুর দেবতার প্রতি নিরতিশয় ভক্তিপরায়ণা ছিলেন, এবং হিন্দুর আচার পদ্ধতি তিনি নিতান্ত শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া চলিতেন। বাড়ীতে একটি শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত ছিল, চপলকুমারী তাঁহার সেবিকারূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বৃদ্ধ শ্যামসুন্দরের বাড়ী প্রথমে'রায়বাড়ী' বলিয়াই বিখ্যাত ছিল। কিন্তু চপলকুমারী রায় মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ করিয়াই উহাকে রায়বাড়ীর পরিবর্ত্তে 'ঠাকুরবাড়ী' বলিয়া নূতন আখ্যা প্রদান করিলেন এবং যাহাতে এইনাম আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে সম্যক্ প্রচারিত হয়, তজ্জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ডাকঘরের চিঠি পত্রে তিনি ঠাকুরবাড়ীর নাম ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তদ্ব্যতীত বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্মের উপলক্ষ করিয়া তিনি ঠাকুর বাড়ীর নামে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করা-

হইতে লাগিলেন। চপলকুমারীকে ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন—'হিন্দুরবাড়ী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবাড়ী, ঠাকুরবাড়ী নয় তো কি বলা যাইতে পারে?' 'আমার বাড়ী,' 'রায়বাড়ী' বলিলে কেমন একটা আসক্তির ভাব, অহংভাব আসিয়া পড়ে। ঠাকুরের বাড়ী, ঠাকুরের ঘর, সমস্তই ঠাকুরের। তাই, ঠাকুরের নিদ্রায় আমাদের নিদ্রা, ঠাকুরের জাগরণে আমাদের জাগরণ। ঠাকুরের ভাণ্ডার, ঠাকুরের ভোগ, আমরা তাঁহার প্রসাদভোজী জীব মাত্র।'

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া চপলকুমারী গৃহপ্রাঙ্গণাদি পরিষ্কার করিয়া গোময়দ্বারা উহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতেন। তৎপর ঠাকুরের ভোগ হইলে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। চপলকুমারীর মাতৃভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। অবকাশ পাইলেই তিনি বাঙ্গলা ভাষার নানারূপ সদ্গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। গ্রামের সকল বউ ঝির সহিতই চপলকুমারীর প্রীতি ও ভালবাসা ছিল। তবে হেমলতার সহিত তাঁহার একটু বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। এইজন্য প্রভাবতী চপলকুমারীর উপর একটু চটা ছিলেন।

বিষ্ণুপুরের অনতিদূরে কোন গ্রামে তুলসী পাগলিনী বাস করিত। চপলকুমারী তাঁহাকে পাগ্‌লী মাসী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সে প্রায়ই বিষ্ণুপুরে আসিত। আসিয়াই একবার চপলকুমারীকে দেখা দিত। চপলকুমারী প্রতিবারই স্বয়ং নিকটে বসিয়া তাঁহাকে ষোড়শোপচারে ভোজন করাইতেন। কাহারো কষ্ট দেখিলেই চপলকুমারীর চক্ষুতে প্রস্রবণ বহিত। পারিলে, তিনি তাঁহার যথাসাধ্য উপকার করিতেন। দীন দুঃখীদিগের তিনি একরূপ মাতৃস্থানীয়া ছিলেন।

চপলকুমারী বৃদ্ধ শ্যামসুন্দর রায়ের বড় আদরের পাত্রী। রায় মহাশয়ের বয়ঃক্রম যদিও পঞ্চাশের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে, তথাপি

চপলকুমারী তাঁহাকে ঘৃণা বা তুচ্ছ করেন না। বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে পড়িয়াছেন বলিয়া তিনি বিন্দুমাত্রও দুঃখিতা নহেন। বরং বৃদ্ধকে তিনি যেইরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা ও সোহাগ করেন, যুবতীগণ স্ব স্ব যুবক পতিকেও তদ্রূপ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। কোন কোন দিন চপলকুমারী স্বীয় পায়ে আল্‌তা পরিয়া, অধরযুগল তাম্বুলরাগে রঞ্জিত করিয়া, নাতিদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদাম পৃষ্ঠদেশে ঈষৎ দোলাইয়া দিয়া, রাজরাজেশ্বরীবেশে আসিয়া বৃদ্ধ শ্যামসুন্দরের বামে উপবেশন করেন এবং তাঁহার কণ্ঠদেশ কুসুমমাল্যে বিভূষিত করিয়া দুই হস্তে বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া—'তুমি আমার রসরাজ, তুমি আমার মদনমোহন, তোমায় আমি ভালবাসি, তোমায় না দেখ্‌লে রইতে নারি'—ইত্যাদি বলিয়া স্বামীকে সোহাগ করেন এবং হাসির লহরে গৃহ আমোদিত করিয়া তুলেন। প্রমোদিনী স্ত্রীর বিমল প্রমোদে, বৃদ্ধের রসের সাগর উথলিয়া উঠে। বৃদ্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার অধিককাল বাঁচিবার প্রত্যাশা করেন।

শ্যামসুন্দর রায় গ্রাম সম্পর্কে রজনীকান্ত ও সুবোধ চন্দ্রের ঠাকুরদাদা। রায় মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। সেনবাড়ী হইতে রায়বাড়ী মাত্র একরসি ব্যবধান। সুতরাং এক বাড়ীতে কোন ঘটনা ঘটিলে অপর বাড়ীর লোক সহজেই তাহা জানিতে পারিত। চপলকুমারী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই স্বাভাবিক কৌতুকব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন,

'অ-গিন্নি,-ছোট গিন্নি,
বড় মানুষের ঝি ;—
বলি, আজ হয়েছে কি ?
ভাল আছিস্‌ তো ?'

হেম। বসো, দিদি, বসো।

চপল। 'দিদি' কি লো! 'ঠান্‌দি' বল্‌বি।

হেম। 'ঠান্‌দি' বড় বুড়ো ডাক।

চপল। মিছে কথা! দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না,

আমার হৃদয় চকোর,—

শ্যামসুন্দর,—

ঠাকুর দাদা তোর ;

রসের সাগর, নবীন নাগর,

হয়ে গেছে মোর।

তাতে, ডাক্‌টি লাগে 'বুড়ো'

—ছুঁড়ী—তাতে ডাক্‌টি লাগে

'বুড়ো"।

এই বলিয়া চপলকুমারী বাম হস্তে হেমলতার মস্তক ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে তাঁহার চিবুক খানা নাড়িয়া দিলেন। হেমলতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তা, বুড়ো দাদা, নবীন নাগর কবে হলো, ভাই' ?

চপল। কবে হলো জানিস না,—

মানস-যৌবন লভি, যো দিন বল্লভ

ভাসিল, প্রেমের সখি! নবীন তরঙ্গে।

হেম। তা প্রেমতরঙ্গে ঠাকুরদাদা কূল পাবেন তো?

চপল। নেহি কূল, নেহি ক্লেশ, মুদি আঁখি ধীরে,

ভাসওত, নাচওত, অবশ আবেশে,

দুঁহুঁ প্রাণী গাঁথা সখি! বীণা-সূত-ডোরে,

ধাওত কাঁহা যেন সঙ্গম-পিয়াসে।

হেম। সে কেমন, ঠান্‌দিদি?

চপল। হৃদয়রাসমন্দিরে মহাসমাধি। সে মিলনে প্রেম আছে, কায়িক সম্পর্ক নাই। সুখে আছে, দুঃখ নাই। কেবল এক অচ্ছেদ্য—স্বর্গীয়—বিমল আনন্দ।

হেম। তোমাকে পেরে উঠা ভার। (তারপর অন্যদিকে কথা ফিরাইবার জন্য বলিলেন) এখন ভাই কি মনে করে?

চপল। তোর সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগ্‌ড়া কর্ত্তে।

হেম। অপরাধ?

চপল। অপরাধ, ইজমালী পুকুরের উপর মালিকানা করা। অ—ছুঁড়ী তোমার পেটে পেটে এত?

হেমলতার মনে পূর্ব্বস্মৃতি পুনরায় জাগরিত হইল। মুখ মণ্ডল ঈষৎ মলিন আভা ধারণ করিল। চপলকুমারী তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'অমন করবি তো চলে যাব, কি হয়েছে, বল্‌'।

হেম। কি বল্‌বো ভাই!

চপল। ভেকার মাকে কে কি বলেছিল?

হেম। কেহ কিছু বলে নি। সে আমাদের ঘরে লক্ষ্মী থাক্‌বে না বলে, আমাকে কি বল্‌তে এসেছিল, তাতে ঠাকুরঝি তার উপর একটু রাগ করেছিল মাত্র।

চপল। তাতেই এত কাণ্ড?

হেম। হেঁ ভাই। তাতে সে মিছামিছি, আমার নামে, বড়দিদির কাছে, কত কি বল্লে, আর দিদি তার কথায়ই বিশ্বাস করে, রাগ কর্ত্তে লাগ্‌লো।

চপল। এর পূর্ব্বে কিছু হয় নি?

হেম। আর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ঠাকুরঝিকে চারটী চাল্‌ দিয়েছিলুম। এই আমার অপরাধ।

চপল। লুকিয়ে দিলি কেন?

হেমলতার মুখ আরো গম্ভীর হইল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, 'সে কথা কি শুনবে, ভাই?'

চপল। বল্‌বি না? তা হলে চলে যাই?

হেম। না ভাই বসো। ঘরে চাল্ লুকিয়ে রেখে বড়দিদি ঠাকুর-ঝিকে চাল্ দিলে না, তাই বড়দিদিকে না ব'লে চারটী চাল্ দিয়েছিলুম।

চপলা। সে কি লো! তা চাল্ লুকিয়ে রাখ্‌লে যে?

হেম। আমি কি করে জানবো ভাই! প্রায়ই বলে, 'নাবালকের বিষয়, এত বাজে খরচ হয়।'

চপল। ওমা! ভিতরে ভিতরে এত হচ্ছে, আমাকে একদিন বলিস্ নি?

'কি বল্‌বো ভাই? ঘরাও কথা' বলিয়া হেমলতা মৃত্তিকার দিকে মুখ অবনত করিলেন এবং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন,

'দ্যাখ্, ভাই, এই ছোঁড়াটাকে কষ্ট দিবার জন্য, ওঘরেও সারাদিন কিছু রাঁধ্‌তে দেয় নাই। একেবারে শেষ বেলায় রাঁধ্‌তে গেলুম,'—

বলিতে বলিতে হেমলতার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। লোচন হইতে বন্যার জলের ন্যায় অশ্রুজল বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা বদনাবৃত করিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। অতঃপর চপলকুমারী পুনরায় বলিলেন, 'দ্যাখ্, তোর বড় দিদি, ক'দিন ধরে এরূপ কর্চ্ছে?'

হেম। অনেক দিন। কিন্তু পূর্ব্বে এতটা করেন নাই।

চপলা। আরো কি কখনো খোকার মার চাল ডাল বন্ধ করেছে?

হেম। না। তবে দেওয়ার সময় মাঝে মাঝে কটু কথা বল্‌তেন।

চপল। তা কর্ত্তা কিছু বলেন না?

হেম। তিনি এর কিছুই জানেন না।

চপল। এই তো তোর বুদ্ধি। আমার বিশ্বাস, তিনি সবই জানেন। জেনেও কিছু বলেন না।

হেম। না ভাই! তাকে দোষ দিও না। তিনি বড় ভাল মানুষ।

চপল। খোকার মা, ভাইকে কিছু বলে না?'

হেম। বল্লেও, বড়দিদি এম্‌নি ভাবে কথা বল্‌তে থাকেন, যে তিনি কিছুই বুঝ্‌তে পারেন না। আর তিনি বাড়ী থাক্‌লে, বড়দিদি সকলের সঙ্গেই ভাল ব্যবহার করেন।

চপল। তবে দেখ্‌ছি লোকটি বড় সোজা নন। এর মধ্যেই উগ্রচণ্ডিকাবেশে স্বামিহৃদয়ে আপনার আধিপত্য বিস্তার কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছেন।

হেম। সে কি ভাই?

চপল। বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না? যোগনিদ্রার ভাবে প্রথমে ভ্রাতারকে মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন কর্ব্বেন। কাজে কাজেই চৈতন্য ঠাকুরকে শবভাব অবলম্বন কর্ত্তে হবে।

হেম। তোর ভাই, সকল সময়েই তামাসা।

চপল। না, না, তামাসা নয়। ইহাই সত্য কথা। যাহা জীবের প্রকৃতি, তাহাই মায়ের প্রকৃতি। তাই, মা—প্রকৃতিরূপিণী। তোর বড় দিদি, এখন প্রকৃতির তামসী ভাবের অভিনয় কর্চ্ছেন। যেখানে নারীচরিত্রে মায়ের তমোময়ীকালিকাভাবের বিকাশ, সেখানে পুরুষকারকে শবরূপ শিবভাব অবলম্বন না ক'রে আর উপায় কি ভাই? এর পর, আরো কত হবে, দেখ্‌তে পাবি। কত ভূত প্রেত জুট্‌বে। কত নাগিনী ডাকিনী প্রতিবেসিনী এসে, মায়ের সে তাণ্ডবলীলার

সহায়তা কর্ব্বে। কত সংকীর্ণতা, কত মনোমালিন্য এসে উপস্থিত হবে। ভাইয়ে ভাইয়ে কতরূপে বিচ্ছেদ ঘটাবে। তারপর, এই সাধের বাসর ঘরে শ্মশানশয্যা প্রস্তুত করে তদুপরি উন্মাদিনী বেশে তাথৈ থৈ থৈ নৃত্য কর্ব্বেন।

হেমলতা কি বলিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় তুলসী পাগলিনী হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া নাচিয়া নাচিয়া করতালি দিয়া বলিতে লাগিল,

'হাঁঃ হাঁঃ
তিনিই আমি, আমিই তিনি,
এম্‌নি দুটী সই,
সাধের ঘরে, আগুন জ্বেলে,
নাচ্‌বো থৈ থৈ।
জীব চরিত্র, মধ্য দিয়ে,
খেল্‌ছি আমি যা,
চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো,
হাঃ হাঃ হাঃ।'

এই বলিয়া পাগলিনী করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল। যতদূর দেখা গেল চপলকুমারী আকুল প্রাণে এক দৃষ্টিতে পাগলিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার দু'নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আগুন ধরিল।

তুমি কুলবালা, কুলবধূ, সংসার-মরুতে প্রস্রবণস্বরূপিণী গৃহলক্ষ্মী, তোমায় আমি ভালবাসি। যখন পরিশ্রান্ত স্বামী প্রচণ্ড রবিকিরণে দগ্ধ হইয়া বিশ্রামলালসায় তোমার আশ্রয় অনুসন্ধান করে; যখন তুমি সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইয়া, আপনার উপাস্য দেবতার শ্রান্তি অপনয়নে ব্যস্ত হইয়া পড়; যখন তুমি কুলুকুলুনাদিনী মধুর-ভাষিণী সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় সুশীতল বাক্যসুধাবারিসিঞ্চনে প্রাণ-পতির হৃদয়ানল প্রশমিত করিতে যত্নবতী হও; তখন তোমার স্বভাবের সেই শান্তিরূপা বিশ্বমনোমোহিনী জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আমি আত্মহারা হই। কিন্তু আবার যখন তুমি মায়াবিনী যোগ-নিদ্রার ভাবে স্বামিহৃদয়ের গূঢ়তম অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া নানারূপ মোহিনীমায়া বিস্তার করতঃ তাঁহার বিবেক বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লইয়া প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হও; যখন স্বামীকে যন্ত্রচালিত

ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় স্বেচ্ছামত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রীতির নন্দন-কাননে শ্মশানক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া, ক্ষিপ্তা পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাক; যখন সমস্ত সংসারে জ্বলজ্জিহ্ব প্রমত্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, উগ্রচণ্ডিকামূর্ত্তিতে অট্টহাসি হাসিয়া, বিকটোল্লাসে নৃত্য করিতে থাক; তখন তোমার স্বভাবে সেই ভয়ঙ্করী তারাচরিত্র কল্পনা করিতেও আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠি। সুতরাং হে বিলোলকটাক্ষ সুরসুন্দরি নিষ্ক্রিয়পুরুষহৃদ্বিহারিণি শোভনে!—তোমার ঐ ফুল্লরক্ত-কুসুমসদৃশ লালটুক্‌টুকে মুখখানির আমি বড় পক্ষপাতী নহি। তোমার ঐ সততনর্ত্তনশীল দুলালী ধরণের মোহনভঙ্গী দেখিয়া যাঁহার মন ভোলে, ভুলুক; তোমার ঐ আধবিকশিত আধলুকায়িত নয়নতারার চুম্বক-আকর্ষণে পৃথিবী তন্ময় হয়, হউক, কিন্তু আমি,—এই অকিঞ্চন পুরুষাধম, হে নরহৃদয়াধিষ্ঠাত্রি চরিত্রসঞ্চালনীশক্তিস্বরূপিণীদেবকন্যে! আপনাদের জাতীয় প্রকৃতি যৎকিঞ্চিৎ অবগত আছি। আপনাদের নিশ্বাস সুধু মলয়ানিল নয়, উহাতে অনল আছে। হাসি, সুধু মধুমাখা নয়, উহাতে বিষ আছে। কটাক্ষ, কেবল সরলতাময় নহে, উহাতে দুরভিসন্ধি আছে। অশ্রু, কেবল হৃদয়মন্দাকিনীর দ্রবীভূত ধারা নহে। উহাতে কুম্ভীর আছে—তরঙ্গ আছে—কূলধ্বংসকারিণী লুকায়িত-উপকরণাবলি আছে।

বেলা দ্বিপ্রহর। সমস্ত সংসার রবিকিরণে খা খা করিতেছে। রজনীকান্ত আজ দুই দিবস পর স্বীয় জমিদারী কাছারী হইতে প্রত্যাগত হইয়া আহার করিতে বসিয়াছেন। প্রভাবতী স্বামীর নিকট উপবেশন করিয়া তাঁহার ভোজনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে স্বীয় অঞ্চল দ্বারা স্বামীকে বাতাস করিয়া স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। প্রভাবতী স্বামীকে অদ্য সংসারনীতি-

বিষয়ক একটী সারগর্ভ উপদেশ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু রজনীকান্ত একে ক্ষুধার্ত্ত, তাহাতে মাম্‌লা মোকদ্দমার চিন্তায়, তাঁহার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন, তাই তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবতী হৃদয়বীণাতে সুর সংযোজন করিয়া উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। রজনীকান্ত আহার করিতে করিতে এক একবার পত্নীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন, প্রভাবতীও ইত্যবসরে স্বামীর হৃৎসিংহাসনে, আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইতে ত্রুটি করিতেছেন না। প্রভাবতী নীরব। রজনীকান্ত নিস্তব্ধ। তথাপি সেই নিস্তব্ধতার মধ্যদিয়া, এক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, রজনীকান্ত তাহা দেখিতেছেন না। অথচ তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টি, প্রত্যেক কার্য্য, হৃদয়স্থ ভাবসমূহের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া প্রভাবতীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে; প্রভাবতী তাহা পাঠ করিতেছেন এবং পাঠ করিয়া স্বকার্য্যসাধনাভি-প্রায়ে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ধন্য প্রভাবতী, তুমি ধন্য। ধন্য তোমার সাধনাকৌশল। রজনী-কান্তের কি সাধ্য যে তোমার অন্তর্নিহিত বীজমন্ত্রের রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া তোমার মন্ত্রজপের প্রতিকূলাচরণ করে। রজনীকান্ত! সাবধান, দেখিও মাধ্যাহ্নিক আহার করিতে বসিয়া, আজ কালকূট হলাহল ভক্ষণ করিয়া ফেলিও না। পানীয়ের পরিবর্ত্তে মদিরা পান করতঃ জ্ঞানহারা হইয়া তোমার সাধের জীবনতরীকে উত্তাল তরঙ্গে নিক্ষেপ করিও না।

রজনীকান্তের আহার-কার্য্য প্রায় সমাধা হইয়া আসিল; প্রভাবতী তবুও স্বামীকে বাতাস করিতেছেন। বাতাস করিতে করিতে সময় বুঝিয়া বলিলেন, 'ছি! তোমার শরীরের উপর একটু মায়া মমতা নেই।'

রজনীকান্ত পত্নীর মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন ?'

প্রভাবতী বলিলেন, 'এই খাড়া রৌদ্র, এর মধ্যে এতটা পথ চল্‌তে আছে! এতে অসুখ হবে যে!'

রজনীকান্ত ভাবিলেন,—প্রভাবতী কি পতিব্রতা! কিসে স্বামী সুখে থাক্‌বে, কিসে স্বামীর শরীর সুস্থ থাকবে, তাহাই তার জল্পনা। বলিলেন, 'তা কি কর্ব্ব। তবু যদি সম্পত্তি রক্ষা হয়।'

প্রভা। কেন, আবার কোন গোলযোগ বেধেছে নাকি ?

রজনী। তা আর বল্‌তে। পত্তনী তালুকের প্রজারা সব বিদ্রোহী হইয়াছে। এদিকে প্রধান আম্‌লা দেড় হাজার টাকার তহবীল তচ্ছ্রুপ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। চারিদিকেই বিপদ।

প্রভা। তা হলে উপায় ?

রজনী। মোকদ্দমা কল্লে এখনও কূল কিনারা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন।

প্রভা। তবে কি কর্ব্বে ?

রজনী। মোকদ্দমা চালাব। না হয় আরো কিছু দেনা হবে। এখন তো রক্ষা করি। এর পর সুবোধ দু'পয়সা আন্‌তে পাল্লে আর ভাবনা কি ?

প্রভাবতী যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পতির বৈষয়িক গোলযোগে বা আর্থিক ক্ষতিতে, প্রভাবতীর ভাবনা করিবার কোনই কারণ ছিল না। কারণ রজনীকান্ত ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। যে প্রকারেই হউক, রজনীকান্তের তাঁহাকে ভরণ-পোষণ করিতেই হইবে। প্রভাবতী আকার ইঙ্গিতে স্বামীকে

একথা জানাইতেও ত্রুটি করিতেন না। রজনীকান্ত কখনও প্রতি[illegible] করিতে চাহিলে, প্রভাবতী বলিতেন যে, তাঁহাকে কর্ত্তব্য[illegible] উৎসাহিত করিতেই তিনি ওরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া থা[illegible]। রজনীকান্ত ভাবিতেন,—'প্রভাবতী কি কর্ত্তব্যপরায়ণা।'

আজ স্বামীকে এইরূপ কর্ত্তব্যপালনে উৎসাহিত করিবার জন্যই প্রভাবতী নয়ন হইতে একটু বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃ বাহির করিয়া, অধরে একটু বাসন্তী হাসি হাসিয়া, কোকিল কণ্ঠের সহিত একটু সরলতার খাত মিশাইয়া, স্বামীকে বলিলেন, 'দেখ, যদি কিছু মনে না কর ত একটা কথা বলি।'

রজনী। কি ?

প্রভা। ঠাকুরপো, এখন একবার বাড়ী আস্‌লে ভাল হয় না ?

রজনী। তার এসে কি হবে ? সে ছেলে মানুষ।

প্রভা। তুমি যেরূপ বল্‌ছ, তাতে কিন্তু আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। কি জানি মাম্‌লা মোকদ্দমার কথা তো কিছু বলা যায় না। হা'র জিত আছেই।

রজনী। যা হবার তা হবে।

প্রভা। তা তো হবে। কিন্তু ঠাকুরপো নাবালক। এর পর, কেহ কিছু না মনে করে।

কথাটা রজনীকান্তের মনে বাজিল। তিনি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি, কি বল্‌ছ ?'

প্রভা। বল্‌ছি, যদি বিষয় আশয়ের কিছু ভাল মন্দ হয়, তখন পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে। আর ঠাকুরপোরই বা মন খারাপ হ'তে কতক্ষণ ?

রজনীকান্ত কিঞ্চিৎচিন্তা করিয়া বলিলেন, 'না, না, সে ওরকমের

ভাই নয়। সেবারে আমি ওর মন পরীক্ষা কর্ত্তে বল্লুম 'সুবু! আর দু'দিন পর, তোর বিষয় তুই পাবি, রোকড় রূপায়া ও তলব বাকীটা একটু দেখিস্।' তাতে সে আমায় উত্তর কল্লে, 'দাদা, তুমি ওরূপ বল্লে, আমি আর বাড়ী আস্‌বো না।' আহা! ভাই আমার বড় সরল প্রকৃতি।

প্রভাবতী দেখিলেন মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। সুতরাং তিনিও একটু পাশ কাটিলেন। বলিলেন, 'আমিও তো তাই বল্‌ছি। সরল বলেই তো ভয়। যদি আর আব সকলের মত আপন বুঝ থাক্‌তো, তা হলে এরাও দেখ্‌তো, আর পাঁচজনেও বুঝ্‌তো, যে এর ভিতর কোন ছল তর্ক নেই। অদৃষ্টে যা আছে, তা হবে। কিন্তু তোমায় কেউ না মন্দ বলে। আমি সব সইতে পারি, তোমার নিন্দে শুন্‌লে আমার কান্না পায়।

রজনী। না, না, নিন্দে কর্ব্বে কেন? আমি আর তো কাউকে ঠকাতে যাচ্ছি না।

প্রভা। সেকথা বোঝে কে? আর মনুষ্যের মন বইতো নয়। কখন কি হয়, তা কি কিছু বলা যায়? ওমা! এক রত্তি বউ, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে কি কাণ্ডটাই না কল্লে।

রজনীকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বোধ হইল প্রভাবতী কি অশুভ ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই ওরূপ বলিতেছেন। তিনি সাতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৌ-বৌর কথা কি বল্‌ছ?'

প্রভা। না—কিছু নয়। ভাত খাও।

রজনীকান্তের আহার করা বন্ধ হইল। তিনি নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে প্রভাবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রভাবতীও ইত্যবসরে 'যাই মিষ্টি নিয়ে আসি' বলিয়া ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে উঠিয়া

গেলেন। এবং অন্তরাল হইতে স্বামীর হাবভাব বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ক্ষণকালপর একখানা রেকাবী হস্তে আসিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। প্রভাবতী উপবেশন করিলে রজনীকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি না বল্‌ছিলে?'

প্রভা। না, না, কিছু নয়। হেমলতা ছেলে মানুষ, ওর কথা কি ধর্ত্তে আছে। ওর বুদ্ধি কি! তবে বৌ মানুষ; ভেকার মা, ছোট লোক মাগী, ঘরের কথা নিয়ে কি তার সঙ্গে ওরূপ ভাবে ঝগ্‌ড়া কর্ত্তে হয়?

রজনীকান্তের ঔৎসুক্য চরম সীমায় উঠিল। তিনি অতিশয় ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘরের কথা নিয়ে ঝগ্‌ড়া। বল কি? সত্যি বল্‌ছ?'

'সত্যি কেন! মিছে। থাক্ আমার বলে কাজনেই' বলিয়া প্রভাবতী মৌনাবলম্বন করিলেন। রজনীকান্ত ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা! কি কারণে ঝগ্‌ড়া হলো?'

প্রভা। সে অনেক কথা। সেদিন তুমি জমাজমির গোলযোগ শুনে, বাড়ী হ'তে চলে গেলে, হেমলতা ঠাকুরঝিকে জিজ্ঞেস কর্ল্লে, ঠাকুরঝি, তিনি গেলেন কোথায়? ঠাকুরঝি তাতে বলে উঠ্‌লো— 'আর যাবেন কোথায়?—তালুকে। দেখেন যদি নাবালকের সম্পত্তি কোন মতে হাত কর্ত্তে পারেন।' আমি পূজোর জন্য চারটি তুলসীর পাতা তুলছিলুম, শুনে একেবারে বসে গেলুম। তাই বল্‌ছি, ঠাকুরপোকে এখন একবার বাড়ী আস্‌তে লিখে পাঠাও।

রজনীকান্ত একদৃষ্টিতে প্রভাবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার লোচনদ্বয় ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অপেক্ষাকৃত রূঢ়-স্বরে বলিলেন, 'তারপর'?

প্রভা। তারপর হেমলতা, তোমার নাম ক'রে কত কি শাপ দিতে লাগ্‌লো। এমন সময় ভেকার মা—না থাক্, আমার বল্‌তে লজ্জা করে।

রজনী। আঃ বলনা ছাই।

প্রভা। রাগ কর তো বল্‌বো না।

রজনী। না, না, রাগ কর্ব্ব কেন?

প্রভাবতী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'ভেকার মা, সেই সময় জল নিয়ে যাচ্ছিল, সে যেই ভালর জন্য বল্লে—'মা, তুমি গৃহস্থের বউ, সে তোমার ভাশুর হয়, তাকে কি অমন ক'রে শাপ দিতে আছে বাছা! অমনি ঠাকুরঝি আর হেমলতা তাকে কত কি বল্লে তার ঠিকানা নাই। বেচারী আর কি করে, মনের খেদে কাঁদতে লাগ্‌লো। আমিও কান্না শুনে গেলুম। গিয়ে শুনি, হেমলতা ভেকার মাকে বল্‌ছে,—'বেটী এ ইজমালী পুকুর, দেখি কেমন ক'রে জল নিস্।'

রজনী। বটে! তুমি কিছু বল্‌লে না?

প্রভা। আমার ভয় কর্ত্তে লাগ্‌লো। আমি গোম্ খেয়ে চলে এলুম।

রজনী। গিরি গিরি, কিছু বল্লে না?

প্রভা। বল্লুম কি ছাই। তবে আর অতটা হবে কেন? বলা দূরের কথা বরং উষ্‌কিয়ে দেয়। তুমি আর তো কিছু দেখ না। আজ ক'দিন ধরে, এরা কি রকম হয়ে গেছে।

রজনীকান্ত সক্রোধে বলিলেন,'তা আজ হতে ভাল করেই দেখ্‌বো। যেমন লোক, তেমন ব্যবহার না কল্লে তো চল্‌বে না।

প্রভাবতী দেখিলেন,—আগুন ধীরে ধীরে লাগিতেছে। এখন বাতাস দিলেই প্রজ্বলিত হইবে। বলিলেন, 'বাপ্‌রে কার মনে কি আছে, কে বল্‌বে? ঠাকুরঝিকে সে দিন চাল্ দিতে একটু দেড়ী

হওয়াতে সে আবার রাগ করে উপোষ কল্লে। আর হেমলতা সবাইকে বল্‌ছে—বড় দিদি ঠাকুরের কথায় খরচ পত্র দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। ওমা' কি মনুষ্যি গো!

রজনীকান্তের শরীরে যেন শতসহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'আবার তোমাকেও নিন্দা করা হয়েছে বুঝি। তা খরচ বন্ধ ক'রে থাক, বেশ করেছ। আজ হ'তে সব বন্ধ করে দিও। আমি আর কারুর জন্য, এক পয়সাও খরচ কচ্ছি না'।

রজনীকান্ত ভগিনীর উপর রাগান্বিত হইয়াই এরূপ কথা বলিলেন। অথবা প্রভাবতীর কথা বলিবার কৌশলেই তাহার মুখ হইতে ওরূপ উক্তি বিনির্গত হইল। প্রকৃতপক্ষে, তিনি যে সত্য সত্যই পত্নীকে ভগিনীর আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, তাহা নহে। প্রভাবতীও ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া তিনি আর কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি এক পায়ে, দুই পায়ে, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রজনীকান্ত আহারান্তে বহির্ব্বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। রজনীকান্ত চলিয়া গেলে, ভেকার মা পশ্চাৎ হইতে আসিয়া প্রভাবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বৌ ঠাক্‌রুণ, কি হলো?'

প্রভাবতী ইঙ্গিতদ্বারা তাহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, 'চুপ, গোল করিস্ নে, ঐ দিকে যা।'

বলা বাহুল্য, ভেকার মা সেই সময় নিঃশব্দে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সাধিলেই সিদ্ধি

পাঠক! আপনি কখনও স্ত্রীচরিত্র সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন, তবে গ্রন্থকারের অনুরোধ এই যে, আপনি বর্ত্তমান স্ত্রীচরিত্রের উপর একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন। কেন না, পাশ্চাত্যশিক্ষা সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর পরিবর্ত্তে বিমলা, ইন্দিরা, সমাজের কপাল জুড়িয়া বসিয়াছেন। জুলিয়েট্, গনারিল, বঙ্গীয় স্ত্রী-চরিত্রে অল্লাধিক প্রতিবিম্বিত হইয়া ঘরে ঘরে জলন্ত অভিনয় করিতেছে। দুইটী জাতীয় চরিত্রের অপূর্ণমিশ্রণে, প্রকৃতি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। উন্মাদিনী প্রকৃতি, মহামোহ লইয়া উন্মত্ত হৃদয়ক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতেছে। প্রকৃতিরূপিণী মা আমার, পাগলিনীবেশে চৈতন্যহীন শবহৃদয়ে নৃত্য করিতেছেন। আবহাওয়া ভাল নহে।

যে দিন দেখিবেন, আপনার মূর্ত্তিমতী প্রণয়িনী, আপনাকে একটু অধিক পরিমাণে আদর সোহাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অথবা

দেখিবেন, যে অসময়ে ফুড় ফুড়ে হাওয়ার মত, আপনার প্রেমসাগরে ধীরে ধীরে লহর তুলিবার উপক্রম করিতেছেন, তখনই ভাবিয়া লই-বেন—'পর্ব্বতো বহ্নিমান্'। অন্তরালে কি একটা মৎলব লুক্কায়িত আছে। আর যখন দেখিবেন, যে সুকোমল দেহলতিকা ধুল্যবলুণ্ঠিত করিয়া, চক্ষের জলে হাপুস হুপুস করিতে করিতে, নাকি নাকি সুরে, হৃদয়দ্রাবিণী মোহনকান্না ধরিয়াছেন ভাবিবেন—এইবার আপনার নাসিকায় রজ্জু বাঁধিবার উপক্রম করিতেছেন হ'তে পারে, আপনার মনোমোহিনী অতি শান্তিপ্রিয়া মুগ্ধস্বভাবা আদর্শরমণী। হ'তে পারে, তিনি আপনার মানসোদ্যানে বনফুল। কিন্তু তাই বলিয়া জাতীয়চরিত্র-পর্য্যালোচনা ও বর্ত্তমান ইঙ্গবঙ্গ সমাজের দুর্দ্দশার বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার উপর একটু দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে আপত্তি কি? রমণীর প্রতি পাদবিক্ষেপে, প্রতি নিশ্বাসপ্রশ্বাসে, প্রত্যেক কার্য্যকলাপে, আমার বিবেচনায় একটা না একটা কিছু অভিসন্ধি জড়ান থাকে। আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, স্বামীকে অঞ্চলাবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নিজ নিজ ইচ্ছাশক্তিতে পরিচালিত করিবার অতি গূঢ় সংকল্পটি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, মায়ের জ্বলন্তপ্রকৃতিরূপিণী রমণীগণ কখনও ভুলিয়া যান না। এবং সেই সংকল্প চরিতার্থ করিতে, রমণী সূচ্যগ্রবুদ্ধি।

গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতাকে স্বামীর নিকট বিরাগভাজন করিয়া তুলিবার জন্য প্রথম কৌশলজাল বিস্তার করিতে যাইয়া প্রভাবতী নানারূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। যদিও স্ত্রীসুলভ বাক্‌চাতুর্য্যে প্রভাবতীর নিতান্ত অলীক কথাগুলিও রজনীকান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, যদিও প্রভাবতীর মায়াকান্না, দীর্ঘনিশ্বাস ইত্যাদির সমা-বেশে ও তাঁহার সপ্তস্বর-সমন্বিত কণ্ঠবীণার মৃদুমোহন আকর্ষণে, রজনী-কান্ত তাঁহার কোন কথাই অবিশ্বাস করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি

এরূপ ক্ষেত্রে, তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। স্বামীর বিশ্বাসরূপ যে পয়স্থ ভূমিটুকু এতকাল জলকর প্রদানের পর তির্ তির্ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, যাহা মূলভিত্তি করিয়া তিনি আপনার আশা-বৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা যদি অবিশ্বাসরূপ বন্যাস্রোতে পুন-রায় বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবনা। সুতরাং সে বিশ্বাসটুকু রক্ষা করিবার জন্য প্রভাবতী সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রভাবতী উপস্থিত সঙ্কটে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণার্থ, গৃহে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছেন। ভেকার মা, গৃহে প্রদীপ জ্বালিয়া প্রভাবতীর সম্মুখে উপবেশন করিয়াছে। ভেকার মা হাসিতে হাসিতে বলিল, 'সত্যি বউ ঠাক্রুণ, আমার বুদ্ধিতে কিন্তু এতটা জুট্‌তো না।'

প্রভা। এখনও দেখেছিস্ কি ?

ভে-মা। যা হ'ক তোমাকে ধন্যি মেয়ে বল্‌তে হবে। তুমি যেরূপ ভাবে গুছিয়ে গুছিয়ে, দাদাঠাকুরের কাছে, ওদের নামে মিছা কথাগুলি বল্লে, মা গো মা, কার সাধ্য অবিশ্বাস করে।

প্রভা। অবিশ্বাস কর্বেন। ধান খেয়েছেন বুল্ বুল্, যান্ কোথা ? এখনো আমাকে টের পান্ নি।

ভে-মা। কিন্তু দেখো, বউ ঠাক্রুণ, কোন মতে না আবার বিগ্‌ড়ে যায়। বিগ্‌ড়ে গেলে, আবার হাত কর্ত্তে, বড় মুস্কিল হবে কিন্তু।

প্রভাবতী ঘোর চিন্তিতের ন্যায় মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, 'সেই তো কথা। গিরি পোড়ারমুখী, কখন কি ডাকিনী মন্ত্র ঝেড়ে দেয়, তার কি ঠিকানা আছে ?

ভে-মা। আমিও তাই ভাবছি ঠাক্রুণ। সাবধান, সাবধান, দেখো, তোমার কথা না আবার অবিশ্বাস ক'রে বসে।

প্রভা। আশ্চর্য্য কি? হাবাতে কি সহজে আমার কথায় বিশ্বাস কর্ত্তে চায়? আর কিনা, কথায় কথায়ই তং বং ক'রে এক বুলি বলে কি, যে স্ত্রীলোককে কখনও বিশ্বাস কর্ত্তে নাই। রসো হাবাতে, এবার তোমার তং বং আমি গোল্লায় দিচ্ছি, তবে আমি বৈদ্যের ঝি।

এই বলিয়া প্রভাবতী একবার গলারহার গাছটী ঘুরাইয়া লইলেন। খোপাটিও একটু শক্ত করিয়া আঁটিযা দিলেন। রাগ হইলেই তাঁহার এই উভয় কর্ম্মের প্রযোজন হইত। ভেকার মা প্রভাবতীকে তদবস্থ দেখিয়া একটু করুণস্বরে বলিল, 'অদৃষ্টকে দোষ দেও, ঠাকরুণ, অদৃষ্টকে দোষ দেও। সকলের কি আর ভদ্দর ভাতার জোটে? আহা হা! ওপাড়ার রামমণি কি সোনার সোয়ামী পেযেছে গো! মাগের কথা, তার কাছে যেন বেদের মন্তর।'

যেমন ধনী দেখিলে, দরিদ্রের দুঃখস্মৃতি জাগিযা উঠে, যেমন সুখ দেখিলে, দুঃখের মাত্রা অধিক পরিমাণে উপলব্ধি হয তেমনি রামমণির অদৃষ্টের কথা শুনিয়া, প্রভাবতীর মনঃকষ্ট শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তিনি ক্ষণকাল কথা কহিতে পারিলেন না। ভেকার মা ইত্যবসরে বলিল, 'এখন বুদ্ধি কর ঠাক্‌রুণ। দাদাঠাকুর, না আবার বোনের কথায় গলে পড়ে। সেই চেষ্টা দেখ।'

প্রভাবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি চিন্তা করিলেন। তৎপর ভেকার মার প্রতি একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া স্থিরভাবে বলিলেন, 'সে জন্য চিন্তা কি? যাতে আমাকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না করে, সেইদিক্ প্রথমে বজায় রাখ্‌তে হবে। তার পর পায়ের কাঁটা, কুঁটা দিয়ে বের কর্ব্ব। কিন্তু যে আগুন জ্বলেছে, তাহাতে সকল সময়ই যৎকিঞ্চিৎ আহুতি চাই'।

এই বলিয়া প্রভাবতী তৈলাধার হইতে একটু তৈল লইয়া দীপশি-

খায় নিক্ষেপ করিলেন। প্রদীপ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই প্রদীপালোকের উজ্জ্বলতর দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবতীর মুখেও একটী সরস হাস্যজ্যোতিঃ দেখা দিল। ভেকারমা হাসিয়া বলিল, 'সে সব তুমিই জান, মোদ্দা বিলম্বে ক্ষতি আছে।'

প্রভাবতী কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'তা ঠিক্। আজই এমন কিছু করা চাই, যাতে আমার উপর ওর কোনরূপ সন্দেহ না জন্মায়।'

ভে-মা। কি কর্ব্বে না কর্ব্বে, আগে ভাল ক'রে বুঝ।

প্রভা। আর বুঝ্‌তে হবে না। উনি, এ বেলা খেয়ে দেয়ে যখন বিছানার উপর গিয়ে বস্‌বে, আমি তখন ওর কাছে ব'সে নানা কথা পার্‌তে থাক্‌বো। তুই বাইরে এমন জায়গায় থাক্‌বি, যেন আমাদের কথাবার্ত্তা সব শুন্‌তে পাস্। তারপর, যখন ঔষধ ধর্ব্বার সময় হবে, তখন আমি গলার আওয়াজ কর্ব্বো। তুই অমনি ঘরে ঢুকে, তোর দাদাঠাকুরের কাছে, কেঁদে কেঁদে, ওদের নামে নালিশ কর্ত্তে থাক্‌বি। আমি ওদের পক্ষ হ'য়ে, তোর উপর খুব তেড়ে উঠ্‌বো। আর তোকে গালমন্দ দিতে থাক্‌বো। বুঝ্‌লি?

ভে-মা। তা আর বুঝিনি ঠাকরুণ।

প্রভা। তার পর, তুই খানিকটা কেঁদে কেটে, চলে যেতে থাক্‌বি। আমি অমনি ঘর হ'তে বের হ'য়ে, অনেক বলে ক'য়ে, তোকে এনে বারান্দায় বসাব। তার পর, কর্ত্তার নিকট ওদের বিরুদ্ধে আর যাতে তুই কিছু না বলিস্, সেইরূপ ভাণ করে তোকে অনেক তোষামোদ করে, নানা কথা বল্‌তে থাক্‌বো। কিন্তু সেই কথাগুলি এমন ভাবে বল্‌তে হবে, যেন উনি ঘরের ভিতর থেকে সব শুন্‌তে পায়। অথচ যেন বোঝে, আমি ওর কাছে, ওসব কথা গোপন কর্ব্বার চেষ্টা কর্চ্ছি।

ভেকারমা নিবিষ্ট চিত্তে প্রভাবতীর কথাগুলি শুনিতে লাগিল। তৎপর বলিল, 'তাতে কিছু লাভ হবে?'

প্রভা। লাভ হবে না, বলিস্ কি? তা হ'লে আমার কথায় ওর যদি কোনরূপ সন্দেহ হ'য়ে থাকে, তা ঘুচে যাবে। আর ওরা যদি সব কথা ভেঙ্গে চুরে বলেও দেয়, তা হলেও তার তাতে সহজে বিশ্বাস হবে না। আর অন্য বিষয়েরও অনেক সুবিধা হবে।

ভেকার মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, 'তা বুদ্ধিটা মন্দ ঠাওরাও নাই। ফল ফল্লেও ফল্‌তে পারে।'

প্রভা। এবার না ফলে, এর পরে ফলাব। তারপর হাসিয়া বলিলেন, 'কিন্তু দেখিস্ বোন্, বীজে না পোকা ধরে।'

ভে-মা। পোকা ধরে, আরসুলা ছেড়। ভয় কি?

প্রভা। তবু যদি স্বভাবদোষে মাটি শক্ত হয়।

ভে-মা। সেনের পুকুরে অগাধজল, তোমারও বুদ্ধি কম নয়।

প্রভা। আর তোর?

ভে-মা। কলসী সহায়, ভরে দিলে ঢাল্‌তে পার্ব্ব।

প্রভা। দু'জনেই মেলেনী ভাল, জুটেছি মন্দ নয়।

ভে-মা। ফসল ঘরে আন্‌তে পার্‌লে হয়। দাঙ্গা হাঙ্গামার ভয় আছে।

প্রভা। যেইখানে মুস্কিল, সেই খানেই আসান।

ভে-মা। কবে হবে তার ঠিকানা কি?

প্রভাবতী লোচনদ্বয় বারেক বিস্ফারিত করিয়া, ঈষৎ হাস্য করতঃ, ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

'অধৈর্য্য ভাল নহে, সাধিলেই সিদ্ধি।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আমিও তাই চাই

রাত্রি এক প্রহর। নীল, নির্ম্মল আকাশে চন্দ্র হাসিতেছেন। সেন বাড়ীর পুকুরের অর্দ্ধভাগে জ্যোৎস্না পড়িয়া একটি সূক্ষ্মরশ্মি—সাদা, কালো—দুইভাগে, সরসী-সলিল পৃথক্ করিয়াছে। সেই উভয় রঙ্গের মিলনস্থানে, একটি বিকশিত কুমুদিনী অনিলভরে হেলিয়া দুলিয়া, আঁধারে আলোকে লুকোচুরি খেলিতেছে। প্রেমিক চাঁদ, প্রিয়ার আসঙ্গসুখ-লালসায় যতই নিম্নজগতে নামিয়া পড়িতেছেন, কুমুদিনী ততই অধিকতর অন্ধকারে আপনাকে লুক্কায়িত করিতেছে। সাদার উপর কালো রঙ্ পড়িয়া সরসী-বক্ষের অপরার্দ্ধ ক্রমেই কালো করিয়া তুলিতেছে। অন্ধকার তিল তিল করিয়া স্বাধিকার বিস্তার করিতেছে।

এইরূপ সময়ে, একখানা পালঙ্কের উপর রজনীকান্ত দক্ষিণ করতলে মস্তক রক্ষা করিয়া, আহারান্তে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় আলবালায় তামাক

টানিতেছেন। প্রভাবতী আপনার দক্ষিণপার্শ্ব স্বামীর বক্ষের উপর ঈষৎ হেলাইয়া দিয়া, আস্তে আস্তে তাঁহার চুলগুলি নাড়িয়া দিতেছেন এবং একথা ওকথার পর, নানাপ্রকার পারিবারিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন। রজনীকান্ত উন্মনস্কভাবে পত্নীর কথার জবাব দিতেছেন, কিন্তু কি বলিতেছেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। কোমল অঙ্গের সেই ঈষৎ সংস্পর্শে, বসন্তানিলের সেই মৃদুলপ্রবহণে, অসহিষ্ণুতার সেই চরমসীমায়, রজনীকান্তের মনোমধ্যে শৈত্যরসপরিপূর্ণ কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় দাবানল প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইতেছে। তিনি অধীরতা বশতঃ পত্নীর সহিত বাক্যালাপে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছেন না। রজনীকান্তের চঞ্চলতা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রভাবতী মনে মনে হাসিয়া, স্বামীর বক্ষের উপর আরো একটু বেশী রকম হেলিয়া পড়িতেছেন, আবার পরক্ষণেই স্ত্রীসুলভ-চতুরতার সহিত আপনাকে স্বামিস্পর্শ হইতে পৃথক্ করিয়া লইতেছেন। রজনীকান্ত অজ্ঞাত ও অলক্ষিতভাবে পত্নীর অধিকারে আনীত হইতেছেন। শাদা প্রাণ, কালোর প্রতিবিম্বমিশ্রণে ধীরে ধীরে কালো হইয়া যাইতেছে। অন্ধকার তিল তিল করিয়া স্বাধিকার বিস্তার করিতেছে।

যখন রজনীকান্ত সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইয়াছেন, যখন তিনি সর্ব্বস্বপ্রদানেও প্রভাবতীর মনস্তুষ্টিসাধনে সমুৎসুক, যখন তাঁহার অধঃপতনের আর বিলম্ব নাই, যখন রমণীর কণ্ঠস্বর, নির্ঝরিণীনিঃসৃতজলপ্রপাতশব্দের ন্যায় মধুর নিক্কণে বাজিতে থাকে, যখন মন স্বভাবতঃই সংসারের কুটিলতা ভুলিয়া যায়, সেই সময়ে;—শক্তিরূপিণীর সন্ধিপূজার বলির সেই ভয়াবহ সন্ধিমুহূর্ত্তে, প্রভাবতী আপনার কুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ-কুন্তলরাশি স্বামীর বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে দুইভাগে ছড়াইয়া দিয়া, বক্ষঃস্থল

স্বামীর বক্ষের উপর ঈষৎ বক্রভাবে ন্যস্ত করিয়া, মধুরস্বরে বলিলেন, 'তোমাকে আজ আমার একটা কথা রাখতে হবে।'

রজনীকান্ত ঢুলু ঢুলু নেত্রে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না। বোধ হয় কথা কহিবার শক্তিও ছিল না।

প্রভাবতী পুনরায় বলিলেন, 'বল রাখবে'? রজনীকান্ত এবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা অনতিপরিস্ফুট স্বরে বলিলেন, "রাখবো"।

প্রভা। আগে বল, তুমি আমায় ভালবাস কিনা? তা হইলেই তুমি আমার কথা রাখবে কি, না রাখবে বুঝ্‌তে পার্ব্বো।

রজনীকান্ত কোন উত্তর করিলেন না। বামহস্তদ্বারা পত্নীর কপোল-বিলম্বিত আলুলায়িত অলকাগুচ্ছ ধীরে ধীরে বিনাইয়া দিয়া, তাঁহার গণ্ডস্থলে ছোট রকমের একটি চুম্বন দিলেন। বুঝি, সে চুম্বনে ব্যক্ত হইল, 'তুঁহারি চরণে আমি সঁপেছি পরাণি।'

প্রভাবতী বলিলেন, 'তবে রাখবে'?

রজনী। আমি কবে তোমার কথা না রেখেছি। প্রভাবতী মনে মনে বলিলেন, 'ড্যাকরা, সোজাপথে চল্‌তে শেখনি, তোমাকে চিন্‌তে কি আর আমার বাকী আছে?'—তার পর মিষ্টি মিষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'তা কথাটা কি, ঠাকুরঝি বা হেমলতার উপর, তুমি কোনরূপ রাগ কর্ত্তে পার্ব্বে না। আর কাউকে কোন কথা বলোও না। যা হ'ক না বুঝে একটা বলেছে, আমিই না হয়, বুঝিয়ে সুজিয়ে দু'কথা ব'লে দেব।'

রজনী। এই কথা। তা তুমি যদি নিষেধ কর, তবে বরং না বল্‌বো। কিন্তু ওদের স্বভাব দিন দিন যেরূপ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তাতে একটু একটু শাসন করা উচিত।

প্রভা। যা বল্লে, মিথ্যা নয়। কিন্তু কথাটা চাপা থাকাই ভাল।

আবার আন্দোলন হলেই, এই নিয়ে, একটা কানাকানি হানাহানি হবে। আর যারা না জান্‌তে পেরেছে, তাহারাও জান্‌তে পার্ব্বে।

রজনী। তবে তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাই হবে। আমি কি তোমার মত ছাড়া?

প্রভাবতী সোহাগভরে স্বামিবক্ষের উপর আপনার মস্তক ন্যস্ত করিয়া অতি কোমলকণ্ঠে বলিলেন, 'প্রিয়তম'!

রজনী। প্রেমময়ি!

প্রভা। তোমার গুণের সীমা নাই।

রজনীকান্ত স্নেহভরে পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সুকোমল ওষ্ঠাধরে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন।

রজনীকান্ত! সরলচিত্ত জ্ঞানান্ধ যুবক কর কি, কর কি, থাম। উহাতে পীযূষ নাই। উহাতে রোগ তাপ-নিসূদন মহৌষধ নাই। উহাতে হৃদয়সাগরমন্থনোত্থিত অমৃত নাই। আছে কেবল, তীব্র জ্বালাগর্ভ ভয়ঙ্কর নরকানল,—কেবল বিষধর লালাবিনিঃসৃত কালকূট গরলরাশি, কেবল সদ্য জ্ঞাননাশিনী উগ্র-জ্বালাময়ী মদিরা।

প্রভাবতী কিয়ৎকালপর কি ভাবিয়া স্বামিবক্ষ হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কণ্ঠের এক অস্ফুট সঙ্কেতধ্বনি শ্রুত হইল। রজনীকান্তের বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তেই আর একটী রমণী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সে ভেকার মা।

ভেকার মা উপস্থিত হইয়াই রজনীকান্তকে লক্ষ্য করিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, 'দাদাঠাকুর! আমার একটা বিচার কর।'

রজনীকান্ত কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, প্রভাবতী যেন নিতান্ত রাগান্বিত হইয়াছেন, এইরূপ ভাণ করিয়া ভেকার মাকে বল্লিলেন, 'বের হ, মাগী, ঘর থেকে।'

ভেকার মা কাঁদিয়া ফেলিল। বুঝি, প্রভাবতীর বাক্যবাণে তাহার কোমল প্রাণ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা চক্ষু মুছিতে মুছিতে মায়াকান্না কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, 'তা আমাদের যখন তোমাদের দুয়ারে আস্‌তে হয়, তখন যা ইচ্ছে, তাই বল্‌বে বই কি? বল, সব সহ্য কর্ব্ব।'

রজনীকান্ত বলিলেন, 'কি হয়েছে বল্ না। কাঁদছিস্ কেন?

ভে-মা। না, দাদাঠাকুর, কি হবে। ভালোর জন্য দু'কথা বলেছিলুম বলে, দিদি ঠাক্‌রুণ আর ছোট বউ ঠাক্‌রুণ. সেইদিন আমাকে কাঁদিয়ে ছাড়্‌লে। আবার সেই কথা বল্‌তে এসেছি বলে, বড় বউ ঠাক্‌রুণও রেগে উঠ্‌লেন।

প্রভা। এখনো দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্‌তে লাগ্‌লি। বের হ পোড়ারমুখী, এখনি বের হ।

এই বলিয়া প্রভাবতী আরো অধিক রাগের ভাণ করিয়া ভেকার মাকে তাড়া করিয়া, বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ভেকার মা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রভাবতী অমনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চাৎ হইতে ভেকার মার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করতঃ অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিলেন, 'রাগ্ করলি নাকি বোন্, শুনে যা।'

ভেকা। না, বউ ঠাক্‌রুণ, ছাড়।

প্রভা। আস্তে আস্তে, তোর দাদাঠাকুর শুন্‌তে পাবে।

পাঠকবর্গ বুঝিয়া থাকিবেন, যে প্রভাবতী স্বামীকে শুনাইবার জন্যই ওসব কথা বলিয়াছিলেন। তবু রজনীকান্ত ভাবিলেন, যে প্রভাবতী তাঁহার নিকট হইতে কোন বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং কথাগুলি শুনিবার জন্য তাঁহার স্বভাবতই অত্যন্ত কুতূহল জন্মিল।

তিনি নিঃশব্দে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। প্রভাবতী ইত্যবসরে ভেকার মাকে আনিয়া বারাণ্ডার একপ্রান্তে বসাইলেন। অতঃপর, সেইরূপ কৌশল খাটাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'সাধে কি, বোন্, তোর উপর আমি রেগে উঠেছি। তোর দাদাঠাকুর, বোন আর ভাই বৌর ব্যবহারে, বড়ই চটে গেছে। আমি কত ক'রে সাপের মন্ত্র ঝেড়ে, অনেকটা রাগ কমিয়ে এনেছি। এমন সময়, তোর কাছে সমস্ত কথা শুন্‌তে পেলে, আবার চটে যেতো।'

ভে-মা। তাই বলে কি তারা অন্যায় কর্লে, সে কথা বল্‌তেও পার্ব্ব না?'

প্রভা। তা হলে কি আর রক্ষা আছে! ওরা আজ কাল যে সব কথা বলে, আর যেরূপ আচরণ করে, তা জানতে পাল্লে কি আর ওদের মুখদর্শন কর্ব্বে?

ভেমা। না কল্লেই বা। তাতে আমার কি! তুমি সিদে মানুষ, তাই তুমি এখনও ওদের পক্ষে কথা কও। সে দিন ওরা যে পরামর্শ কর্চ্ছিল, তা শুন্‌লে, তুমি এখনি বুঝ্‌তে পার্ব্বে, যে ওরা কি ধরণের মানুষ। তুমি নাকি দিদিঠাক্‌রুণের রান্না কর্ব্বার চাল দেও না, ওদিগকে সদা সর্ব্বদা জ্বালাতন কর, এইরূপ কত কি মিছা কথা বলে, দাদাঠাকুরের কাছে, তোমার নামে নালিশ কর্ব্বার জন্য, ছোট বউ ঠাকরুণ, দিদি ঠাক্‌রুণকে বলে দিচ্ছিল! আমি ঘরের পিছন হ'তে সে কথা শুন্‌তে পেয়ে, যেই ওরূপ কর্ত্তে নিষেধ কল্লুম, অমনি দু'জনে আমাকে কত কিছু ব'লে যে গালাগালি দিলে, তা আর কি বল্‌বো।

প্রভা। তা আমার ঘাড়ে দোষ চাপা'লে, যদি তোর দাদাঠাকুর ওদিগকে ভাল মনে করে, সেও ভাল। তবু বোন্ আমার দিকে চেয়ে, তুই এইবার সহ্য কর্। জানিস্ তো, কোন ঘটনা ঘট্‌লে আমাকেই

ভুগ্‌তে হবে। ভাল হউক, মন্দ হউক, আমি আর তো ফেল্‌তে পার্ব্ব না।

ভেকার মা এবার অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'এ কি রকম কথা হলো, ঠাক্‌রুণ! তোমরা ভুগ্‌বে না তো কি গাঁয়ের লোকে ভোগ কর্ব্বে? ক্ষেপে গিয়ে থাকে, পায়ে শিক্‌লি দেও।

প্রভা। মাথা খাস্, বোন্, চুপ কর্ চুপ কর্। শুন্‌তে পাবে।

অতঃপর ভেকার মা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় প্রভাবতী ইঙ্গিত করিলেন। সে আর কোন কথা না বলিয়া কিয়ৎকাল বক্ বক্ করিয়া চলিয়া গেল। ভেকার মা চলিয়া গেলে, প্রভাবতী পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ধীরে ধীরে যাইয়া রজনীকান্তের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। রজনীকান্ত ইহার মধ্যে মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গিরিজাসুন্দরীর ও হেমলতার চরিত্র নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আর প্রভাবতী স্বীয় সৎস্বভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়া, তাঁহাদের দোষভাগ যথাসাধ্য গোপন করিয়া থাকেন। রজনীকান্ত ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূর উপর যদিও নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে, প্রভাবতীর সহৃদয়তার প্রমাণ পাইয়া, এক আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার মন প্রাণ ভরিয়া গেল। তিনি স্নেহপরবশ হইয়া পত্নীর করপল্লব ধারণ করিলেন। বলিলেন, 'ভেকার মার সহিত কি কথা হচ্ছিল?'

প্রশ্ন শুনিয়া প্রভাবতী যেন একটু চমকিত হইয়াছেন, এইরূপ ভাণ করিয়া বলিলেন, 'না—কৈ—এমন কিছু নয়।'

রজনীকান্ত হাসিয়া বলিলেন, 'আমি সব শুন্‌তে পেয়েছি।'

প্রভাবতী কোন উত্তর না দিয়া মস্তক অবনত করতঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীর নখ দ্বারা বাম হস্তের অঙ্গুলীর নখ খুটিতে লাগিলেন। যেন নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়াছেন। রজনীকান্ত পুনরায় বলিলেন, 'আমার

নিকট তোমার কোন কথা গোপন করা উচিত নয়। শেষে ওদের নিয়ে সংসার করা ভার হবে।'

প্রভাবতী ঈষৎ মস্তক নাড়িলেন। বুঝি তাহার অর্থ এই—'নইলে তোমায় ছাড়ি কৈ?' তারপর বলিলেন, 'তা যখন শুন্‌তে পেযেছ। তখন অন্য সময বল্‌বো।'

রজনী। কখন বল্‌বে? আর একদিন পরেই আমি বাড়ী হ'তে চলে যাব।

প্রভা। সে কি! আবার কোথায যাবে? এতদিন পর বাড়ী এসেছ, দু'দিন সুস্থির হও। তারপর, না হয আবার যেও।

রজনী। তা হ'লে জমা জমী সব খোযাতে হবে।

প্রভা। এত শিগ্‌গির না গেলেই কি নয?

রজনী। না।

প্রভাবতী মনে মনে বলিলেন,

'আমিও তাই চাই।'

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অভিমানিনী।

প্রভাত হইল। উষার সুকোমল করস্পর্শে পৃথিবী নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন সকলেই সুখের আশা বুকে লইয়া স্ব স্ব শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। গিরিজাসুন্দরীও সেই সময় গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার আশা,—একবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রভাবতীর সমস্ত আচরণের কথা বলিয়া দিবেন, এবং বলিয়া দিয়া, তাঁহাকে তাঁহার ব্যবহারের দরুণ সমুচিত প্রতিফল দেওয়াইবেন। গিরিজাসুন্দরী এইরূপ আশা করিলেন সত্য, কিন্তু সে আশা সহজে কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট স্বয়ং যাইয়া কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, তাঁহার মনোমধ্যে এক নিদারুণ অভিমানের সঞ্চার হইতে লাগিল। যাহাকে ভালবাসি, সে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের দুঃখ অপনয়ন করিতে যত্নবান হইলে, মন যেরূপ সুখের বিমল তরঙ্গে নৃত্য করিয়া উঠে, কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বা কর্ত্তব্যতার অনুরোধে সে আমাদের দুঃখ বিমোচন করিলে, আমরা কখনই সেই প্রকার সুখ অনুভব করিতে পারি না। যিনি প্রকৃতপক্ষে

আমাদিগকে ভাল না বাসেন, তিনি আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইবেন কেন? এই নিত্য-আবেশময়, নিত্য-আশাপ্রদ প্রশ্ন, মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন, আমাদের মনোমধ্যে মীমাংসিত হইয়া যায়। সুতরাং ভালবাসিয়া প্রতিদানে ভালবাসা পাইয়াছি, এই সুখময়ী ধারণা এক নির্ম্মল আনন্দোচ্ছ্বাসে মন প্রাণ মুগ্ধ করিয়া, আমাদিগকে সুখে পুলকিত করিয়া তুলে। সুখসম্ভোগ জীবনের বাঞ্ছনীয়। প্রাণ সুখের জন্য লালায়িত। গিরিজাসুন্দরী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ভালবাসিতেন, তাই সুখশান্তির আশায়, তাঁহার নিকট আপনার দুঃখের কাহিনী নিজে বলিতে ইচ্ছা করিলেন না। ভাবিলেন,—দেখি দাদা, আমার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া স্বয়ং ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন কি না? বস্তুতঃ গিরিজাসুন্দরীর এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। রজনীকান্ত ভগিনীকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। গিরিজাসুন্দরীর বৈধব্যদশা সংঘটিত হইলে, সেই স্নেহ আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। জননীর মৃত্যুর পর রজনীকান্ত অনাথাকে একেবারেই নয়নের আড় করিতেন না, এবং পাছে তাঁহার অসাবধানতায় গিরিজাসুন্দরীর কোনরূপ মনঃকষ্ট হয়, এইজন্য তিনি সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতেন। গিরিজাসুন্দরীর কোন প্রকার মনঃকষ্ট হইলে বা তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিলে, রজনীকান্তের দুঃখের পরিসীমা থাকিত না। তিনি তদ্দণ্ডেই তাঁহার মনঃকষ্ট বিদূরিত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন। পূর্ব্বে প্রভাবতী গিরিজাসুন্দরীকে কোন প্রকার জ্বালাতন করিলে, তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপর অভিমান করিয়া বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাকিতেন। রজনীকান্ত স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার দুঃখ বিমোচন করিবার চেষ্টা না করিলে, অভাগিনীর মনঃকষ্ট চরমসীমায় উঠিত। তখন তিনি নীরবে বসিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

আজও তাহাই হইল। প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গিরিজাসুন্দরী নরেন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণবদনে বারান্দার একপ্রান্তে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু রজনীকান্ত আজ ভগিনীকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

হেমলতা, গিরিজাসুন্দরীকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট প্রভাবতীর বিষয় বলিয়া দিবার জন্য, অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু গিরিজাসুন্দরী তাঁহার কোন কথাই কাণে তুলিলেন না। বলা বাহুল্য, প্রভাবতীর চক্রান্তের বিষয় গিরিজাসুন্দরী বিন্দু বিসর্গও অবগত ছিলেন না। জানিলেও রজনীকান্ত তাঁহার উপর এতদূর কোপাবিষ্ট হইতে পারেন, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। পূর্ব্বে হউক, পরে হউক, রজনীকান্ত অবশ্যই তাঁহাকে তাঁহার মনঃকষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিলে, অবশ্যই তাঁহার দুঃখের নিশা অবসান হইবে, তাহা গিরিজাসুন্দরীর দৃঢ়রূপেই বিশ্বাস ছিল। সুতরাং এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হওয়াতে অভাগিনী মনে মনে পুনরায় নানারূপ সুখের চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন,—যখন দাদা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন প্রভাবতীর আচরণের কথা উল্লেখ করিয়া, একবার করুণাপ্রতিম সহোদরের নিকট আপনার দুঃখের কাহিনী বলিবেন এবং বলিয়া বলিয়া, একবার প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবেন। তার পর ভাবিলেন,—তাঁহার স্নেহের পুত্তলী শিশুসন্তান দু'টীকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার হাতে হাতে সঁপিয়া দিবেন এবং সঁপিয়া দিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিবেন—'বাছারা দুঃখিনীর গর্ভে জন্মিয়াছে কিন্তু দুঃখের কিছু জানে না,—ওদেরে পায়ে রেখো, দাদা!'

সুখের আশায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া অভাগিনী সময় ক্ষেপণ করিতে

লাগিলেন। রজনীকান্ত নিজ প্রয়োজন বশতঃ ভগিনীর নিকট দিয়া অনেকবার যাতায়াত করিলেন, কিন্তু একবারও তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেন না। রজনীকান্ত যতবারই তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিলেন, গিরিজাসুন্দরীর মন ততবারই আশায় নৃত্য করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। অভাগিনী অনাহারে সেই স্থানে, সেইরূপ বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিলেন। তদ্দর্শ-নেও রজনীকান্তের মনোমধ্যে আজ বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না।

এদিকে হেমলতা রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া, চপলকুমারীর নিকট হইতে গোপনে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল আনিয়া, নিজেই গিরিজাসুন্দরীর জন্য রন্ধন করিয়া রাখিলেন। অপরাহ্ণ সময়ে গিরিজাসুন্দরী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বারান্দা হইতে উঠিয়া আসিলেন। তখন হেমলতা তাঁহাকে আহার করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গিরিজাসুন্দরী আহার করিতে প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি আহার না করিলে হেমলতাও আহার করিবেন না বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই যৎকিঞ্চিৎ উদরস্থ করিতে হইল। তৎপর নিতান্ত বিষাদিতচিত্তে সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই শয়ন করিয়া রহিলেন।

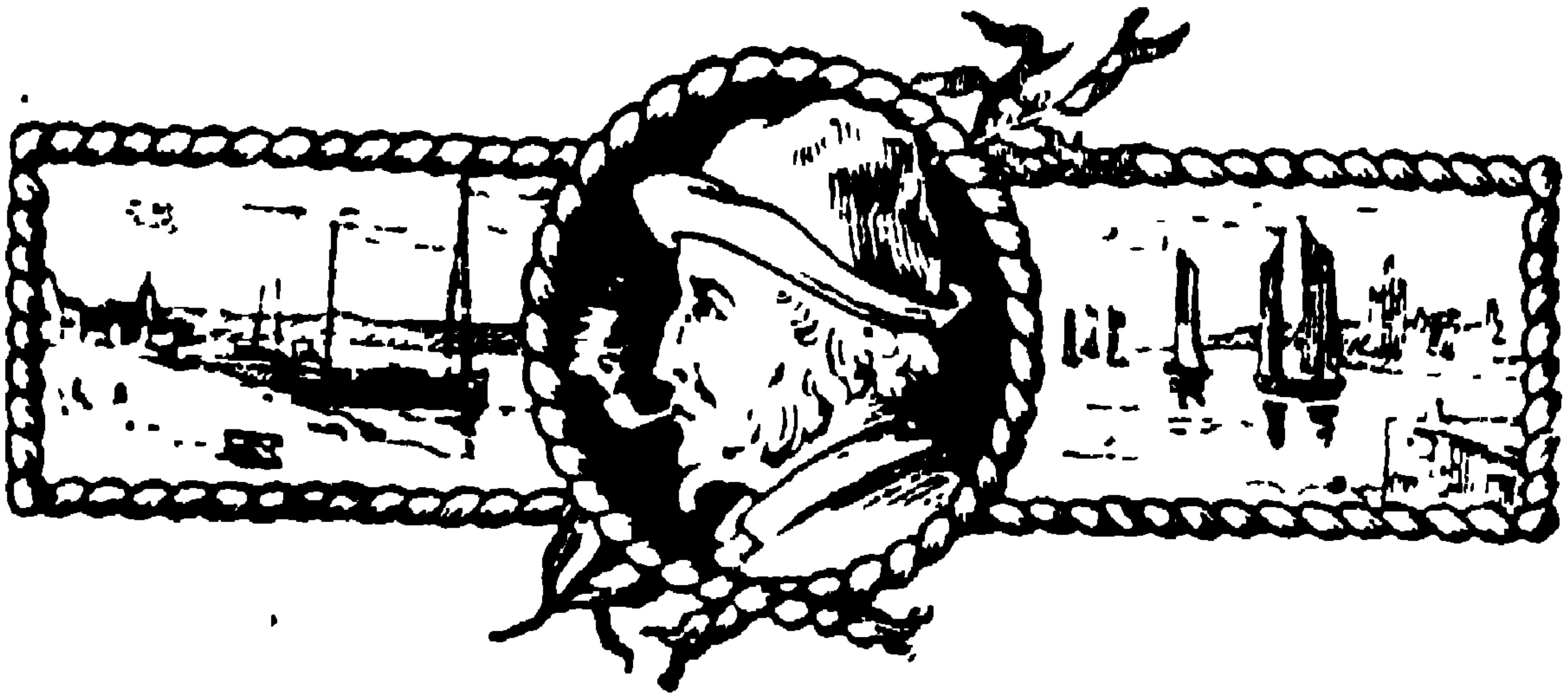

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

-০()০-

এই কি সেই?

পরদিবস সকাল সকাল আহার করিয়া রজনীকান্ত স্বীয় কাছারীতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে গিরিজাসুন্দরীর বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। যে ভ্রাতাকর্তৃক গিরিজা-সুন্দরী আপনার দুঃখ অপনীত হইবে ভাবিয়া, মনে মনে কত সুখের কল্পনা করিয়াছিলেন, যে ভ্রাতার স্নেহ ও ন্যায়পরতা সংসারের সকলের উপরই তুল্যরূপে পরিচালিত হইত, যে ভ্রাতার সুকোমল অঙ্কে আশ্রয় লইয়া, তিনি আপনার তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন বলিয়া, হৃদয়ে কত আশা পোষণ করিতেছিলেন, আজ সেই দেবোপম সাক্ষাৎ করুণার আদর্শস্বরূপ সহোদর, তাঁহাকে কিছু না বলিয়া, তাঁহাকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিয়া, বাটী হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিয়া গিরিজাসুন্দরী নিরাশায় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে হেমলতা যখন বুঝিতে পারিলেন যে রজনীকান্ত আর অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বাটী হইতে চলিয়া যাইবেন, অথচ গিরিজাসুন্দরী তাঁহার নিকট কোন কথাই বলিলেন না, তখন তাঁহার মনে যার পর নাই আশঙ্কা হইতে লাগিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, গিরিজা-সুন্দরীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, 'ঠাকুরঝি, তোমার পায়ে পড়ি, একবার যাও।'

গিরিজাসুন্দরী একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে মুখ উত্তোলন করিলেন। বলিলেন, 'কি বল্‌ছ, বৌ! যাব !! কোথা? দাদার কাছে?'

হেম। হাঁ। তাঁর কাছে একবার সমস্ত কথা ভেঙ্গে চুরে বলে দেও। তিনি সমস্ত বিষয় জান্‌তে পেলে,অবশ্য প্রতিকার কর্ব্বেন।

গিরিজাসুন্দরীর মুখে একটী শুষ্ক হাসি দেখা দিল। বলিলেন, 'কি বল্‌ছ, বৌ! প্রতিকার কর্ব্বেন !! না সে আশা আর আমার নেই। পূর্ব্বে যে ভাই, আমাকে একটু বিষণ্ণ দেখ্‌লে একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌তেন, তিনি যখন আমার কষ্ট দেখেও বুঝ্‌তে পেলেন না, তখন কি আর আমার জান্‌তে বাকী আছে, বৌ!"

হেম। ছিঃ তুমি আগেই ওরূপ ধারণা মনে পোষণ করো না। জমাজমীর গোলযোগে আজকাল তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন আছেন, তাই এ সমস্ত বিষয় চিন্তা কর্ব্বার সময় পান না।

হেমলতার কথা শুনিয়া গিরিজাসুন্দরীর মনোমধ্যে আবার আশার সঞ্চার হইল। তখন তিনি অর্দ্ধ-উন্মাদিনীর ন্যায় ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু পা সরিল না। তাঁহার শেষ আশা ভরসা যদি নিষ্ফল হয়, তাঁহার নৈরাশ্যগগনে যে একটি আশাতারা মিটি মিটি জ্বলিতেছিল, তাহাও যদি নিবিয়া যায়, তবে কি উপায় করিবেন, এই আশঙ্কায়

পরীক্ষার শেষ সোপানে পাদনিক্ষেপ করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে হেমলতা পুনরায় বলিলেন, 'আর বিলম্ব করো না, ঠাকুর ঝি, তিনি হয় তো এখনি বাড়ী হ'তে চলে যাবেন।'

তখন আলুলায়িতকুন্তলা বিবশা অনাথিনী শঙ্কিত চিত্তে ধীরে ধীরে যাইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভগিনীকে দেখিয়া আজ রজনীকান্তের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আরক্ত লোচনে মৃত্তিকারদিকে মুখ অবনত করিয়া রহিলেন। প্রভাবতীর বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। ক্ষণকালপর গিরিজাসুন্দরী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দাদা! তুমি নাকি বাড়ী হ'তে চলে যাবে?'

রজনীকান্ত নিতান্ত কর্কশস্বরে বলিলেন, 'হাঁ, হাঁ, যাব বলে তো ইচ্ছা, কেন?'

রজনীকান্তের কথা শুনিয়া গিরিজাসুন্দরীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "আজ তুমি আমার সঙ্গে, এরূপভাবে কথা বলছ কেন, দাদা? তুমি কি আমার উপঁর রাগ করেছ?

রজনী। বেশী কিছু শুন্‌তে চাইনে। এখন সোহাগ রাখ, যদি কিছু বল্‌বার থাকে তো বল।

গিরিজাসুন্দরীর কান্না আসিতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিলেন, 'কি বল্‌বো দাদা! তুমি বাড়ী ছিলে না। বড় বউ, আমার রান্না কর্ব্বার চাল্ ডাল দেওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছে। আর দিন রাত্রি আমাকে যে জ্বালাতন করে, তুমি তার কিছুই জান না।'

রজনী। পূর্ব্বে জানতুম না, এখন বিলক্ষণ জেনেছি। কিসে একজনের ঘাড়ে দোষ চাপা'য়ে আমাদের ভাই দুইটীর মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দেবে, এই তো তোমার ইচ্ছা। আর এই জন্যই তো ছোট

বৌ মার সহিত সে দিন পরামর্শ কর্চ্ছিলে। সে ছেলে মানুষ, তাই সে আপাততঃ তোমার কুটিলতা বুঝ্‌তে পার্চ্ছে না। এর পরে বুঝ্‌বে। তা যাই হউক। তোমাকে স্পষ্ট বল্‌ছি তোমাদের যা কর্ত্তে হয়, করো, কিন্তু একজনের নামে মিছামিছি দোষারোপ করো না।

গিরিজাসুন্দরীর মনঃকষ্ট সহনাতীত হইল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

'দাদা! দাদা! কি বল্লে?—আমি তোমাদের মধ্যে কলহ বাধাইবার চেষ্টা কর্চ্ছি! দাদা! আমি ঈশ্বরের শপথ করে বল্‌তে পারি, তোমাদের মঙ্গলচিন্তা ব্যতিরেকে অমঙ্গলচিন্তা আমার নিদ্রিত হৃদয়েও স্থান পায় না। আর ভেবে দেখ, দাদা! আমার ত্রিসংসারে তোমরা বই আর কে আছে? আমি কি না তোমাদের অমঙ্গলচিন্তা কর্ব্ব? আর আমাকে কুটিল বল্‌ছ। কেন দাদা! কবে তুমি আমার কুটিল হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছ? শৈশবে একত্রে খেলা করেছি,—বিবাহের পূর্ব্বে একত্র রয়েছি, তারপর,—(গিরিজাসুন্দরী একবার অঞ্চলদ্বারা স্বীয় চক্ষু মুছিয়া লইলেন) তারপর, যখন এই দারুণ বৈধব্য ঘট্‌লো, তখন একবারও তোমাদের কাছ ছাড়া হই নাই। দাদা! দাদা! এই দীর্ঘকালেও কি আমাকে চিন্‌তে পার নাই। কপাল দোষে অদৃষ্ট মন্দ করেছি, কিন্তু কুটিলতা কাহাকে বলে জানিনে। আর, আর আমার মুখপানে চেয়ে দেখো দাদা! আমাকে কি কুটিল বলে মনে হয়? তবে, আমার অদৃষ্ট দোষেই তোমার মনে এরূপ বিশ্বাস হয়ে থাক্‌বে। দাদা! দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, আমি দোষ ক'রে থাকি, বলে দেও কিন্তু তুমি ওরূপভাবে আমার উপর রাগ করে থেকো না।

গিরিজাসুন্দরীর কাতরতাব্যঞ্জক উক্তি শুনিয়া রজনীকান্তের মনোমধ্যে একটু আঘাত লাগিল। গিরিজাসুন্দরীর উপর তাঁহার যে

সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়া আসিল। রজনীকান্ত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া, ভগিনীর পূর্ব্বের সদ্ব্যবহারের দৃষ্টান্তগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অমনি আবার সেই রজনীর ভেকার মার ও প্রভাবতীর কথোপকথনের মর্ম্ম তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত হইল। যদি প্রভাবতী ওরূপ কৌশল না করিয়া, সাক্ষাৎভাবে গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার উপর দোষারোপ করিতেন, তবে উহার সত্যতা সম্বন্ধে আজ রজনীকান্তের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইলেও হইতে পারিত ; কিন্তু প্রভাবতী যেরূপভাবে স্বামীকে, গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার বিরুদ্ধে, অলীক কথাদ্বারা উত্তেজিত করিযাছিলেন, তাহাতে রজনীকান্ত উহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কিছুতেই সন্দিহান হইতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে, প্রভাতীর স্বার্থপ্রণোদিত মিথ্যা কথাগুলিই আজ তাঁহার মিকট সত্য বলিয়া অনুভূত হইল। ছলনাময়ী রমণী সত্যের মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিল এবং তদ্দরুণ গিরিজাসুন্দরীর সরলকথাগুলি নিতান্ত কল্পিত ও শঠতাপূর্ণ মনে করিয়া, রজনীকান্ত আজ ভগিনীকে নিতান্ত বিদ্বেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা, পথভ্রষ্ট হইয়া বিরূপ ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। পত্নীর পরিবর্ত্তে ভগিনীর উপরই, তাঁহার সমস্ত অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। তখন তিনি মাথা নাড়িয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, 'হাঁ, একেই বলে স্ত্রীচরিত্র। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন—'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু খলজনেষু চ।'

এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি ভগিনীকে বলিলেন,—'যাও, যাও তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে, আমায় সম্মুখ হ'তে দূর হও।'

গিরিজা। দাদা! দাদা! তুমিও আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, আমার কি উপায় হবে? আমি বাছাদের নিয়ে কোথায় দাঁড়াব?

রজনী। তোমার ঐ ক্রূর চরিত্রকে জিজ্ঞাসা করো। তোমার ঐ কূট বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করো। আমা হ'তে কিছুই হবে না। একটী সংসারকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে এসেছ। আবার আমাদের সংসারকেও নষ্ট কর্ব্বার চেষ্টায় আছ। তোমার মুখদর্শন কর্ল্লেও, পাপ হয়।

উঃ! হুতাশন,—হুতাশন,—তীব্র জ্বলন্ত,—উত্তপ্ত হুতাশন। আর না, আর না। আর কোন কথা অভাগিনীর মুখে সরিল না। তখন তিনি মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং নিজগৃহে প্রবেশ করিয়া, আর একবার প্রাণ খুলিয়া রোদন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। হেমলতা পূর্ব্বাপর সমস্তই শুনিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আর গিরিজাসুন্দরীকে কোন প্রকার সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন না। পক্ষান্তরে, গিরিজা-সুন্দরীর দুঃখে দুঃখিনী সরলা কাতরা বালা, নিজেও অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। গিরিজাসুন্দরী উপাধানে মস্তক রাখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে অশ্রুপাত করিলেন।

হায়! যে ভ্রাতা তাঁহার মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ মলিন দেখিলে, একেবারে যাতনায় অধীর হইয়া উঠিতেন, যে ভ্রাতা আপনার প্রাণ দিয়াও তাঁহার মনঃকষ্ট দূর করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। জননীর মৃত্যুর সময় যে ভ্রাতা বলিয়াছিলেন—'মা! মা! গিরি ও তার ছেলে-মেয়ে কি আমার পর, তুমি ওরূপ বলো না, তা হ'লে আমার মনঃকষ্টের পরিসীমা থাক্‌বে না।' আজ অশ্রুজলে ভাসিয়া গিরিজাসুন্দরী মস্তকে করাঘাত করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,

'হায়! হায়! এই কি সেই দাদা?'

——:——

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্তানবৎসলা

সাংসারিক গোলযোগে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া রজনীকান্ত বাটী হইতে যাত্রা করিলেন। প্রভাবতীর আত্মার প্রভাব তাঁহার হৃদয়কে এতই ভ্রান্ত ও দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছিল, যে তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানও ক্রমেই লুপ্ত হইতে লাগিল। কি এক মোহে আচ্ছন্ন হইয়া যে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চলিলেন রজনীকান্ত যেন তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি যাইবার সময় ভগিনীকে কোন কথাই বলিলেন না বা তাঁহার আহারেরও কোন বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন না। রজনীকান্ত চলিয়া গেলে, গিরিজাসুন্দরী 'বাবা গো! মাগো! তোমরা কোথায় গো, আমার কি উপায় হবে?' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। জননীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নরেন্দ্র ও চারুবালা মায়ের পদপ্রান্তে লুটাইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। হেমলতা কাঁদিতে কাঁদিতে বালক বালিকা দু'টীকে ক্রোড়ে করিয়া আশ্বস্ত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

এদিকে গিরিজাসুন্দরীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া প্রভাবতীর

আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না, এবং সেই সময় গিরিজাসুন্দরীকে আরো মনঃপীড়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে তিনি ভেকার মাকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, 'কিলা! ভেকার মা, ওঘরে আবার মড়াকান্না শুন্‌ছি যে!'

ভে-মা। কি জানি ঠাক্‌রুণ। সে সব তোমরাই জান।

প্রভা। আ মরি! মরি! কেঁদে কেঁদে সাধ মিটেনি, ছেলে মেয়ের মাথা খেয়ে, তাই বুঝি আবার কাঁদতে বসেছেন। রুচি তো কম নয়!

গিরিজাসুন্দরী নিজে মনের আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন। এমন সময় প্রভাবতীর বাক্যবাণ তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে হেমলতার ক্রোড় হইতে চারুবালাকে টানিয়া আনিয়া, দ্বিগুণ আবেগে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, 'দ্যাখ্ বড় বউ! এত গরিমা করিস্ নে। তুইও ছেলে পিলে নিয়ে সংসার করিস্। এখনও ধর্ম্ম আছে।'

গিরিজাসুন্দরীর কথা শুনিয়া প্রভাবতীর জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া গিরিজাসুন্দরীর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'বাছাদের গাল দেবার, তুই কেলা মাগী? ফের কোন কথা বল্‌বি তো, এখনি ঝেটা পেটা ক'রে, বাড়ী হ'তে বের ক'রে দিব।'

গিরিজাসুন্দরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'তা বের ক'রে দিয়ে সুখী হও, দেও।'

প্রভাবতী মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, 'ওমা! আবার নাকে কান্না আরম্ভ হলো যে! গিয়েছিলি না সোহাগী ভাইয়ের কাছে, কি হলো?'

গিরিজাসুন্দরী আর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে

মুখাবৃত করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন সুতরাং প্রভাবতীকে বাধ্য হইয়াই উপস্থিত ব্যাপারে যবনিকা নিক্ষেপ করিতে হইল। তিনি কিয়ৎকাল গিরিজাসুন্দরীর দিকে বিদ্রূপকটাক্ষ করিয়া ধীর মন্থর গতিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রভাবতী চলিয়ে গেলে, গিরিজাসুন্দরী 'বাবাগো মাগো! আমি বাছাদের নিয়ে, কোথায় যাব গো' বলিয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হেমলতার দু'নয়নে প্রস্রবণ ছুটিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা গিরিজাসুন্দরীর অশ্রু মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। তৎপর হৃদয়ের আবেগে তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'অত উতলা হ'য়ো না ঠাকুরঝি! মন সুস্থির কর। ভগবান্ কষ্টে ফেলেছেন, অবশ্য সুদিন দিবেন। তোমার চিন্তা কি? এ বাড়ীতে সকলেই তো তোমার পর নয়।'

হেমলতার শেষ কথাটা গিরিজাসুন্দরীর কাণে বাজিল। তাঁহার হৃদয়-আধারের সুদূর কোণে, সহসা একটি বিদ্যুৎ ঝলসিল। নয়নের উষ্ণ প্রস্রবণের উপর সহসা এক আশার তরঙ্গ বহিল। সুবোধ চন্দ্রের প্রীতিপূর্ণ স্নেহমাখা মূর্ত্তি সহসা তাঁহার মানসপটে জাগিয়া উঠিল। গিরিজাসুন্দরী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনার এই বিপদসাগরে একমাত্র আশ্রয়স্থল মনে করিয়া, আপনাকে কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বাসিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। আবার পরক্ষণেই, নিজ দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'না, বৌ, না। আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। আমি পোড়াকপালি, সোনা ছু'লে রাঙ্ হয়। আমার অদৃষ্টগুণে এমন সোনার ভাই, পর হলো। সুবুও যে দুঃখিনী বোন্ ব'লে মনে রাখ্‌বে, কে জানে?'

হেমলতা আজিও ভালরূপ স্বামীর প্রকৃতি জানিতেন না। কিন্তু

আপনার হৃদয় জানিতেন। আপনার হৃদয় দিয়া স্বামীকে দেখিতে জানিতেন। তাঁহার প্রেমপূর্ণ উদ্বেল প্রাণ, স্বামীর প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া ছিল। তাই আপনার হৃদয় দিয়া স্বামীর হৃদয় বুঝিতেন। গিরিজা-সুন্দরীর কথা শুনিয়া হেমলতা ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। তৎপর একটু দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, 'না, ঠাকুর ঝি, তুমি সে ভয় করো না। আর ধর্ম্মে গেলে, ঠাকুরেরই বা দোষ কি? কেবল বড় দিদির ভাব বুঝেন না, এই মাত্র। যদি বড়দিদি ভাল হতেন, যদি তিনি ঠাকুরের মন খারাপ না ক'রে তুল্‌তেন, তবে কি এমন হতো? তবে কি—'

হেমলতার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই গিরিজাসুন্দরী মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি কি বুঝিনি গো! আমি কি বুঝিনি। ঐ সর্ব্বনাশীই আমার সোনার ভাইকে পাগল করেছে। আরো যে সর্ব্বনাশীর মনে কি আছে, কে বল্‌বে?'

হেমলতা গিরিজাসুন্দরীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, 'ছিঃ! অমঙ্গলকে ডেকে আন্‌তে নাই। এখন তুমি আর চিন্তা করো না। এক কাজ কর, কলিকাতায় পত্র লিখ।' এই বলিয়া হেমলতা সলজ্জবদনে মৃত্তিকার দিকে মুখ অবনত করিয়া রহিলেন। গিরিজা-সুন্দরী কিয়ৎকাল নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া হেমলতার কথাগুলি চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং হেমলতার যুক্তিমতই কার্য্য করা সঙ্গত মনে করিয়া অনতিবিলম্বে লিখিবার উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সাংসারিক আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিতে বসিলেন। গিরিজাসুন্দরী সুবোধচন্দ্রকে এ পর্য্যন্ত সাংসারিক বিষয় কিছুই জানিতে দেন নাই। আজ কিছুই বাকী রাখিলেন না। উপসংহারে তাঁহাকে ত্বরায় বাটী আসিতে লিখিয়া

পাঠাইলেন। নিকটেই গ্রাম্য ডাকঘর ছিল। বালক নরেন্দ্র দৌড়িয়া যাইয়া পত্রখানা ডাকবাক্সে দিয়া আসিল।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট পত্র পাঠাইয়া গিরিজাসুন্দরী অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। অন্যান্য দিবস প্রভাবতী তাঁহাকে কোনপ্রকার মনঃপীড়া দিলে গিরিজাসুন্দরী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর অভিমান করিয়া প্রায়ই আহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। আজ তাহার বিপরীত ঘটিল। গিরিজাসুন্দরীর মাতৃপ্রদত্ত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ছিল। তদ্দ্বারা তিনি বাজার হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করাইয়া আনিলেন। তৎপর নিজ হস্তেই রন্ধন করিয়া বালক নরেন্দ্রকে স্বহস্তে পরিতোষ মত ভোজন করাইলেন এবং নিজেও রীতিমত আহার করিলেন। হেমলতা পূর্ব্বের মত প্রভাবতীর গৃহে রন্ধন করিয়া অন্যান্য কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া শেষ বেলায় কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করিলেন মাত্র।

পরদিবস প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রভাবতী গিরিজাসুন্দরীকে জব্দ করিবার নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। গিরিজা-সুন্দরী অনাহারে না থাকিয়া নিজেই আবশ্যক খরচাদি নির্ব্বাহ করিলেন দেখিয়া, প্রভাবতীর গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইতে লাগিল। সহসা চারুবালার দুগ্ধের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। চারুবালার জন্য গিরিজাসুন্দরী এ পর্য্যন্ত যে দুগ্ধ প্রাপ্ত হইতেন, প্রভাবতী তাহা বন্ধ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। সেনবাড়ী হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে সনাতন নামে এক বৃদ্ধ গোপ বাস করিত। সে প্রতি-দিবসই সেনবাড়ী, দুইবেলা, দুই সের করিয়া দুগ্ধ যোগাইত। সনাতন দুগ্ধ দিয়া গেলে, হেমলতা পূর্ব্বের মত চারুবালার জন্য দুগ্ধ আনিতে প্রভাবতীর গৃহে গমন করিলেন। প্রভাবতী তখন চোক মুখ লাল করিয়া হেমলতার উপর নিরতিশয় কোপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন

এবং তাঁহাকে দুগ্ধ প্রদান করিতে স্পষ্ট নিষেধ করিয়া দিলেন। হেমলতা ফিরিয়া আসিয়া গিরিজাসুন্দরীর নিকট যথাযথ বর্ণনা করিল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। দুগ্ধপোষ্য বালিকা চারু, আজ এক ফোটা দুগ্ধের জন্য কান্নাকাটি করিয়া সারাদিন পর মাতৃক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ঘুমের ঘোরে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সন্তানবৎসলা দুগ্ধ প্রদানে অসমর্থ হইয়া, এক একবার তাহার মুখ চুম্বন করিতেছেন, এক একবার অনিমিষলোচনে তাহার বদনকমল নিরীক্ষণ করিতেছেন। বালক নরেন্দ্র স্তম্ভিতনেত্রে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। হেমলতা সজললোচনে এই করুণদৃশ্য দর্শন করিতেছেন। হায়! একদিকে চক্ষের উপর মাতৃঅঙ্কেশায়িত ঘুমন্ত শিশুর বিশুষ্ককমলপ্রতিম এই বিমলিন মুখচ্ছবি। অপর দিকে সন্তাপনাশিনী ত্রিতাপহারিণী স্নেহময়ী জননীর সকরুণ কাতর দৃষ্টি। অহো! যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, বুঝি এরূপ করুণদৃশ্য জগতে আর নাই। প্রভাবতি! তুমি না,—জননী? জননী হইয়াও—ডাকিনী।

সেই দিবস অপরাহ্ণ হইতে অবিরাম ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে বৈকালের দুগ্ধ লইয়া আসিতে সনাতনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিল। রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময়, সে দুগ্ধ লইয়া সেনবাড়ী উপস্থিত হইল এবং প্রভাবতীর গৃহের নিকটবর্ত্তী একখানা ঘরের বারান্দায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রভাবতী দুগ্ধ রাখিবার জন্য ভেকার মাকে আদেশ প্রদান করিলেন এবং নিজে শয়ন ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ভেকার মা'র আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে সনাতনকে দুগ্ধ লইয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া, গিরিজাসুন্দরী তাহার নিকট হইতে নগদ মূল্যে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ক্রয় করিবার

অভিপ্রায়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বালক নরেন্দ্র ঘটী হস্তে মায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গিরিজাসুন্দরীকে আসিতে দেখিয়া প্রভাবতী স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধভরে ভেকার মাকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'কিলা ভেকার মা, দুধের কাছে মেছো হাটা কেন?'

ভে-মা। দিদি ঠাক্‌রুণ বুঝি দুধ্ চাচ্ছে।

গিরিজাসুন্দরী সেই কথায় কর্ণপাত না করিয়া সনাতনকে বলিলেন, 'সনাতন! বৈকালে যে এক সের দুধ্ দেও, তা হ'তে খুকীর আধ সের আমার কাছে দিয়ে যাও। না হয়, আমি নগদ দাম দিচ্ছি।'

প্রভাবতী সনাতনকে শুনাইয়া ভেকার মাকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, 'না না ওসব হবে টবে না। সনাতনকে বল্, আমার এক সের দুধের এক কাচ্চাও কম হলে চল্‌বে না। কম দিলে, এ মাসের দাম কাটা যাবে।'

সনাতন একদৃষ্টিতে প্রভাবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তৎপর বিনাবাক্যব্যয়ে এক সের দুগ্ধ সম্পূর্ণ ভেকার মার ঘটীতে ঢালিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। সনাতনের নিকট অতিরিক্ত দুগ্ধ ছিল না, সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও সে গিরিজাসুন্দরীকে কিছুই দিতে পারিল না। সনাতন চলিয়া গেলে, ভেকার মা দুগ্ধের পাত্র হস্তে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল। ভেকার মাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, বালক নরেন্দ্র, 'খুকীর দুধ্ দিয়ে যাও' বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া ভেকার মার অঞ্চল ধরিল। ভেকার মা, বালকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-পাইবার জন্য কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। বালক কোনমতেই কাপড় ছাড়িল না। প্রভাবতী বালকের

অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বারান্দা হইতে 'তবে রে হতচ্ছাড়া বাঁদর, দুধ্ খেতে খেতে পেট ডাগর হ'য়ে গেছে না?' বলিয়া বালককে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। বৃষ্টির জলে সিঁড়ি পিচ্ছিল হইয়াছিল। প্রভাবতী সিঁড়ি হইতে যেই নামিয়া আসিবেন অমনি তাঁহার পদস্খলন হইল। ত্রয়োবিংশতি বর্ষীয়া স্থূলকায়া যুবতী মহাশব্দে ধরণীতলে পতিত হইলেন।

বালক নরেন্দ্র হাঃ হাঃ হাঃ রবে হাতে তালি দিয়া উঠিল। ভেকার মা উচ্চ হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। গিরিজাসুন্দরী ঈষৎ হাস্য করিয়া মুখ ফিরাইলেন। বালকের উপর প্রভাবতীর ক্রোধ সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইল। তিনি সক্রোধে উঠিয়া বালককে বিরাশি দশ আনা ওজনে এক চপেটাঘাত করিলেন। বালক চীৎকার করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। গিরিজাসুন্দরী তাড়াতাড়ি বালককে ক্রোড়ে করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তখন ঝঞ্ঝাবাত একেবারে থামিয়া গিয়াছিল। বিষ্ণুপুরে সকলেই নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতে লাগিল। কিন্তু গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ঝড় প্রভাবতীর গৃহ হইতে উত্থিত হইয়া, থাকিয়া থাকিয়া, প্রবলবেগে তাঁহাদের গৃহে আঘাত করিতে লাগিল। তাঁহারা সমস্ত রাত্রি একরূপ অনিদ্রায় কাটাইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গিন্নি চতুষ্টয়—যত হাসি তত কান্না।

গিরিজাসুন্দরী প্রভৃতির সম্মুখে ওরূপভাবে পদস্খলিত হইয়া ভূমি-তলে পড়িয়া যাওয়ায়, প্রভাবতীর মানের গোড়ায় বড়ই গুরুতর আঘাত লাগিল। সেই সময় গিরিজাসুন্দরী যে ঈষৎ হাস্য করিয়া-ছিলেন, প্রভাবতীর এখন তাহা বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন না, এবং গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতাকর্ত্তৃক বারান্দা হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, তিনি কটিদেশে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ ভাণ করিয়া 'মাগো! বাবাগো! গেলুম গো' বলিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে শয্যার উপর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভেকার মা, প্রভাত হইবা মাত্র একবার বিষ্ণুপুর গ্রাম খানা ঘুরিয়া আসিল। তখন সর্ব্বেশ্বরী মাসী, মঙ্গলা ঠাকুরঝি, ঝুম্‌কো

পিসী, বোচার মা প্রভৃতি গিন্নি সম্প্রদায় পরস্পর বলাবলি করিতে করিতে সেনবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে সর্ব্বেশ্বরী মাসী বোচার মাকে বলিলেন, 'ইস্ বোন, এতটা কাণ্ড হয়ে গেল। আমরা, এর বিন্দু বিসর্গও জান্‌তে পেলুম না। আশ্চর্য্যি!'

ঝুম্‌কো পিসী তদুত্তরে বলিলেন, 'কেন জান্‌তে পার্ব্ব না? তখন রাত বেশী হয় নি। জোড় দেড় প্রহর হবে। আমি রসুই ঘরের বারান্দায় দাঁড়া'য়ে সব দেখ্‌তে পেয়েছি। সে কাণ্ডোর কথা কি বল্‌বো! প্রথম তো, গিন্নি পোড়ারমুখী, বড় বউ মাগীর চুল টেনে ধর্‌লে। তার পর ছোট বউ ছুঁড়ী, পেছন হ'তে এক ধাক্কা দিয়ে, বৌ মাগীটাকে একেবারে ধপাস্ ক'রে ফেলে দিলে। অতবড় জোয়ান মাগীটা একে বারে চিৎপাত হ'য়ে পড়ে গেল। ফেলে দিয়েই কর্ল্লে কিনা, অমনি দু'জনে মাগীর গলাটিপে ধর্‌লে। ভাগ্যি আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলুম, নইলে মাগীটাকে গলাটিপেই মেরে ফেল্‌তো।'

সর্ব্বেশ্বরী মাসী লোচনদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'তবে তো ভয়ঙ্কর কথা।'

ঝুম্‌কো পিসী পুনরায় বলিলেন, 'আমি আর কিছু ভাবছি নে, বোন্। বৌ ছুঁড়ীটার সাহস দেখে, আমি বসে গেছি। মাগো মা! এখনও বিয়ের জল গায়ে রয়েছে, এর মধ্যেই এতটা বাড়াবাড়ি। এ বউ যে জাতের হবে না,তা আমি বিয়ের বেলাই ঠিক্ ক'রে রেখেছি।'

মঙ্গলা ঠাকুরঝি ভ্রূ দু'খানি ফুলধনুর মত করিয়া সে কথায় সায় দিয়া বলিলেন, 'আর আজ কালের বউঝিদের কথা ছেড়ে দেও দিদি। আর কি আমাদের সেদিন আছে, না সেই সব বৌ ঝি আছে? এ ঘোর কলিকাল, এখন মান থাক্‌তে থাক্‌তে ভগবান্ উদ্ধার কর্ল্লে হয়।'

এইরূপ বলাবলি করিতে করিতে গিন্নি চতুষ্টয় অনতিবিলম্বে যাইয়া সেনবাড়ীর প্রাঙ্গণে দর্শন দিলেন। গিরিজাসুন্দরী বারান্দার একপ্রান্তে বসিয়া নিতান্ত বিষাদিতচিত্তে আপনার দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন সহসা গিন্নি চতুষ্টয়ের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। তাহারা প্রথমে সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। মঙ্গলা ঠাকুরঝি গিরিজাসুন্দরীর মুখের নিকট মুখ নিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, 'বলি. ও গিরি! এসব শুন্‌ছি কি?'

গিরিজাসুন্দরী নিজে মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছিলেন। মঙ্গলা ঠাকুরঝির প্রশ্ন এখন তাঁহার নিকট ভাল বোধ হইল না। তিনি কোন উত্তর না করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

মঙ্গলা ঠাকুরঝি পুনরায় বলিলেন, 'বলি, লোকে যে বল্‌ছে, একথা কি সত্যি?'

এবারও গিরিজাসুন্দরী কোন উত্তর করিলেন না। তাহাতে মঙ্গলা ঠাকুরঝি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। সুতরাং এইবার তিনি প্রশ্নের মাত্রা চড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, 'বলি তোরা নাকি বড় বউকে গলাটিপে মেরে ফেল্‌তে চাচ্ছিলি? তোদের কি আক্কেল লো!'

এবারও গিরিজাসুন্দরী কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি বিরক্ত হইয়া গিন্নিদিগকে পশ্চাৎ করিয়া বসিলেন, তাঁহাতে মঙ্গলা ঠাকুরঝির মেজাজ একেবারে গরম হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধভরে বলিলেন, 'ইস্ মাগীর গরিমা দেখ! আবার পিছন দিয়ে বসা হলো। কেন, আমাদের দিকে পিছন দেবার তুই কে? আটকুড়ী-ডাইনী।'

ঝুম্‌কো পিসীও সেই সঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'ঠিক কথা। তোর কি আক্কেল লো? আর আমরা যে ভালমানুষের মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছি, না হয়, আমাদিগকে একটু বসতেই বল। তা দূরে থাক্, বয়সে

বড় ব'লে একটু গ্রাহ্য করা নেই। কথার জবাব দেওয়া নেই। কেন এত দেমাগ্ কেন? আমরা তোর কোন তোয়াক্কা রাখি, না কোন ধার ধারি?—বেয়াক্কলী মাগী।'

এবারও গিরিজাসুন্দরী কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। সুতরাং গিন্নিরা আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া বরাবর প্রভাবতীর গৃহাভিমুখে চলিলেন।

গিন্নি চতুষ্টয় প্রভাবতীর গৃহে প্রবেশ করিলে প্রভাবতী কাঁদ কাঁদ স্বরে 'মাগো! বাবা গো! গেলুম গো' বলিয়া শয্যার উপর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং অতি ক্ষীণকণ্ঠে ভেকার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ভেকার মা! এদিগকে বস্‌তে দে বস্‌তে দে। হায়! হায়! আমার এমন ভাগ্য কবে হবে? দয়া করে, পায়ের ধূলা দিয়েছেন,এখনও বস্‌তে দিলি নি। বস্‌তে দে,—বস্‌তে দে'

তখন ভেকার মা তাহাদিগকে বসিবার জন্য চারি খানা আসন প্রদান করিল। কিন্তু তাহারা তাহাতে উপবেশন না করিয়া প্রভাবতীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিলেন, এবং কেহ মস্তিষ্কে হাত দিয়া, কেহ গায়ে হাত বুলাইয়া, স্ব স্ব সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মঙ্গলা ঠাকুরঝি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন 'ষাট্, ষাট্, কোথায় লেগেছে বাছা, বলতো?'

সর্ব্বেশ্বরী মাসী তদুত্তরে বলিলেন, 'তা আর দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না দিদি? একেবারে মাজা ভেঙ্গে গেছে। আহা! হা! এমন ক'রে মনুষ্যিকে কষ্ট দিতে হয়? যদি মরেই যেতো।'

প্রভা। আমার কি আর মরণ আছে, দিদি? ভগবান্ কি এমন দিন দিবেন? আপনারা সকলে তাই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সকাল সকাল যেতে পারি। আর দয়া ক'রে যদি এসেছেন, তখন একবার

পায়ের ধূলা দিন্। না জেনে কত পাপ করেছি, তারই ফলভোগ কর্চ্ছি।'

ঝুম। ষাট্—ষাট্, মর্বে কেন বাছা! ওকথা মুখে আন্তে নাই।

অতঃপর গিন্নিগণ প্রভাবতীর কষ্টে নানারূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রভাবতী তখন একে একে গিন্নি চতুষ্টয়ের পদরজঃ গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। তাহাতে গিন্নিগণ মনে মনে যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। সর্ব্বেশ্বরী মাসী, মঙ্গলা ঠাকুরঝির দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'দেখ্‌লে দিদি! বেদনায় এত কষ্ট পাচ্ছে, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। কিসে আমাদিগকে যত্ন কর্ব্বে, কেবল সেই চেষ্টা। আর ওরা কিনা একটু গ্রাহ্যও কল্লে না। এ সব দেখে শুনে কি না বোঝা যায়?'

প্রভা। সে কথা ছেড়ে দেও দিদি! ঠাকুরঝি তো গিন্নি হয়েছেনই। আর ছোট বৌও ভাবছে, সেও বুঝি পৃথক্ হ'লে রাজরাণী হবে। সেই জন্য মনুষ্যকে মনুষ্য বলে গ্রাহ্য করা নেই। তা পৃথক্ হ'তে চায়, হউক, আমি আর বাধা দিব না।

ঝুম্‌কো পিসী বলিলেন, 'না না, আর বাধা টাদা দিও না, বাছা! যেরূপ কাণ্ডো কারখানা দেখ্‌ছি, এতে বাধা দিলে তোমাকে আস্ত রাখবে না।

প্রভা। বোঝাও যাচ্ছে তাই।

বোচার মা এ পর্য্যন্ত কোন কথাটী কহেন নাই। এতক্ষণে তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা ছোট বউ যে এতটা বাড়াবাড়ি কচ্ছে, তাতে ওর সোয়ামী কিছু বলে না?'

ভেকার মা তদুত্তরে বলিল, 'তাই যদি বুঝতে না পার্ব্বে দিদি, তবে আর গিন্নিপনা ক'রে চুল পাকালে কি করে? ভিতরে ভিতরে টিপ্পনি আছে। নইলে কি এতটা সাহস পায়?'

সহসা গিন্নি চতুষ্টয়ের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তখন সমস্ত বিষয়ই যেন সহসা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া পড়িল। মঙ্গলা ঠাকুরঝি মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, 'ওহো !! তাই তো! শ্যামের বাঁশী না বাজ্‌লে দূরে ; সাধে কি রাই মূর্চ্ছা পড়ে।' এতক্ষণে কথার ভেদ পাওয়া গেল।'

অতঃপর গিন্নিগণ প্রভাবতীকে নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গিন্নিরা চলিয়া গেলে, ভেকার মাও গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। তাহার অর্দ্ধদণ্ড পরেই সেনদের কুলপুরোহিত মহামহিম কাশীকান্ত বাচস্পতি প্রভাবতীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে ভেকার মা।

বাচস্পতি মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিয়াই প্রভাবতীকে বলিলেন, 'হেঁ মা! তুমি নাকি পীড়িতা? আমাকে নাকি আস্‌তে বলেছ?'

প্রভাবতী কথা কহিতে নিতান্ত কষ্টানুভব করিতেছেন ভাণ করিয়া, মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। বাচস্পতি মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এইরূপ আকস্মিক পীড়ার কারণ কিছু শুন্‌তে পাই কি, মা?'

এইবার ভেকার মা, পাড়ার গিন্নিদিগের নিকট যেরূপ রটাইয়া আসিয়াছিল, ঠিক সেই প্রকার বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট বর্ণনা করিল। বাচস্পতি মহাশয় গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার স্বভাব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা যে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, তাহা তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু যজমানের মন রক্ষা করিয়া চলা, যাজনিক ব্যবসায়ীর একটী প্রধান মূলমন্ত্র। বাচস্পতি মহাশয়ের এ মূলমন্ত্রে, কখনও ভুল হইত না, এবং এই মন্ত্রে নির্ভর করিয়াই, তিনি যজমান মহলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রভাবতীর মনস্তুষ্টির জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়াই গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার উপর কিঞ্চিৎ অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিতে হইল। কিন্তু প্রভাবতী কেবল ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। বাচস্পতি মহাশয়কে হস্তগত করিবার জন্য প্রভাবতী একটী মহৎ উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে উপায়, পক্ষান্তরে উৎকোচ প্রদান। প্রভাবতীর প্রপিতামহের আমলের একখানা ঠিকুজী ছিল। একথায় পাঠক পাঠিকা কেহ সন্দেহ করিবেন না। রাম না জন্মিবার পূর্ব্বে, বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের ফলাফল জানিতে পারিয়াছিলেন। প্রভাবতীর প্রপিতামহ অতি অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন অদ্বিতীয় মেধাবী পণ্ডিত ছিলেন। আপনার বংশে প্রভাবতী হেন এক সর্ব্বগুণসম্পন্না সুলক্ষণা মেয়ে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা তিনি জ্ঞানবলে জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই তাঁহার একখানা ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অথবা এমনই কি একটা ঘটিয়া থাকিবে। স্থুলকথা, প্রভাবতীর একখানা ঠিকুজী ছিল। প্রভাবতী অদ্য তাহা নিতান্ত প্রয়োজনবশতঃ বাক্স হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। তৎপর সেই ঠিকুজী খানা ও পাঁচটি টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ পুরোহিত মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, 'আমার সময় নিতান্ত মন্দ বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি এই ঠিকুজী খানা, একবার ভাল ক'রে দেখুন। আর যা'তে গ্রহশান্তি হয়; তজ্জন্য কিছু যাগযজ্ঞ করুন।'

বাচস্পতি মহাশয়ের যাগযজ্ঞে ইহলোকে কেহ কোন প্রতিকার পায় নাই। আর যে পাইবে তাহাও দুরাশা মাত্র। তবে প্রভাবতী হেন লবঙ্গলতা কেন যে তাহাকে যাগযজ্ঞের জন্য পাঁচটী টাকা প্রদান করিলেন, তাহা পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে কি ? যাহা হউক,

টাকা, পাঁচটী পাইয়া বাচস্পতি মহাশয়ের মুখখানা হাস্যময় হইয়া উঠিল। তিনি আহ্লাদে গদ্‌গদকণ্ঠ হইয়া বলিলেন, 'এ যেন হলো। কিন্তু ভৌতিক কার্য্য, সকল সময় আশুফলপ্রদ হয় না। আশুপীড়া-শান্তির কোন বিহিত করা হয়েছে কি? চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয় না?'

প্রভাবতী জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, 'আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন, করুন। আর এসব ঘটনা উল্লেখ ক'রে, শীগ্‌গির-শীগ্‌গির কর্ত্তাকে বাড়ী আস্‌তে যদি লোক মারফত একখানা চিঠি পাঠান, তো ভাল হয়। আমি বলেছি ব'লে, কোন কথা উল্লেখ কর্ব্বেন না। কি জানি, মাম্‌লা মোকদ্দমায় অস্থির আছেন, কিসে কি হয়।'

ভেকার মা, সে কথায় সায় দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ গো ঠাকুর! বাবুকে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বাড়ী আস্‌তে লিখে পাঠাও। ছোট বউ আর দিদি ঠাক্‌রুণ যেরূপ আরম্ভ করেছে, তাতে এ বাড়ীতে তিষ্ঠিতে, আমারও ভয় হয়। কি জানি বাবু, কবে আমাকেই পেয়ে বসে। মা গো মা! পৃথক্ হওয়ার জন্য লোকে যে এতটা করে, এমন তো কোথাও দেখিনি।'

বাচস্পতি মহাশয় হুঁসিয়ার লোক। তিনি জীবনে অনেক পরিবারকে পৃথক্ হইতে দেখিয়াছেন, এবং নিজ তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরিচালনা করিয়া, স্বীয় যজমান সম্প্রদায়মধ্যে অনেক পরিবারকে পৃথগন্ন করিয়া, আপনার পসার বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। ভেকার মার উক্তি শুনিয়া, তিনি অনায়াসেই প্রভাবতীর মনোগত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তাহাতে তাহার উৎফুল্লতা আরো বৃদ্ধি পাইল। তিনি ঈষৎ হাস্য করতঃ মনে মনে বলিতে লাগিলেন 'কাশীশর্ম্মা এতে রাজী না হবেন কেন! বারো মাসে তের পার্ব্বণ, সব দুনো হ'য়ে যাবে।

দু'দুটা লক্ষ্মীপূজা, দু'দুটা মনসা পূজা, মাসে দু'দুটা স্বস্ত্যয়ন—দুনো নৈবেদ্য—দুনো দক্ষিণা—দুনো ভোজন, সব দুনো—(হাঃ হাঃ হাঃ) কাশীশর্ম্মা তো এই চায়।' তৎপর ভাবিতে লাগিলেন, 'বেটী কি বোকা, এর জন্য কাশী শর্ম্মাকে টাকা দিলে কেন? কিসে আপনার পসার বৃদ্ধি কর্ত্তে হয়, কাশী শর্ম্মার কি তাতে ভুল হয়? তা যদি হতো, তবে এই ইঙ্গবঙ্গ সমাজে, আজ কাশীশর্ম্মাকে অন্ন ক'রে খেতে হতো না।'

বাচস্পতি মহাশয় চক্ষের পলকে এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া, প্রভাবতীর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রভাবতীর ইচ্ছানুরূপ কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রজনীকান্তের নিকট লোক মারফত তাহা পাঠাইয়া দিলেন। তৎপর হৃষ্টমনে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সহধর্ম্মিণীকে এই শুভ সংবাদ জানাইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়াশান্তি

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রজনীকান্ত বাচস্পতি মহাশয়ের প্রেরিত পত্র প্রাপ্ত হইলেন। বাচস্পতি মহাশয় মোটামুটি বিষয় বর্ণনা করিয়া, প্রভাবতীর আঘাত সাংঘাতিক, জীবন সঙ্কটাপন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। সুতরাং পত্র পাইয়া রজনীকান্তের মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। প্রাণ দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, সেই দিবসই রওনা হইয়া, রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হইয়াই বরাবর নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—প্রভাবতীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশ-কলাপ, অসংযত অবস্থায় শয্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে;—ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে;—ভেকার মা পীড়িতার শুশ্রূষা করিতেছে;—আর বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন। রজনীকান্ত শশব্যস্তে ডাকিলেন, 'প্রভাবতি! প্রভাবতি!'

প্রভাবতী তখন আসমানের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন.'কে তুমি—এসেছ—এসেছ—উঃ—বুকে—বুকে—বড় ব্যথা—বড় ব্যথা—ঐ যা—গেল—গেল—নিয়ে গেল।

প্রভাবতীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া এবং তাঁহার অসংলগ্ন কথা শুনিয়া রজনীকান্ত চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তিনি বাচস্পতি মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায়' বলিয়া উঠিলেন, 'পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়! আর দেখ্‌ছেন কি? আমার সর্ব্বনাশ হলো। আমি কবিরাজ মহাশয়কে ডেকে নিয়ে আসি।'

বাচস্পতি মহাশয় সমস্তই বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি রজনী-কান্তকে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত করিলেন। বলিলেন, 'কবিরাজ ডেকে কোন দরকার নেই। তোমার নিকট চিঠি পাঠাইয়াই, আমি ওর ঠিকুজী দেখেছি। তাহাতে অপঘাতের সম্ভাবনা দেখা যায় বটে, কিন্তু জীবনের কোন আশঙ্কা নাই। শনি বক্রী, কিন্তু বৃহস্পতি পঞ্চমে আছেন। তবে আপাততঃ পীড়া শান্তির জন্য একটী মুষ্টিযোগ দিয়েছি, তাতেই ব্যথা কমে যাবে, আর সুনিদ্রা হবে।'

বস্তুতঃ তাহাই ঘটিল। বাচস্পতি মহাশয় কখন কি মুষ্টিযোগ দিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি, কিন্তু তাহার কথানুরূপ সুফল ফলিল। ইহার পর হইতেই প্রভাবতীর বেদনার অনেক লাঘব হইল। ছট্‌ফটানিও ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই তিনি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বাচস্পতি মহাশয় বাটীতে গমন করিলেন। ভেকার মাও নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তি লাভ করিল। রজনীকান্তের নয়নে আজ নিদ্রা আসিল না। গরীব বেচারী প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া সারারাত্রি প্রেমময়ীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাটাইলেন।

প্রভাতে বাচস্পতি মহাশয়ের মুষ্টিযোগের প্রত্যক্ষ ফল ফলিল—

প্রভাবতী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। রজনীকান্ত যেন হারানিধি কুড়াইয়া পাইলেন।

এদিকে ভেকার মা প্রভাত হইবামাত্রই মুহূর্ত্তের জন্য একবার পাড়াখানা ঘুরিয়া আসিল। পর মুহূর্ত্তেই বাচস্পতি মহাশয়, ঝুম্‌কো পিসী, মঙ্গলা ঠাকুর ঝি প্রভৃতি গিন্নি সম্প্রদায়, প্রভাবতীকে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার কথা লইয়া এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। বাচস্পতি মহাশয় রজনীকান্তকে বলিলেন, 'কি হে ভায়া! নারী চরিত্র দেখ্‌লে তো? এখন বুঝে শুনে কাজ করো। একটা অত্যাহিত না হয়, তাই বাঞ্ছনীয়।'

রজনী। যেরূপ কাণ্ড কারখানা আরম্ভ করেছে, তাতে আশ্চর্য্য কি? আমি নিতান্ত আহাম্মক. তাই এর চরিত্রের উপর সন্দিহান হ'য়ে, একে কত লাঞ্ছনা দিয়েছি। কত দুর্ব্বাক্য বলেছি। যা হ'ক, ভগবান্ সময়ে আমার হুস্ করে দিলেন।

বাচ। এখনও যে তোমার চক্ষু ফুটেছে, আমার বিবেচনায় সেও মঙ্গল। এখন ভবিষ্যতে আর যাতে কোনরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে, সেই চেষ্টা কর। গিরিকে ডেকে, সে বিষয়ে এখনই ব'লে ক'য়ে দেও।

রজনী। আর বলাবলি কি! বনিবনাও যখন হচ্ছে না, তখন সকলের পৃথক্ থাকাই ভাল।

এই বলিয়া রজনীকান্ত 'গিরি গিরি' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মধুর সম্ভাষণে গিরিজাসুন্দরীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি অতি শঙ্কিত অবস্থায়, ধীরে ধীরে আসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রজনীকান্ত নিতান্ত কর্কশ স্বরে বলিলেন, 'বলি, তোমরা এসব আরম্ভ করেছ কি? একে কি

তোমরা ঘর চাপা দেবে, না মাথায় বাড়ি দিয়ে মেরে ফেল্‌বে? তোমাদের মৎলবখানা কি?'

গিরিজাসুন্দরীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রজনীকান্ত পুনরায় বলিলেন, 'বলি কথার জবাব দেবে, না দাঁড়িয়ে থাক্‌বে?'

গিরিজাসুন্দরীর হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া বলিলেন, 'আমরা বউকে ফেলে দিব কেন, দাদা! সে আপনা হইতেই সিঁড়ি হ'তে পড়ে গিয়েছিল। আমি ছেলের মাথায় হাত দিয়া বল্‌তে পারি, এতে আমাদের কোন দোষ নাই।

রজনী। এই যে পাড়াসুদ্ধ লোকে বল্‌ছে, এরা কি তবে মিছে কথা বল্‌ছে? তোমাদের মনে যা ছিল, তাতো করেছ। এখন যা বলি, কাণ দিয়ে শুন। তুমিতো পৃথক্ খাচ্ছই। আর ছোট বউকেও বল, সে আজ হ'তে হাঁড়ী পৃথক্ করুক। সুবোধকেও আমি এ বিষয়ে শীঘ্রই লিখে দিচ্ছি। আর তোমাকেও বল্‌ছি, যেন ভবিষ্যতে এর উপর আর কোনরূপ অত্যাচার না হয়। এর পর যদি কোন ঘটনা ঘটাও, তা হলে এ বাড়ীতে তিষ্ঠা ভার হবে। আমার স্পষ্ট কথা।'

গিরিজাসুন্দরীর নয়ন জলভারাক্রান্ত হইল। তিনি গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, 'দাদা!'

রজনীকান্ত বাধা দিয়া বলিলেন, 'থাক্ ওডাক্ আর ডাক্‌তে হবে না। ও ডাক্ এই পর্য্যন্ত।

গিরিজাসুন্দরী আর কোন উত্তর না করিয়া ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার পর রজনীকান্ত সুবোধচন্দ্রের নিকট একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। সাংসারিক অবস্থা তিনি যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তদ্রূপই লিখিয়া পাঠাইলেন।

অপরাহ্ণ সময়ে বাচস্পতি মহাশয় বাটীতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় গিরিজাসুন্দরীকে চুপি চুপি বলিলেন, 'আর ভেবে চিন্তে কি হবে, দিদি! সংসারের এই রীতি। ভাই বোন্ কেউ কারো নয়। এখন আপনাদের পথ দেখ। ছোট বউমার সহিত পরামর্শ ক'রে সুবোধকে বাড়ী আস্‌তে লিখে পাঠাও।'

বলা বাহুল্য, বাচস্পতি মহাশয়ের এরূপ মনরাখা কথায় গিরিজা-সুন্দরী বিশেষ তুষ্টিলাভ করিলেন না। প্রভাবতীর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে আরো পাঁচ সাত দিন বিলম্ব ঘটিল। সুতরাং সেই কয়দিন রজনীকান্তকেই রন্ধনকার্য্য সমাধা করিতে হইল। তৎপর প্রভাবতীকে বিশেষরূপে আশ্বাস দিয়া, মাম্‌লা মোকদ্দমার তদ্বিরে, তিনি পুনরায় বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

-০০০-

হেমলতার বিভীষিকা ও অভয়াভাব

আষাঢ় মাস। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। ছোট বউ হেমলতা সন্ধ্যার পর শয়নঘরের এককোণে রান্না চড়াইয়া নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া আছেন। নৈশ সমীর হুঁ হুঁ শব্দে গৃহদ্বারে আঘাত করিতেছে। বালিকা থাকিয়া থাকিয়া এক একবার চমকিয়া উঠিতেছেন এবং এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া, ভয়াকুলমনে পুনর্ব্বার উননে এক এক খানা করিয়া কাষ্ঠ গুজিতেছেন। দুই দিবস পূর্ব্বে, হেমলতা যাহা দেখিয়া ভয় করিতেন না, আজ তাহার ছায়ামাত্র কল্পনা করিতেও তাঁহার প্রাণ থর থর কম্পমান হইতেছে,—তিনি শঙ্কিত মনে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। বিদ্যুদালোক থাকিয়া থাকিয়া, অস্ত্রঝলকের ন্যায় তাঁহার নয়নসমক্ষে ঝলসিয়া উঠিতেছে, হেমলতা তাহা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া এক এক বার চক্ষু বুজিতেছেন;—অমনি শ্রবণ-ভৈরব মেঘধ্বনি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল আলোড়িত করিয়া, এক এক

বার প্রতিধ্বনিত হইতেছে ;—তিনি হঠাৎ চক্ষু মেলিতেছেন এবং ভয়াকুলমনে পুনর্ব্বার উনুনে এক একখানা করিয়া কাষ্ঠ গুজিতেছেন।

আজ হেমলতা আর বালিকা নহেন। সংসারের গুরুচিন্তা তাঁহার কোমলহৃদয়ে স্থানলাভ করিবার জন্য আজ ভয়ানকরূপে আস্ফালন করিতেছে। আজ হাসিতামাসা চলিবে না। আজ কুসুমকোমলবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চিন্তাকালফণীর প্রবেশের পথ করিতে হইবে। নতুবা সংসার টিকে না। বুঝি জীবন যায়।

অদ্য তিন দিবস হইল হেমলতাকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। প্রথম দিন, হেমলতা অনাহারে কাঁদিয়া কাটাইলেন। দ্বিতীয় দিন, হেমলতা চক্ষের জল মুছিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবস, চিন্তা-ফণী বিদ্যুদ্বিস্ফুরণের ন্যায় তাঁহার নিকট দেখা দিল। আজ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে দংশন করিতেছে। হেমলতা থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন।

ক্রমে অন্ধকার বাড়িল। প্রকৃতি করালবদন ব্যাদান করিয়া কত ভয়, কত বিভীষিকা উৎপাদন করিল। কতবার ক্ষীণকণ্ঠনিঃসৃত 'মা মা' কণ্ঠস্বর সদৃশ এক সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি, নীরবে তাঁহার আত্মার কোমলতম স্থান হইতে উত্থিত হইয়া, নীরবে সাহায্য যাচ্ঞা করিল, কিন্তু কৈ ?—কে কোথায় ? আজ অভাগিনী সুকুমারী বালিকার কে সহায় ? কত চিন্তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাঁহার কোমলহৃদয় দগ্ধ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে নিষ্প্রভ হইল। কত চিন্তা সুদূরবিদ্যুদ্বিলসনের ন্যায় দেখা দিয়া, পুনরায় অন্ধকারে বিলীন হইল। হেমলতা তাহা নীরবে সহ্য করিলেন। ঝটিকাপ্রবাহ থাকিয়া থাকিয়া, আজ কতবার গৃহে আঘাত করিল, হেমলতাও ভয়াকুলমনে কত কি চিন্তা করিলেন। কিন্তু কি ভাবিলেন ?—কে বলিবে ? বুঝি একবার ভাবিলেন, 'মনুষ্য',

আর একবার ভাবিলেন, 'অন্ধকার' আর একবার ভাবিলেন, 'বিবাদ বিসংবাদ।' তারপর? তার পর, বিদ্যুৎ ঝলসিল—মেঘ ডাকিল, হেমলতা আর ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু ভয়ের ভাবে ত্রাসিত হইয়া মনুষ্যের আত্মা যখন একেবারেই অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন ভয়ের শেষে, মায়ের অভয়াভাবের মত, কি এক আশ্বাসভাব কখনো কখনো একটা সূত্র অবলম্বন করিয়া আপনা হইতেই হৃদয়ের মধ্যে উত্থিত হইয়া মনুষ্যকে আশ্বাসিত করিয়া তুলে। হেমলতারও তাহাই ঘটিল। নিকটে সুকুমারী বালিকা চারু একখানা ছোট শয্যার উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। মেঘের শব্দ বালিকার কর্ণে পৌঁছিল বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল। হেমলতা তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অভয়াচরিত্রের ক্ষণিকবিকাশে সহসা তাঁহার মনপ্রাণ ভরপূর করিয়া তুলিল। হেমলতা বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া মধুরবাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মাতৃশক্তির পীযূষপ্লাবনে মুহূর্ত্তের মধ্যে চিন্তা আশঙ্কা কোথায় ভাসিয়া গেল।

তখন টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল। গিরিজাসুন্দরী সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ক্রয় করিবার জন্য গোয়াল্ পাড়ায় গমন করিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই প্রবলবেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। তিনি পথিমধ্যে অন্যবাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। হেমলতা বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া ভয়াকুলমনে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় বাহিরে কাহার পদধ্বনি শ্রুত হইল। পর মুহূর্ত্তেই একটী হাস্যময়ী রমণী সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন! তিনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা চপলকুমারী। চপলকুমারীকে পাইয়া হেমলতা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বলিলেন,—

তুমি এসেছ, দিদি! ভালই হয়েছে! আমার বড্ড ভয় কচ্ছিল।'

চপল। বলিস কি?—সত্যি?

হেম। হাঁ ভাই।

চপল। তবে তো এসে ভালই করেছি। তৎপর হাত নাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

'কি ভয় কি ভয় সখি! কি ভয় কি ভয়,
কি ভয় করলো, বিন্দে'—

চপলকুমারীর কথা শেষ হইতে না হইতেই, হেমলতা স্বীয় বসনাঞ্চলাগ্রভাগ দিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। চপলকুমারী খল্ খল্ হাসিতে লাগিলেন। হেমলতা বলিলেন, 'না ভাই! তুমি যদি ওরূপ বক্তৃতা কর, তা হ'লে আমি তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বো না।'

চপল। তা হ'লে আমিও তোর ঠাকুরদাদার কাছে চলে যাই। তুই একলা ঘরে ডরিয়ে ডরিয়ে মর্।

হেম। না ভাই। আমার বড্ড ভয় হচ্ছে।

চপল। তা হ'লে আমি যা খুসি, তাই বল্‌বো, তুই কোন বাধা দিবি না।

হেম। না দিব না। কিন্তু আমি যা জিজ্ঞাসা করি, সেই কথার আগে উত্তর দেও

চপলকুমারী সুর করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

'কি সুধাবি, সই লো, আমার, কি সুধাবি সই।
রইতে নারি, শ্যামের বাঁশী বাজ্‌ছে দূরে ওই॥'

তৎপর সোহাগভরে হেমলতার গণ্ডস্থল টিপিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

চাঁদবদনী, ভাতার-সোহাগী
কি সুধাবি, বল না?'

হেম। তোমার হাতে ওখানা কি ভাই ?

চপ। দূতী ;

হেম। ঐ যা—কেবল তামাসা !

চপ। না না, তামাসা নয়। সত্যি।

হেম। এ যে একখানা কাগজ দেখ্‌ছি।

চপ। তুই যেমন হাবা, তাই বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না।

দূতী কা সম, কত হি নাগরী,
বোলত যৈছন বারতা কোই ;
তৈছন কহসু সেইঞাঁ হামারি
শ্যামকি ভেট্‌নে আওল সই।'

হেমলতা আর হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

'পণ্ডিত জি ! তারপর—তারপর,—

চপলকুমারীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনিও হাসির লহরে গৃহ মাতাইয়া বলিতে লাগিলেন,—

তারপর, তারপর, অদ্ভুত স্বপন
যা দেখিনু, প্রাণসখি, শুন মন দিয়া,
প্রবাস হইতে এক যুবক সুজন
আসিয়া, বসিল মোর সখী কোলে নিয়া।

হেম। তার পর ?

চপ। পৃথক্‌ সংসার এক করিল পত্তন।

হেম। তার পর ?

চপ। জন্মিল তনয় এক রূপেতে সুঠাম।

'তুমি গোল্লায় যাও' বলিয়া হেমলতা সম্মুখস্থিত একখানা নেক্‌ড়া

পুটুলী করিয়া চপলকুমারীর মুখের উপর ছুড়িয়া মারিলেন। চপলকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ইস্. এত রাগ কেন? তোর কি ছেলের মা হ'তে সাধ করে না?'

হেম। তোর করে করুক, আমার করে না। না, তামাসা যাউক। তোমার হাতে ওখানা কিসের কাগজ, এখন আমায় বল্‌বে কিনা, বল।

চপল। সাধে কি তোকে আমি হাবা বলি? এখনও বুঝ্‌তে পেলি না এ যে চিঠি।

হেম। কার ভাই?

চপ। তোর ঠাকুরদাদার।

হেম। কে লিখেছে?

চপ। সুবু।

হেম। দূর্—মিছে কথা।

চপ। না না, সত্যি। এই ছ্যাখ।

এই বলিয়া চপলকুমারী পত্রখানা খাম হইতে খুলিয়া হেমলতার হস্তে দিলেন। হেমলতা প্রদীপালোকে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। সুবোধচন্দ্র গিরিজাসুন্দরীর পত্র পাইয়া চপলকুমারীর স্বামী বৃদ্ধ শ্যামসুন্দর রায় মহাশয়ের নিকট লিখিয়াছেন,—

'ঠাকুর দাদা! মথুরা হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় তোমাদের কলিকাতা হইয়া যাইবার কথা ছিল। আমি তোমার ও ঠানদিদির বাসোপযোগী ভবানীপুরে একখানা দ্বিতলবাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। সম্প্রতি জানিতে পারিলাম, তুমি বাড়ী গিয়াছ। ঠানদিদির ফাঁদে পড়ে, তোমার বুদ্ধি বিগ্‌ড়ে গ্যাছে। ঠান্‌দিদির নিকট আমার একসের রসগোল্লা পাওনা ছিল। ভাবিয়াছিলাম, এইবার তাহা আদায় করিব। আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। যাহা হউক,

ঠানদিদিকে বলো, চিত্রগুপ্তের খাতায় কখনও ভুল হয় না। বাগে পেলে, সুদে আসলে আদায় করে নিব। তা যাউক। গতকল্য দিদির একখানা পত্র পাইয়াছি। তিনি তাঁহার পৃথগন্ন হইবার কথা এবং আরো আমাদের সংসারের বিস্তর গোলযোগের বিষয় লিখিয়াছেন। এবং দাদা ও বধূঠাকুরাণীর উপরই সম্পূর্ণ দোষারোপ করিয়াছেন। আমার তাহাতে বিশ্বাস হয় না। হলেও, সামান্য পারিবারিক কলহ হইয়া থাকিবে,—এই মাত্র। আমার বোধহয়, আমাকে বাড়ী নেওয়াইবার, এও দিদির এক অভিনব ফন্দী। যাহা হউক। প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত রহিলাম। পত্র পাঠ আসলকথা লিখিয়া জানাইও। তোমার পত্র পাইলে আমি দিদির পত্রের জবাব দিব। শারীরিক ভাল আছি। তোমাদের বুড়ো বুড়ীর কুশল লিখিও। ইতি—

তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষী

'সুবু'।

বস্তুতঃ সুবোধচন্দ্রের এরূপ পত্র লিখিবার বিলক্ষণ কারণ ছিল। গিরিজাসুন্দরী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুপস্থিতি তাহার নিকট সহনাতীত হইত। কনিষ্ঠভাই দীর্ঘকাল বাটীতে অনুপস্থিত থাকিলে তিনি অনেক সময় নিজের পীড়ার ভাণ করিয়াও তাঁহাকে বাটী আসিতে লিখিয়া পাঠাইতেন। সুবোধচন্দ্র একবার বাটী আসিলে তিনি সহজে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেন না এবং যাইবার সময় বিস্তর কান্দাকাটি করিতেন।

হেমলতা একবার দুইবার তিনবার পত্রখানা পাঠ করিলেন। তৎপর পত্রখানা চপলকুমারীর হস্তে প্রদান করিয়া মৌনভাবে আপনা আপনি কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে চপলকুমারী বলিলেন, 'কিলা কথা কচ্ছিস্ না যে? ভাব উত্‌লে উঠ্‌লো নাকি?'

হেমলতা কোন উত্তর করিলেন না। চপলকুমারী পুনরায় বলিলেন, 'ও হো! বুঝেছি। সুবু বাড়ী আস্‌লে না, তাই বুঝি ভাবছিস্? মর্ ছুঁড়ী সে জন্য চিন্তা কি? আমি ঠিক্ বল্‌ছি, তোর ঠাকুর দাদার চিঠি পেলেই—লেখা পড়া সব চুলোয় দিয়ে, সঈর কাছে সে আস্‌বে ধেয়ে।'

হেম। না, ভাই, রঙ্গ রাখ। আমার বড্ড ভয় হচ্ছে।

চপ। কেন?—বোনের চিঠি বিশ্বাস করে নাই ব'লে?

হেম। হেঁ ভাই—কি জানি যদি তিনিও আমাদিগকেই দোষী মনে করেন।

চপ। সে ভয় করিস্ না। সত্য কখনও গোপন থাকে না।

হেম। যদি হয়।

চপ। তাহ'লে পৃথিবী উল্টে যাবে। তোর ঠাকুরদাদার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘট্‌বে।

চপলকুমারীর কথার ভাব হেমলতা সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়মধ্যে কেমন একটা প্রবোধ জন্মিল। তিনি উপস্থিত কথা বন্ধ করিয়া, কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা ভাই! ঠাকুরদাদাকে নিয়ে এই যে কয়টা মাস এতটা জায়গা ঘুরে এলে, এতে তার শারীরিক অবস্থা ভাল আছে তো?

চপ। শরীরে কোন অসুখ দেখ্‌তে পাইনে। মুখখানি প্রেমে গদ্‌গদ হ'য়ে হাসির হিল্লোলে সদা ভাস্‌ছে।

হেম। আর মানসিক অবস্থা?

চপল। মাতোয়ারা নটবর ঈশপ্রেমে রঙ্গে।

হেম। সে কি রকম?

চপল। শিখয়ত অলি যাহা কলিকাপ্রসঙ্গে।

হেমলতা হাসিয়া বলিলেন,—

'কলিকাপ্রসঙ্গে অলি কি শিখে ভাই ?'

চপল। প্রেম। যে প্রেমে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে—এ সেই প্রেম। যে প্রেমে, সেই অনাদি অনন্তপুরুষ সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্মের মহাপ্রেম শিক্ষা দেয়, এ সেই প্রেম। এই যে আমাদের স্ত্রীপুরুষের দাম্পত্যপ্রেম দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ ভাই! এও সেই মহাপ্রেমে পৌঁছিবার এক মধুর প্রবাহস্বরূপ।

হেম। রাখ্ ভাই। আমি তোর হিজিবিজি কিছু বুঝ্‌তে পারি না।

চপলকুমারী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—

প্রেম সলিলে, নাহি ভাসিলে,
বুঝ্‌বি কিসে, ভাই,
বুঝ্‌বি যত, চাইবি তত
সে' মহাপ্রেমে ধাই।

হেম। প্রেমের মাহাত্ম্যটা তুই কিন্তু বুঝেছিস্, যা হ'ক্।

চপ। নইলে কি দিবানিশি এমনটি করে হেসে বেড়াতে পার্ত্তুম? তা হ'লে আমাকেও যে প্যাঁচামুখী হ'যে ঘরের কোণে বসে বসে ভাব্‌তে হতো।

এই ব'লিয়া চপলকুমারী সোহাগভরে হেমলতার গণ্ডস্থল টিপিয়া দিলেন। হেমলতা কি বলিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় গিরিজাসুন্দরী নরেন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া, সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চপলকুমারীর কথা বন্ধ হইল। পর মুহূর্ত্তেই, তিনি ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুবোধচন্দ্রের পত্র,—দেখি কি হয়?

ঘটনাক্রমে রজনীকান্ত ও শ্যামসুন্দর বাবের চিঠি একসঙ্গেই কলিকাতায় পৌঁছিল। সুবোধচন্দ্র বাসায় ছিলেন না। হরকরা মেসের ভৃত্যের নিকট পত্র রাখিয়া চলিয়া গেল। সুবোধচন্দ্র বাসায় প্রত্যাগত হইয়াই পত্র দুইখানা প্রাপ্ত হইলেন। বাটীর চিঠি পাইয়া সুবোধচন্দ্রের মনোমধ্যে আজ কেমন একটা অভাবনীয় আশঙ্কা জন্মিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুবোধচন্দ্র তাড়াতাড়ি নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে পত্র দুই খানা পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহা পাঠ করিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল। ভাবনায় দুশ্চিন্তায় তিনি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। গিরিজাসুন্দরীর দুর্দ্দশার বিষয় স্মরণ করিয়া সুবোধচন্দ্র অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভালবাসা, অনাথা ভগিনীর অকৃত্রিম স্নেহানুরাগ, আজ

থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র মুমূর্ষু রোগীর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া সারারাত্রি অনাহারে কাটাইলেন। হায়! কঠিন সংসার! তোমাতে কত ভালবাসার ফুলইবা ফোটে। কতটুকুই বা ফোটে। আর কতটুকুই বা ফুটিবার অবকাশ পায়।

পরদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সুবোধচন্দ্র বাড়ী যাওয়ার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে যত্নবান্ হইলেন। মেসের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে দু'এক জন সমপাঠীর সহিত সুবোধচন্দ্রের বেশ মিশামিশি ছিল। সুবোধচন্দ্র আজ তাহাদের নিকট মোটামুটি অবস্থা বর্ণনা করিয়া, এখন বাড়ী যাওয়া সঙ্গত কিনা, তদ্বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাড়ী গেলে, পাঠের অনিষ্ট হইবে বিবেচনা করিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে সম্প্রতি বাড়ী যাওয়া স্থগিত রাখিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট একখানা পত্র লিখিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সুবোধচন্দ্রও সেই পরামর্শ নিতান্ত অসঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি পরদিবস একখানা চিঠি লিখিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহা এইরূপ,—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

দাদা! আপনার পত্র পাইলাম। পত্র পাইয়া, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। সংসার আমার নিকট অন্ধকারের ন্যায় বোধ হইতেছে। আপনার শ্রীচরণে আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি. যে আমাকে এ বয়সে, আপনার স্নেহসুকোমল ক্রোড় হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন? দাদা! আপনার পায়ে পড়ি, এরূপ বিষময় পত্র লিখিয়া, আপনার হতভাগা সহোদরকে আর মনঃকষ্ট দিবেন না। দুই বৎসরের অধিক হইল, আমি আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদ লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। বাটীর গোলযোগের বিষয় কিছুই অবগত নহি। তবে কি দোষে যে, আমাকে এরূপ কঠিন শাস্তি দিয়াছেন,

তাহা আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। দাদা! দাদা! যদি না জানিয়া, আপনার শ্রীচরণে কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে অন্য শাস্তি বিধান করুন ; কিন্তু এরূপ গুরুতর শাস্তি—এরূপ মর্ম্ম-স্পর্শিনী বিষময়ী যাতনা, আপনার ভ্রাতৃবৎসল সহোদর, সহ্য করিতে নিতান্তই অক্ষম। দাদা! আপনি আমাকে—আপনার মায়ের পেটের ভাইকে, পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন—না, দাদা! সে কথা মনে করিতেও আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠে ;—আপনি ওরূপ বাসনা আর মনে স্থান দিবেন না।

আর মনে করে দেখুন দাদা! এ সংসার কয় দিনের জন্য ? এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের জন্য—এই নশ্বর সংসারের জন্য, মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া, ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক্ হইব! উঃ কি বিষম! জগদীশ্বর করুন, তাহা যেন না ঘটে। তবে, সাংসারিক বিবাদ বিসংবাদে, যদি আপনি ত্যক্ত হইয়া থাকেন, তবে তাহার উচিত প্রতিবিধান করুন। আমা-দ্বারা যদি কোন প্রতিকার সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে আমায় আদেশ করুন, আমি প্রফুল্লচিত্তে আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হই। কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক্ হইয়া, সংসারে শান্তি সংস্থাপিত করিব, এরূপ ধারণা, এরূপ বিষময়ী কল্পনা, ভুলেও যেন আপনার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে না পারে। আর এক দিবসের কথা স্মরণ করে দেখুন দাদা! পিতার সেই সাংঘাতিক জ্বরের সূচনার সময়ে, যে দিন রাত্রিতে আপনি আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়া, কতকগুলি দলিলপত্র পাঠ করিতেছিলেন, আমি আসিয়া আপনার নিকট ঘোষে-দের ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক্ হওয়া সম্বন্ধে, কত কথা বলিতে লাগিলাম। তার পর, আমাদের মধ্যে কত কথাই চলিতে লাগিল। আমাদের মধ্যে কখনও ভ্রাতৃবিরোধ ঘটিবে না, একান্নবর্ত্তী পরিবার যে কিরূপ

শান্তির নিকেতন হইতে পারে, আমরা তাঁহার উদাহরণ দেখাইব, ইত্যাদি কত কথাই বলিয়াছিলেন। দাদা! দাদা! একবার সেই দিনের কথা স্মরণ ক'রে, বিবেচনা করে দেখুন যে, যে ঘোষেদের ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথগন্ন হইতে দেখিয়া, আমরা সেই দিবস তাহাদিগকে উপহাস করিয়াছিলাম—আজ আবার আমরাই পৃথগন্ন হইয়া, তাহাদের মত উপহাসাস্পদ হইতে যাইতেছি। দাদা! দাদা! আপনার ভ্রাতৃ-গতপ্রাণ সহোদরের দিকে চাহিয়া, আপনার স্নেহের সুবুর দিকে চাহিয়া—এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, দাদা! আমরা দুইজনে একসঙ্গে বাড়ী থাকিলে, আপনি আমাকে ফেলিয়া আহার করিতে পারিবেন কি? আমি উপোষ করিয়া থাকিলে—ক্ষুধিত অবস্থায়, আপনার স্নেহের সুবু আপনার সম্মুখে বসিয়া থাকিলে, আমাকে ফেলিয়া আপনার মুখে অন্ন উঠিবে কি? দাদা! আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, আপনি যতদূর নির্ম্মম হইয়া থাকুন না কেন,—সংসার চক্রের অবিশ্রান্ত পেষণে, আপনার হৃদয় যতই কঠিন হইয়া থাকুক না কেন, আপনি তাহাতে নিশ্চয়ই অকৃতকার্য্য হইবেন। ভ্রাতৃস্নেহ, তাহার স্বাভাবিক প্রণোদনে আপনার মুখেরগ্রাস আমার মুখে তুলিয়া দিবে। যদি স্বভাবের মূলচ্ছেদন করিতেই না পারিলেন, তবে লতাপাতা কাটিয়া উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হ্রাস করিয়া ফল কি? উহাতে আপনারই নয়নপীড়া উপস্থিত হইবে। তাই বল্‌ছি দাদা! এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন।

অধিক কি লিখিব। আমি এ সময়ে বাড়ী যাইতাম, কিন্তু পড়ার ক্ষতি হইবে বিবেচনা করিয়া, সম্প্রতি ক্ষান্ত রহিলাম। কিন্তু আজ হইতে পঞ্চম দিবসের মধ্যে, যদি আশানুরূপ উত্তর না পাই, তবে পুস্তকাদি সব ভস্মসাৎ করিয়া, ত্বরায় বাড়ী রওনা হইব। আমি

শারীরিক ভাল আছি। আগামীতে বাটীর সকলের মঙ্গল লিখিয়া, সেবকানন্দ করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি—

আপনার দাসানুদাস

সুবু

যথাসময়েই সুবোধচন্দ্রের পত্র বাটী পৌঁছিল। ঘটনাক্রমে রজনীকান্ত বাড়ীতেই ছিলেন সুতরাং পত্র পাইতে তাঁহার বিলম্ব ঘটিল না। রজনীকান্ত দুই তিন বার পত্রখানা পাঠ করিলেন। ভ্রাতৃস্নেহের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে তাঁহার মনপ্রাণ ভরিয়া গেল। কনিষ্ঠভ্রাতার জন্য, তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল। লোচন হইতে অলক্ষিতে অশ্রুজল বহির্গত হইয়া, চিঠিখানা আর্দ্র করিয়া ফেলিল। রজনীকান্ত নিতান্ত বিচলিতান্তঃকরণে গৃহাভিমুখে চলিলেন। যখন তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার মুখ আরক্ত—নয়ন জলভারাক্রান্ত। প্রভাবতী গৃহেই ছিলেন। রজনীকান্ত বলিলেন, 'আহা! পূর্ব্বে যেমনটি ছিল, আবার যদি তেমনটি হয়।'

প্রভাবতী। কি হয় ?—কি বল্‌ছ ?

রজনী। এই পূর্ব্বে যেরূপ সকলে মিলে মিশে ছিলুম, আবার যদি সেইরূপ থাকা যায়।

রজনীকান্তের কথা শুনিয়া ও তাঁহার হাতে চিঠি দেখিয়া, প্রভাবতী অনায়াসেই সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, 'ড্যাক্‌রা, এখনো হম্বা ডাক ছাড় নি। তোমাকে সোজা না করা পর্য্যন্ত আমার মরণ হবে না।' কিন্তু মনোগতভাব গোপন রাখিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরপোর কথা মনে হলে, আমারও মিলে মিশে থাক্‌তে ইচ্ছা করে। আহা! ভগবান্‌ কি এমন দিন দিবেন ?'

এই বলিয়া প্রভাবতী একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

রজনীকান্ত ঘোর চিন্তিতের ন্যায় মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, 'সুবু তো বাড়ী আসুক—দেখা যাক্ কি হয়।' প্রভাবতী কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে একটু হাসিলেন মাত্র।

হায়! মূর্খ রজনীকান্ত! যে পবিত্র ভ্রাতৃস্নেহের ক্ষণিক স্ফুরণে, কনিষ্ঠভ্রাতার সহিত চিরসম্মিলন, তুমি আজ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছ,—যাহার ক্ষণিকবিচ্ছেদও আজ তোমার নিকট নিতান্ত অসহনীয় বলিয়া মনে হইতেছে, তোমার সেই স্নেহ, সেই হৃদয়ের উপর, যে মোহময় গাঢ় যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা কখনও অনুভব করিতে পারিয়াছ কি? ভ্রাতায় ভ্রাতায়—হৃদয়ে হৃদয়ের সুখসম্মিলন-মন্দির হইতে, ছলনায় ক্রমে পথ ভুলাইয়া, কি এক অজ্ঞাত অলক্ষিত শক্তি, কি প্রকারে যে তোমাকে দূর হইতে দূরান্তরে লইয়া যাইয়া, তোমার স্নেহের বাঁধন—প্রেমের বন্ধন, শিথিল করিতেছে—তোমার হৃদয়কে ক্রমে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করিতেছে, তাহা বুঝিবারও কখনো অবকাশ পাইয়াছ কি? অথবা বুঝিতে পারিলে, আজ জগতের অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইত। পৃথিবী বুঝি, প্রেমের মঙ্গলদুন্দুভিতে মুখরিত হইয়া উঠিত।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশন।

এদিকে, এক দিন দুই দিন করিয়া, ক্রমে এক সপ্তাহ কাল অতীত হইয়া গেল। সুবোধচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোন পত্র পাইলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি ত্বরায় বাটী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

টুং টুং টুং করিয়া ষ্টেশনের ঘড়িতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। সিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশন এখন লোকে লোকারণ্য। গাড়ী ছাড়িবার মাত্র অর্দ্ধ ঘণ্টা বাকী। যাত্রীগণ টিকিট ক্রয় করিয়া, কেহ গাড়ীতে উঠিয়াছেন, কেহ উঠিতেছেন, কেহ বা পথ পাইবার আশায়, রেলওয়ে পুলিশের করুণাভিক্ষা করিতেছেন। ষ্টেশনের বাবুদিগের (অর্থাৎ সাধারণ পুলিশের উচ্চতর কর্ম্মচারী দিগের) বড় একটা মেজাজ পাওয়া যাইতেছে না। কোন যাত্রী কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা অমনি মিঠে করা রকমে, দু'চারি কথা শুনাইয়া দিতেছেন। কণ্ঠে বা কলারে মার্কাওয়ালা লণ্ঠনধারী বাবুরা, যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাহারা থাকিয়া থাকিয়া, লণ্ঠনের আলোক এক এক

বার এক এক যাত্রীর মুখের উপর নিক্ষেপ করিতেছেন, আবার হতাশ-মনে তথা হইতে সরাইয়া লইতেছেন। বুঝি, সুন্দরমুখ অনুসন্ধান করাই, বাবুদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বাবুদের দুর্ভাগ্য ক্রমে, সুন্দরমুখ প্রায়ই জুটিয়া উঠিতেছে না। বাবুরা যতবারই লণ্ঠনের আলোক নিক্ষেপ করিতেছেন, ততবারই লম্বা-লম্বা-শ্মশ্রু-ধারী মহীশুর দেশীয় মুসলমান বা কাবুলবাসীদের মোহনমূর্ত্তির ন্যায় দিব্যমূর্ত্তি বাবুদের নয়নরঞ্জন করিতেছে। গার্ড মহামহোপাধ্যায় খাস বিলাতি নহেন। তিনি ফিরিঙ্গি বা আরমানী জাতীয়। তাই তিনি বাঙ্গালী বাবুদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুচতুর। তিনি কোন বাবুর সহিত কথোপ-কথনচ্ছলে, মহিলাদের গাড়ীর অতি নিকটবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া-ছেন এবং মাঝে মাঝে আপনার শিরসিবিমণ্ডিত ক্ষুদ্রতরণীখণ্ডের নিম্ন দিয়া, নিবিড়পল্লবাচ্ছাদিত বসন্তসখার ন্যায় উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। গাড়ী ছাড়িবার অল্প বাকী। সাহেবের তবু ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় বাষ্পীয় শকট হইতে একবার বংশীধ্বনি হইল। সাহেবের মোহ ভাঙ্গিল। ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন সময় হইয়াছে, মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। সাহেব 'হটা দেও হটা দেও' বলিয়া দু'বার যাত্রীদের হৃৎপিণ্ড কাঁপাইয়া দিলেন। রেলওয়ে পুলিশেরা প্লাটফরমের কিনারা হইতে লোকদিগকে সরাইতে লাগিল। এমন সময় দ্রুতবেগে একখানা ঘোড়গাড়ী আসিয়া শিয়ালদহ ষ্টেসনে পৌঁছিল। সুবোধচন্দ্র তাড়া-তাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া, যেই টিকিট করিতে যাইবেন অমনি এক-জন রেলওয়ে পুলিশ আসিয়া হঠাৎ তাঁহার গতিরোধ করিল। এদিকে গাড়ী প্রায় ছাড়ে ছাড়ে হইয়াছে। এদিকে এই বিপদ। সুবোধচন্দ্র কোন গোলযোগ না করিয়া, ব্যাগ হইতে একখানা সিকি বাহির করিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। অমনি সে জল হইয়া গেল।

কোম্পানীর চাকর আর টুঁ শব্দটি না করিয়া আহ্লাদে পথ ছাড়িয়া দিল।

টিকিট ক্রয় করিয়া সুবোধচন্দ্র দৌড়িয়া গাড়ীর নিকট গেলেন। সেখানেও ব্যাপার বড় সহজ নহে। তিনি যেই গাড়ীতে উঠিতে যান, সেই গাড়ী হইতেই একজন আরোহী দরজার নিকট দাঁড়াইয়া 'জায়গা নাই, জায়গা নাই' বলিয়া তাঁহার গতিরোধ করে। সুবোধচন্দ্র চারি পাঁচ খানা গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই বিফলমনোরথ হইলেন। অগত্যা তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই, সেই বসন্ত-সখা গার্ড সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। সুকণ্ঠের মহিমা অপার। গার্ডসাহেব বীণাবিনিন্দিতস্বরে যেই জায়গা দিতে বলিলেন, অমনি বিলাসী বাঙ্গালী একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। দু'একজন বাঙ্গালীর বুঝি সংজ্ঞা রহিত হইবারও উপক্রম হইল। পাঠকবর্গেরমধ্যে কেহ এরূপভাবে পরিতৃপ্ত হইতে ইচ্ছুক কিনা, আমরা তাহা জানিতে চাহি না। স্থূল কথা, সুবোধচন্দ্রের কপাল ফিরিল। তিনি গাড়ীতে স্থান পাইলেন।

ঠুং ঠুং ঠুং। আবার ঘণ্টা বাজিল। গার্ডসাহেব লণ্ঠন নাড়িয়া সঙ্কেত করিলেন। লৌহযান ধূমপটল উদ্গিরণ করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে ছুটিয়া চলিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

উপায় নির্দ্ধারণ।

বীজ রোপিলাম। অঙ্কুর হইল। আবার রোপি না কেন? আশা করিলাম। সুফল ফলিল। আবার আশা করিব না কেন? বস্তুতঃ কারণ থাকিলে আশা করিতে দোষ কি?

গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতা উভয়েই পুনরায় আশা করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, যে সুবোধচন্দ্র বাটী আসিলে, অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার ভয়েও প্রভাবতী তাহাদিগকে দিবানিশি বাক্যবাণে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না। হয়তো পারিবারিক বিবাদ বিসংবাদও মিটিয়া যাইবে। অদ্য দুই দিবস হইল সুবোধচন্দ্র বাটী আসিয়াছেন। প্রভাবতীর কতদূর চক্ষুলজ্জা হইল, বলিতে পারি না কিন্তু এই দুই দিবস তিনি নীরবে কাটাইলেন। সুতরাং গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার মনে, নূতন আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। তাঁহারা এই বার, সংসারে চিরশান্তির প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। সুবোধচন্দ্র

বাটী আসিলে, গিরিজাসুন্দরী তাঁহার নিকট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রভাবতীর আচরণ সম্বন্ধে, আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই জ্ঞাপন করিলেন। গিরিজা-সুন্দরী জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূকেই সমস্ত অনর্থের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন! কিন্তু ইহার পর সুবোধচন্দ্র পাড়ার গিন্নিদিগের নিকট যেরূপ শুনিতে পাইলেন, তাহাতে তিনি ভগিনীর কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাহারা নানারূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার অপরাধ, নানা প্রকারে সুবোধ-চন্দ্রকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রাচীনা রাঙাদিদি দন্ত বাহির করিয়া, যে হেতু গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতা অপরাধিনী না হইলে, কোন কথার প্রতিবাদ করিবে না কেন? যেহেতু তাঁহারা কাহারও নিকট আপনাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করে নাই,—যেহেতু প্রভাবতীর সমস্ত অভিযোগেই, তাঁহারা মৌন দ্বারা সম্মতি প্রদান করিয়াছে, ইত্যাদি সদর্থসমন্বিত জ্ঞানগর্ভ যুক্তিদ্বারা একেবারে রায় বহাল করিয়া ফেলিলেন। সুবোধচন্দ্রের পূর্ব্বাপরই ধারণা ছিল, যে কলহ কখনও একের দোষে হইতে পারে না। রাঙাদিদির যুক্তি যদিও তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করিলেন না, তথাপি তাঁহার পূর্ব্বধারণা অনেকটা বদ্ধমূল হইল। গত বিষয় আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া, তিনি ভগিনীর নিকট নিজ মনোগতভাব কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কি হইলে সংসারে পুনরায় সদ্ভাব সংস্থাপিত হইতে পারে, সুবোধচন্দ্র দিবা রাত্রি তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। রজনীকান্ত তাঁহার বাটী পৌঁহুছিবার পূর্ব্বেই অন্যত্র গমন করিয়া ছিলেন—এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হন নাই। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা না আসিলে সুবোধচন্দ্রের মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুবোধচন্দ্র বাটী আসিলে প্রভাবতীর নিরতিশয় আশঙ্কা

জন্মিল। রজনীকান্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অত্যধিক স্নেহ করেন। কি জানি, যদি ভ্রাতৃ-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পুনরায় সকলকে একান্নভুক্ত করেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমাগত জয়লাভ করিয়া, যদি অল্পের জন্য মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়, তবে তাঁহার দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? কি উপায় অবলম্বন করিলে, উভয় ভ্রাতার চিরবিচ্ছেদ জন্মে, কি করিলে রজনীকান্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্নেহ করিতে ভুলিয়া যান, কি হইলে তাঁহাকে শত্রু জ্ঞান করেন, প্রভাবতী দিবানিশি তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এবং চিন্তা করিয়া অবশেষে এক সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করতঃ তদবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এবং তদুদ্দেশ্যে, পূর্ব্বকথিত রাঙা-দিদির সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন।

বেলা অপরাহ্ণ। প্রভাবতী নিবিষ্টমনে নিজ গৃহে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছেন। ভেকার মা বারাণ্ডায় বসিয়া একে একে তাম্বূলকুল ধ্বংস করিবার উপক্রম করিতেছে, এবং মুখ হইতে এক প্রকার অভিনব আল্‌তা পিচকারীর ন্যায় বেগে বাহির করিয়া, গৃহ-প্রাঙ্গণ রঞ্জিত করিয়া দিতেছে। কোন রসময়ী সুন্দরী যদি ভুলেও তথায় আগমন করিতেছেন, অমনি স্বীয় পদযুগল অলক্তরঞ্জিত দেখিয়া, মনে মনে ভেকার মার স্বর্গ কামনা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতেছেন। প্রভাবতী অনেকক্ষণ পর গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং আস্তে আস্তে যাইয়া ভেকার মার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তৎপর এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'দ্যাখ্ ভেকার মা! এর উপায় কি?'

ভেকার মা প্রায় প্রভাবতীর মুখের নিকট মুখ নিয়া, সেইরূপ মৃদু স্বরে বলিল, 'কিসের উপায়?'

প্রভা। আর কিসের? দেখ্‌তে পাচ্ছিস না, এদিকে যে আমার সর্ব্বনাশের উপক্রম হলো।

ভে-মা। ষাট্—ষাট্—তোমার শত্তুরের সর্ব্বনাশ হ'ক।

ভেকার মা একেবারে উচ্চরবে গর্জ্জিয়া উঠিল।

প্রভা। চুপ্—চুপ্—অত চেঁচাস্ নে।

ভে-মা। কেন চেঁচাব না? একশবার চেঁচাব। হাজার বার চেঁচাব। আমরা কোন্ বেটা বেটীর ধার্ ধারি।

প্রভা। ধার ধারবার কথা নয়। যা বলি, আগে চুপ্ করে শোন নৈলে সব মাটি হবে। আর তোকেও যে ইচ্ছামত দু'পয়সা দেব, তারও যো থাক্‌বে না।

ভে-মা। আচ্ছা বল, বউ ঠাক্‌রুণ, বলো, আমি চুপ্ কচ্ছি।

প্রভা। এই বল্‌ছি কি,—ছোট ড্যাক্‌রা তো বাড়ী এসেছে! আর এরা যে ধরাণের লোক, তা আর তুই কোন্ না জানিস্। যদি ভাইয়ে একবার বল্লে 'দাদা' অমনি জল হ'য়ে গেল। পোড়ারমুখোকে এত বলি, এত বুঝাই, তবুও যদি বুদ্ধি হলো। কেবল ভাই—ভাই—ভাই। আহা! ভাই যেন স্বর্গের সিঁড়ি গড়্‌ছেন, আর কি। দ্যাখ্, কি কর্‌লে মিন্‌ষেকে বাগে আন্‌তে পারি, বল্‌তে পারিস্।

ভে-মা। এ একদিনের কাজ কি বউ ঠাক্‌রুণ, এক দিনের কাজ কি! মন্তর জপ্‌তে জপ্‌তে তবে হয়। এই ঘোষেদের মেজবউ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, তবে স্বামীকে বশে এনেছে। এখন 'ওঠ্' বল্লে উঠ্‌ছে—'বস' বল্লে বস্‌ছে। সেও প্রথম ভাই ভাই ব'লে পাগল ছিল। এখন ভাইয়ের নামটি শুন্‌লে জ্বলে উঠে।

প্রভা। দ্যাখ্, এবার এম্‌নি ফিকির কর্ত্তে হবে, যেন ওদের মুখোমুখী পর্য্যন্ত না হয়। মুখোমুখী হলেই কিন্তু সর্ব্বনাশ কি বলিস্, পার্ব্ব না।

ভে-মা। বুদ্ধি থাক্‌লে কিনা হয়। বুদ্ধির চোটে, বাঘ ভাল্লুকে এক ঘাটে জল খায়—আবার মাগ্ ভাতারও পৃথক্ হয়। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—এতো সোজা কথা।

প্রভা। কাজ বাজাতে পাল্লে হয়।

ভে-মা। তা আর পার্ব্বে না!

প্রভা। পার্ব্ব বলে তো বোধ হচ্ছে। কিন্তু তোরও, বোন, একটা কাজ কর্ত্তে হবে।

ভে-মা। যা কর্ত্তে হয়, বলে দিও। তোমারটাই খাচ্ছি। তোমারটাই পড়্‌ছি। তোমার কাজ কর্ব্বো না!

প্রভা। আর বিলম্ব কর্ব্বার সময় নেই। আজ খবর পেয়েছি এরা কাল দু'পরের মধ্যেই বাড়ী পৌঁছুবে। আস্‌বার পূর্ব্বেই যা হয় একটা করা চাই। একে ক্ষুধার সময় আসবে, তাতে এসেই যদি গোলমাল শুন্‌তে পায়, তা হলেই কাজ হাসিল হলো। ওর যেরূপ স্বভাব, তাতে আপদ চুকে না যাওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাক্‌তে নাই। কি বলিস্?

ভে-মা। না না। তা থেকোনা ঠাকরুণ তা থেকোনা। লোকে কথায়ই বলে 'সাঙ্গ হলে আপন কাজ, তুষ্ট থাকেন ধর্ম্মরাজ'—যা হয় আজই একটা করে ফেল।

'আজ নয় কাল' বলিয়া প্রভাবতী ভেকার মার সহিত চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তৎশ্রবণে ভেকার মা বলিল, 'যদি শুন্‌তে না পায়?'

প্রভা। যাতে শুন্‌তে পায়, তাই করবি।

ভে-মা। তা যেন কর্ব্ব। তবু যদি দু'এক কথা বলেই চুপ করে।

প্রভা। সে ভাবনা তোকে ভাব্‌তে হবে না। তুই তো আরম্ভ করিস। তারপর দেখা যাবে।

ইহার পর দুই জনের মধ্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কত রসের হাসি চলিল। ভেকার মা কতবার প্রভাবতীর বুদ্ধির প্রশংসা করিল। প্রভাবতীও কতবার তাহাকে চালাক মেয়ে বলিয়া উৎসাহিত করিলেন। এই প্রকারে রাত্রি দেড়প্রহর অতিবাহিত হইল। তৎপর প্রভাবতী শয়ন করিলেন। কিন্তু দুশ্চিন্তায় নিদ্রা আসিল না। ভেকার মার উপর করুণা বিতরণ করিতে নিদ্রাদেবী কোন দিনই কৃপণতা করেন নাই। আজও করিলেন না। সে যেই শয়ন করিল, অমনি নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল। গৃহপ্রাঙ্গণে একটি কুকুর ছিল, সে খেউ খেউ শব্দে ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সধবাভোজন ও কুমারীপূজা।

সময়,—প্রত্যূষ। বেলা ঝিকিমিকি। বালারুণ বৃক্ষান্তরাল দিয়া স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। গ্রামবাসীরা সকলে জাগরিত হন নাই। কেহ কেহ অৰ্দ্ধ নিদ্রিত, অৰ্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায়, এখনও শয্যাসুখ অনুভব করিতেছেন। এমন সময়, ঊষার আলোকচ্ছটা বৃদ্ধি করিতে করিতে, পূৰ্ব্ব অধ্যায়ের রাঙাদিদি প্রভাবতীর গৃহপ্রাঙ্গণে দর্শন দিলেন। আজ রাঙাদিদি প্রভাবতীর গৃহে মাধ্যাহ্নিক আহার সম্পন্ন করিবেন। আজ বিরাট ব্যাপার—মহাহুলস্থূল কাণ্ড।

পূৰ্ব্ব দিবস, প্রভাবতী রাঙাদিদিকে এক সঙ্গে সধবাভোজনের নিমন্ত্রণ ও কুমারীপূজার কন্যা মনোনীত করিয়া আসিয়াছিলেন এবং অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি সকাল সকাল শুভাগমন করিয়া, স্বেচ্ছামত ভোজনের আয়োজন করিতে আদেশ করিলে তিনি পরম

আপ্যায়িত হইবেন। রাঙাদিদি ইহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই এবং প্রভাবতীর প্রস্তাবের গুরুত্ব প্রমাণ করিতে ইহাও বলিয়াছিলেন, যে সধবাভোজনের কোন অংশে ত্রুটি হইলে প্রভাবতীরই অমঙ্গলের সম্ভাবনা। অন্য কোথাও রাঙাদিদির এইরূপ সধবাভোজন ও কুমারীপূজার নিমন্ত্রণ হইত কিনা, আমরা তাহা অবগত নহি; কিন্তু প্রভাবতী প্রয়োজনমত রাঙাদিদিকে সধবা-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিতেন এবং একখানি নূতন বস্ত্র ও একটী টাকা দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তুষ্টিবর্দ্ধন করিতেন। যাহারা রাঙাদিদিকে না ডাকিত, বা নিমন্ত্রণ না করিত, রাঙাদিদি প্রায়ই বলিতেন—আমি উহাদের বাড়ীতে জল গ্রহণ করি না। কেনই বা করিবেন? কারণ রাঙাদিদি—কুমারী, রাঙাদিদি—সধবা, রাঙাদিদি খাঁটী কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে। রাঙাদিদি কুমারী,—কারণ বিবাহ রাত্রিতেই রাঙাদিদির বর কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হন নাই। রাঙাদিদি সধবা কারণ রাঙাদিদি স্বচক্ষে পূর্ব্বোক্ত স্বামীর মৃতদেহ দেখিতে পান নাই। সুতরাং মৃত্যু-সংবাদ অবগত নহেন। রাঙাদিদির বয়ঃক্রম ষাইট অতিক্রম করিয়া সত্তুরে পড়ো পড়ো হইয়াছে। রাঙাদিদি সুরূপা কি কুরূপা, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কারণ তাঁহার রূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। গ্রামের লোকেরা তাহাকে সুন্দরী বলিয়াই স্বীকার করেন। অন্য গ্রামের লোকদিগের মত অন্যরূপ। বালকেরা কিন্তু তাহাকে প্রায়ই 'তাড়কা' ছাড়া সম্বোধন করে না। কিন্তু রাঙাদিদি সম্মার্জ্জনী হস্তে ঘোষণা করেন, যে বালকেরা সব উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়াছে, অথবা দারুণ যক্ষ্মারোগে শীঘ্রই তাহাদের মৃত্যু হইবে। সুতরাং গ্রন্থকারও রাঙাদিদির রূপ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন।

সেনবাড়ীর কিঞ্চিৎ ব্যবধানে মুখুয্যেদের ছাড়া ভিটায় রাঙাদিদির হাল আবাস স্থল। বাড়ীতে মাত্র একখানা ক্ষুদ্র গৃহ। তাহারই এক পার্শ্বে রাঙাদিদি রন্ধন করেন, অপর পার্শ্বে শয়ন করেন। পূর্ব্বে মুখুয্যেরা বংশানুক্রমে এই বাড়ীতে বাস করিতেন। রাঙাদিদির সৌভাগ্যক্রমে, এই বাড়ীতে তাহাদের বংশনাশ হয়। তৎপর বংশ-লোপভয়ে আর কেহই এই বাড়ীতে বাস করিতে অগ্রসর হন নাই। রাঙাদিদি সাহস করিয়াই অদ্য বিশ বৎসর যাবৎ এই বাড়ীতে বাস করিতেছেন। তাহার বংশলোপ হইবার সম্ভাবনা কম। কারণ তিনি সমস্ত সংসারে একাকিনী।

আর একটা কথা বলিলেই রাঙাদিদির গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়। রাঙাদিদি মৎস্য ধরিতে বিলক্ষণ নিপুণা ছিলেন। বিক্রমপুর বা তন্নিকটস্থ পল্লীতে এমন কোন খাল ডোবা ছিল না, যাহাতে রাঙাদিদি মৎস্য শিকারে গতায়াত না করিতেন। কোন মৎস্য শ্বাস ছাড়িলে বা বুদ্ বুদ্ তুলিলে, রাঙাদিদি অনায়াসেই বলিতে পারিতেন, এ কোন জাতীয় মৎস্য। জলাশয়ের মধ্যে কোন গাছটি নড়িতে দেখিলেই রাঙাদিদির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত। এবং অনেকে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে রাঙাদিদি কতবার জলে পড়িয়া দশবার হাত জলের তল হইতেও বড় বড় কচ্ছপ ধরিয়া পারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রাঙাদিদি সধবা। সুতরাং তিনি মৎস্য মাংস ছাড়া কোন দিনই আহার করিতেন না। বয়সাধিক্য বশতঃ যদিও উদরাময় শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, তথাপি মৎস্য দেখিলেই তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিত। এবং পারিলে তিনি বকধার্ম্মিকের ন্যায় মৎস্য-কুলের সর্ব্বনাশ করিতে ত্রুটি করিতেন না।

আমরা সাধ্যমত রাঙাদিদির পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করি-

লাম। ইহা ছাড়া আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে কাহারও যদি রাঙাদিদিকে চাক্ষুষ দর্শন করিয়া, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া একবার বর্ষাকালে বিষ্ণুপুরের খাল দিয়া গমন করিলেই দেখিতে পাইবেন, যে রাঙাদিদি বা রাঙাদিদির প্রেতাত্মা, বৃক্ষে বসিয়া হয় বড়শীদ্বারা মৎস্য ধরিতেছেন, নতুবা খালের অপর পারে যাইবার জন্য উপস্থিত নৌকার মাঝি মাল্লার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাইয়াছেন।

রাঙাদিদি উপস্থিত হইয়াই প্রভাবতীকে এক মহাসিধার আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। কোন্ কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে দিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিতে লাগিলেন। শাক সবজী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষীর ননীর কিছুই বাদ পড়িল না। চাউল ডাইল তৈল নুন (অর্থাৎ যে যে দ্রব্য নষ্ট হইবার নহে) ইত্যাদির মাত্রা প্রভাবতীর নিকট অনেক বেশী বোধ হইল! কিন্তু রাঙাদিদিকে তুষ্ট করা আর অভীষ্ট বরপ্রদায়িনীকে তুষ্ট করা আজ প্রভাবতীর সমক্ষে একই কথা। সুতরাং তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে আদিষ্ট দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিলেন এবং রাঙাদিদিকে স্বহস্তে রন্ধন করিবার জন্য একখানি স্বতন্ত্রগৃহ পরিষ্কার করিয়া গোময়দ্বারা লেপিয়া দিলেন। রাঙাদিদি যে সিধা না পাইলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না, বা অন্যের হস্তে আহার করিতেন না, তাহা নহে। তবে যেই স্থলে সিধা পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না বা পৃথক্ বন্দোবস্তের অসুবিধা ঘটিত, সেই স্থলে তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াই কেবল অন্যের পাকে আহার করিতেন। প্রভাবতী ইচ্ছা করিলেই এরূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। তবে তিনি কেন যে এরূপ করিলেন, তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে কাহারও অবিদিত থাকিবে না।

দেখিতে দেখিতে বেলা এক প্রহর অতীত হইয়া গেল। অরুণদেব ক্রমে উচ্চ হইতে যতই উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিতে লাগিলেন, প্রভাবতীর উৎকণ্ঠা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রজনীকান্ত বাটী পৌঁছিবার বড় অধিক বিলম্ব নাই। এদিকে ভেকার মা, পূর্ব্ব রাত্রির পরামর্শানুযায়ী কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সুতরাং সমস্ত যজ্ঞ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রভাবতী মনে মনে ভেকার মাকে শত সহস্র ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভেকার মার কণ্ঠস্বর শুনা গেল। ভেকার মা, সুবোধচন্দ্রের গৃহসমক্ষে ঝাড়ু দিতে দিতে বলিয়া উঠিল, 'এ তোর কি রকম আক্কেল লা, ছোট বৌ! মানুষের গায়ে পড়ে পড়ে ঝগড়া কর্ত্তে আসিস্?'

প্রভাবতী উৎকর্ণ হইয়া নিঃশব্দে ভেকার মার দ্বিতীয় বাক্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

গিরিজাসুন্দরী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া গৃহমধ্যে কথোপকথন করিতেছিলেন। ভেকার মার উক্তি শুনিয়া তিনি হেমলতাকে বলিলেন, 'বৌ, এইখানে এস।'

হেমলতা স্নান করিবার জন্য পুকুরে গমন করিতেছিলেন। তিনি পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুবোধচন্দ্র ভেকারমার কথার কোন কারণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দিদি! ভেকার মা কি বল্‌ছে?'

ভেকার মা গিরিজাসুন্দরীকে উত্তর প্রদান করিবার অবকাশ দেওয়া বুঝি যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সে পুনরায় বলিয়া উঠিল, 'হাজার হ'ক, বামুনের মেয়েতো, হইলেই বা পেত্‌নী' এই বলিয়া ভেকার মা পুনরায় গৃহপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতে লাগিল।

প্রভাবতী এতক্ষণ বীণায় সুর সংযোজনা করিতেছিলেন। আর

বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া তিনি ভেকার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে লা, ভেকার মা! অত চেচাচ্ছিস্ কেন?'

ভে-মা। না ঠাকরুণ শুনে কাজ নাই। রাঙাদিদি শুন্‌তে পেলে, এখনি আগুন লাগ্‌বে।

রাঙাদিদি পূর্ব্বাপর সমস্তই শুনিতে পাইয়াছিলেন। ভেকার মার শেষ কথাটা তাহার কাণে বাজিল। অমনি খরগে সশিশুর ন্যায় গা ঝাড়া দিয়া তিনি কর্ণ খাড়া করিলেন। প্রভাবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি শুন্‌তে পাবে লা, রাঙাদিদি! কি বল্‌ছিস্?'

ভে-মা। আর কি বল্‌বো! বল্‌ছি এদের কথা।

প্রভা। কাদের কথা লা?

ভে-মা। আর কাদের হ'তে পারে? দিদি ঠাক্‌রুণ আর হেমলতার।'

প্রভা। কি কথা লা, তা কি শুন্‌তে নাই?

ভে-মা। থাক্‌বে না কেন? এরা সব আমাকে ঠাট্টা কর্চ্ছে আর জিজ্ঞেস কর্চ্ছে কি 'কিলা ভেকার মা! তোদের বড় বউ নাকি আজ কুমারী খাওয়াচ্ছেন? তা এই আশী বছরের মেছুনী পেত্‌নীই কি কুমারী হলো?' আমি বল্লুম 'যার যেমন ইচ্ছে।' তার পর রাঙাদিদির দাত উচো, রাঙাদিদিকে দেখ্‌লে ঘৃণা হয়, রাঙাদিদির গায়ের গন্ধে ভূত পলায়; কত কি ব'লে ভাল মানুষের মেয়েকে গাল দিতে লাগ্‌লো। আমি যেই বারণ কল্লুম, অমনি ছোট বাবু একেবারে গরম হ'য়ে উঠ্‌লেন। কাজ কি, ঠাক্‌রুণ, আমরা ছোট লোক, আমাদের বড় ঘরের কথায়।'

গিরিজাসুন্দরী কনিষ্ঠ ভ্রাতার মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলেন এবং তাঁহাকে কোন কথার জবাব দিতে নিষেধ করিলেন। প্রভাবতী

বলিলেন, 'চুপ্ কর্ বোন! চুপ্ কর্। রাঙাদিদি জান্‌তে পেলে, এখনি রাগ করে, চলে যাবেন।'

বস্তুতঃ যেই কথা সেই কাজ। প্রভাবতীর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই 'এই রইল তোর চা'ল, এই রইল তোর ডা'ল, আমি চল্লেম' বলিয়া রাঙাদিদি কতক চাউল ডাইল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন এবং রোষকষায়িতলোচনে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। প্রভাবতী দৌড়িয়া গিয়া রাঙাদিদির পদযুগল ধারণ করিলেন এবং 'দিদি! আমারই অপরাধ হইয়াছে, আমায়ই ক্ষমা কর' বলিয়া কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাঙাদিদি 'ছাড়্ ছাড়্' বলিয়া দু' চারিবার পা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। প্রভাবতী আজ কিছুতেই মঙ্গলারূপিণীর পা ছাড়িলেন না। রাঙাদিদি বর্ষণোন্মুখ জীমূতখণ্ডের ন্যায় ক্রোধভরে গর্জ্জিতে লাগিলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট কাল তর্জ্জন গর্জ্জনের পর বর্ষণ আরম্ভ হইল। সে বর্ষণের প্রকোপে গিরিজাসুন্দরী হেমলতা ও সুবোধচন্দ্রের গৃহে তিষ্ঠা ভার হইল। প্রতিবাসিনীরা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সেন বাড়ীর অভিমুখে ছুটিলেন। সকলে সমবেত হইলে, প্রভাবতী রাঙাদিদির পা ছাড়িয়া দিলেন। তৎপর কাঁদিতে কাঁদিতে কাহাকে 'বোন' কাহাকে 'মাসী' সম্বোধন করিয়া আগন্তুক প্রতিবাসিনীদিগকে বসাইতে লাগিলেন।

যখন প্রভাবতী উক্তরূপ অভ্যর্থনাকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত, তখন রজনীকান্ত বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। রজনীকান্ত ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। বাটীর মধ্যে গোলযোগ শুনিয়াই তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ হইল। তিনি শঙ্কিত মনে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখিতে

পাইলেন, যে বাড়ী পাড়ার স্ত্রীলোকে লোকারণ্য। প্রভাবতী ক্রন্দন করিতেছেন, আর রাঙাদিদির মুখনিঃসৃত ঢক্কারবে গৃহপ্রাঙ্গণ শব্দায়মান হইতেছে।

রজনীকান্ত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, উপস্থিত গিন্নিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা ইনি বলেন, উনি বলেন, করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এরূপস্থলে অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করিতে প্রভাবতীর ভরসা হইল না। কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, তিনি তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে একখানা ছোট জল-চৌকি আনিয়া বারাণ্ডায় রাখিলেন। তৎপর ভেকার মাকে সম্বোধন করিয়া দরজার অন্তরাল হইতে বলিলেন, 'ভেকার মা! একে এখন বস্‌তে বল্। আমার অদৃষ্টে যা ছিল, তা হ'য়ে গেল। ওকে ক্ষুধার সময় আর জ্বালাতন দিস্ নে।'

প্রভাবতী এরূপভাবে কথাগুলি বলিলেন, যে রজনীকান্ত ও উপস্থিত গিন্নিরা সকলেই তাহা শুনিতে পাইলেন। প্রভাবতী নিতান্ত লজ্জাশীলা। পূজনীয় কোন ব্যক্তি এমন কি প্রাচীনাদের সমক্ষেও তিনি স্বামীর সহিত কথা কহিতেন না। কথা কহিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, তিনি সর্ব্বদাই কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া কথা চালাইতেন। রজনীকান্তও সেইরূপ ভাবেই উত্তর প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন।

রজনীকান্ত উপবেশন করিলে, প্রভাবতী একখানা তালবৃন্ত গৃহ হইতে বারাণ্ডায় নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় ভেকারমাকে বলিলেন, 'একে, এখন ঠাণ্ডা হ'তে বল্। আর দ্যাখ্, বলে ক'য়ে যদি রাঙা-দিদিকে খাওয়াতে পারে।'

রজনী। সে কি! কিসের খাওয়া?

প্রভা। বল্, রাঙাদিদিকে আজ সধবাভোজনের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

রজনী। তা উনি খেতে চান্ না কেন?

রাঙাদিদি এতক্ষণ বর্ষাকালের গিরিতরঙ্গিণীর ন্যায় ক্রোধভরে স্ফীতা হইতেছিলেন। রজনীকান্তের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তিনি হুহুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, 'চাইনে কেন? চাইনে কেন? আমায় মেছুনী পেত্নী বলে গাল দেবে, আর আমি খাব!!'

রজনী। কে তোমায় গাল দিলে, রাঙাদিদি?

রাঙা। কে দিলে! ঐ হতচ্ছাড়ী গিরি সর্দ্দান্নী, আর হেমী, আর ঐ ন্যাজকাটা ছোঁড়া, সুবু।

রজনী। সুবু! সুবু বাড়ী আসলে কবে?

প্রভাবতী সে কথার উত্তর প্রদান করিলেন। বলিলেন, 'বল্, আজ চার পাঁচ দিন ধরে।'

রজনী। তা রাঙাদিদিকে গাল দিলে কেন?

প্রভাবতী পূর্ব্ববৎ ভেকারমাকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, 'ওকে বল্, সে বাড়ী আসা অবধি এ রকমই কচ্ছে। কিসে আমাকে অপমান কর্ব্বে, এই তার চেষ্টা। ভাগ্যি আজ বাড়ী এসেছিল, নইলে আজই কি একটা হ'য়ে যেতো। রোজই বলে জমীদারী ভোগটা দেখিয়ে দেবো। তা আমি তো কিছু বলিনি, আর আমি পৃথক্ও করিনি। আমাকে কেন?'

রজনীকান্ত একে পরিশ্রান্ত হইয়া বাটী আসিয়াছেন, তাহাকে অনাহার। এমন সময় কনিষ্ঠভ্রাতার এইরূপ অভদ্রোচিত অন্যায় আচরণের কথা তাঁহার কিছুতেই সহ্য হইল না। তিনি 'বটে' বলিয়া চুপ্

করিলেন। মস্তিষ্ক কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পর, 'কৈ সে পাজি ছোঁড়াটা বলিয়া ক্রোধভরে বারাণ্ডা হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নামোল্লেখ করিয়া ঘন ঘন আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

সুবোধচন্দ্র এ পর্য্যন্ত ভগিনীর নিকট বসিয়া নিস্তব্ধ ভাবে আদ্যোপান্ত সমস্তই শ্রবণ করিতেছিলেন। সুতরাং জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে প্রকৃত বিষয় জানিতে না পারিয়া, তাঁহার উপর অন্যায়রূপ কোপ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। পাছে প্রকৃত বিষয় বুঝিতে না পারিয়া রজনীকান্ত তাহাদিগকেই দোষী সাব্যস্ত করেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দাদা! আপনি রাগ কচ্ছেন কার উপর?'

রজনীকান্ত 'দূর হ' বলিয়া কনিষ্ঠভ্রাতাকে ভৎর্সনা করিলেন।

সুবোধচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, 'আপনি যা শুন্‌তে পেয়েছেন, সে সব মিছে কথা। রাঙাদিদিকে বা আর কাহাকে, কোন কথাই বলা হয় নাই।'

সেই সময় ভেকার মা বলিয়া উঠিল, 'ওমা! আমি কোথায় যাব গো! এ যে দেখ্‌চি, আমার ঘাড়েই দোষ পড়লো।'

সুবোধচন্দ্র ভেকার মাকে বলিলেন, 'ভেকার মা! তুমি যে সমস্ত কথা বলে, এত গোল বাঁধালে, তা তুমি নিজে শুন্‌তে পেয়েছ?'

ভে-মা। সে কি কথা, ছোট বাবু! তুমি কেমন ক'রে বল্লে, যে কেহ কিছু বলে নি। আর তোমরা তো ছোট খাট ক'রে কওনি, আমি কেন, বোধ হয় রাঙাদিদিও শুন্‌তে পেয়েছেন।

রাঙাদিদির জ্বলন্তপাবকে পুনরায় ঘৃতাহুতি পড়িল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হাঁ

বলেছে বই কি? আমি নিজে শুনেছি। (তারপর) প্যাঁচামুখো—খাদানাকি—বিড়ালচকি—ইত্যাদি ইত্যাদি।'

রজনীকান্ত কনিষ্ঠভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'শুন্‌লি-শুন্‌লি রে পাজি!'

সুবো। এরা সব পরামর্শ করে ওরূপ কচ্ছে।

রজনী। ফের মিছে কথা বলছিস্?

সুবো। আমি বল্‌ছি, না আপনি অন্যায় —

'কি! যতবড় মুখ, ততবড় কথা!! রসো, জুতো দিয়ে দাঁত ভেঙ্গে দিচ্ছি' বলিয়া রজনীকান্ত এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে লাগিলেন। সুবোধচন্দ্র গতিক মন্দ বুঝিয়া আর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি ক্ষুণ্ণমনে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সুবোধচন্দ্র প্রস্থান করিলে রজনীকান্ত মৌনাবলম্বন করিলেন এবং ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া, রাঙাদিদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাঙাদিদি! যাও, তুমি খাওগে। এরা তো তোমায় কিছু বলে নি। তা শত্রুদের কথায় কাণ দিও না।'

রজনীকান্তের নিকট ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ ও ভগিনী, এই প্রথম বার শত্রু সাব্যস্ত হইলেন।

রাঙাদিদি ভোজন করিতে প্রথমে একেবারেই অস্বীকার করিলেন। অবশেষে রজনীকান্ত ও প্র তবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের বিস্তর অনুরোধে এবং প্রভাবতীর করুণ ক্রন্দনে অগত্যা স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু প্রকাশ করিলেন যে, তিনি আর কখনও প্রভাবতীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না। প্রভাবতী এ কথায় কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। সুতরাং রাঙাদিদির জেদ্ বজায় রহিল। তাহার ভোজন করিতে আর কোন আপত্তি রহিল না।

এতশীঘ্র গোল মিটিয়া যাওয়ায় এবং বিশেষ কোনরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা হইল না দেখিয়া, প্রতিবাসিনীরা বিমর্ষমুখে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতির অপরাধ সম্বন্ধে, যদিও রজনীকান্তের কোন সন্দেহ ছিল না, তথাপি তিনি উপস্থিত গিন্নি-দিগকে সম্বোধন করিয়া একবার বলিলেন, 'আপনারা সকলে দেখ্‌লেন তো ? আমি ওদের জন্য এত কর্চ্ছি। এ বেচারী (অর্থাৎ তাঁহার স্ত্রী) এত খেটে খেটে মর্চ্ছে। আর ওদের এই ব্যবহার!'

গিন্নিরা শুনিয়া একে একে প্রস্থান করিলেন।

তার পর রাঙাদিদি ভোজন করিলেন, কুমারীপূজা সমাধা হইল,—প্রভাবতী অভীষ্ট বর লাভ করিলেন ;—ভেকার মা, প্রভাবতীর চক্ষে চক্ষু মিলাইয়া একবার মৃদু হাসি হাসিল। তার পর ?

তার পর—

প্রভাবতী চোক রাঙালো,
ভেকার মা জিব কাটিল,
আমরা উপস্থিত খণ্ড শেষ করিলাম।

—— ০ঃ০ঃ০ ——

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভেকারাম তথা লায়েক বউ।

'এই পোড়ারমুখো কবিগুলোর মরণ হয় না গা?'

তখন বেলা অপরাহ্ণ অতীত হইয়াছে। ভেকার মা উক্তরূপে কবিকুলের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে, হন্ হন্ করিয়া যাইয়া প্রভাবতীর গৃহ-সম্মুখে উপস্থিত হইল।

প্রভাবতী গৃহে বসিয়া মনে মনে লঙ্কা বিভাগ করিতেছিলেন। ভেকার মার উচ্চরব শুনিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। তৎপর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিলা ভেকার মা! কি বল্‌ছিস্?'

ভেকারমা পুনরায় বলিল, 'হেঁ গো, বউ ঠাক্‌রুণ, এই চক্‌খেকো যম এত লোককে নেয়, এই পোড়ারমুখো কবিগুলাকে দেখ্‌তে পায় না গা?'

প্রভাবতী ভেকার মার কথার কোন তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'কি হয়েছে, খুলেই বল্‌না ছাই।'

ভে-মা। কি আর বল্‌বো মাথামুণ্ড। এই তুমি আমার ভেকার বিয়ের টাকা দিবে ব'লে যে কড়ার করেছ, সেই কথা আমার নিকট

শুন্‌তে পেয়ে, মা'নক আমার, একখানা বই কিনে, এই কয় মাস হলো পড়্‌তে আরম্ভ করেছে। তার মধ্যে যত সব বিশ্রী কথা লেখা গো। আর সে সব লিখ্‌বার এম্‌নি ঢঙ্‌, বল্লে তুমি বিশ্বাস কর্ব্বে না, যে তা শুন্‌লে, আমারই মনটা গরমে উঠে। বুকটা যেন ধড়ফড় ধড়ফড় কর্ত্তে থাকে। তা ও জোয়ান বেটা, উঠন্ত বয়স, ওর তো হতেই পারে।

এই বলিয়া ভেকার মা খিল্‌ খিল্‌ করিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিল। তৎপর হাসির বেগ একটু সাম্‌লাইয়া পুনরায় বলিল,

'আর এমন সৃষ্টি ছাড়া কথা কে কবে শুনেছে ঠাক্‌রুণ, ভ্রমর গুণ্‌ গুণ্‌ করে, কোকিল কুহু কুহু-কুহু-কুহু করে, নদীর জল, কুলু কুলু কুলু কুলু করে, ওদের মাথা করে, মুণ্ডু করে। বেহায়া বেল্লিক বেটারা, খেয়ে দেয়ে তো আর কাজ নেই, কেবল মানুষের পিছনে লেগে আছেন।'

ভেকার মার কথিত ব্যাপারে প্রকৃত কবিকুলের কোন অপরাধ ছিল কিনা বলিতে পারি না কিন্তু পুস্তকপঠনকার্য্যই যে পুত্রের ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ তাহা ভেকার মা, বিশেষ রূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। ভেকারাম যখন পুস্তক খানা সুর করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, তখন ভেকার মার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া পুত্রের পুস্তক-পঠনকার্য্য বিবৃত করিয়া তাহার ভাবপরিবর্ত্তের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বাচস্পতি মহাশয় পুস্তকে ভূতের মন্ত্র আছে বলিয়া, গ্রহ শান্তি করাইবার ব্যবস্থা দিলেন। গাব্‌গাছে, নিম গাছে, ভুত থাকে বলিয়াই ভেকার মা জানিত। পুস্তকের মধ্যে ভূত কেমন করিয়া কোথায় লুকায়িত থাকে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বিশেষতঃ পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়ের গ্রহশান্তির ব্যবস্থায় তাহার মনে একটু সন্দেহও হইয়াছিল। সে যাইয়া তখন চপলকুমারীকে ধরিল। ভাল কথায়

কি প্রকারে ভাল ভাব, আর খারাপ কথায় কি প্রকারে খারাপ ভাবের উদ্রেক হয় এবং খারাপ ভাবের উদ্রেক হওয়া ও ভূতেধরা যে প্রায় একই কথা, তাহা চপলকুমারী ভেকার মাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং বটবৃক্ষের পরিবর্ত্তে বটতলাবাসী একদল কবিভূত কর্ত্তৃকই যে, ঐ সমস্ত পুস্তক প্রচারিত হয়, তাহাও তিনি কথায় কথায় তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভেকার মা চপলকুমারীর কথায় খুব বিশ্বাস করিত। প্রভাবতীর নিকট যাইয়া যে ভেকার মা কবিকুলের উদ্ধার কামনা করিতেছিল, তাহাও তাহার চপলকুমারীর বাক্যের উপর সেই গাঢ় প্রত্যয়ের ফল।

প্রভাবতী ভেকার মাকে বলিলেন, 'তা বইয়ে যা লিখা থাকুক, না, কবিদের দোষ দিচ্ছিস্ কেন?'

ভে-মা। ওই মিন্‌ষেরাই তো বই লিখে, আমার বাছাকে পাগল করেছে। দিন নাই, রাত্ নাই, বাছা আমার বিড় বিড় ক'রে কি বকে। না বৌ ঠাক্রুণ! তোমার কাজ হ'য়ে গেল। এখন আমার ভেকারামের বিয়ের জন্য যা দিবে বলেছিলে দেও।

প্রভা। অত ঘাবরাচ্ছিস্ কেন? যা দিব বলেছি, তা আর দিব না। তবে এখনো আপদ একেবারে চুকে যায় নি। আরো দু'চারি দিন সবুর কর।

ভে-মা। সেকি বউ ঠাক্রুণ্! এই বলেছিলে যে পৃথক্ হলেই ভেকারামের বিয়ের টাকা দিবে, এখন আবার অন্যরূপ বল্‌ছ। না গো, আমি আর সবুর টবুর কর্ত্তে পার্ব্ব না। বাছা আমার ভাব্‌তে ভাব্‌তে যে রকম হ'য়ে গেছে, তাতে তাকে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়ে না করা'লে যাদু আমার না জানি কোন দিন বিরাগী হ'য়ে চলে যাবে।

প্রভা। তা দু'চার দিনেই তো ব'য়ে যাবে না। দু কুড়ি টাকা

দিব বলেছিলুম। তাতে তো আর কুলোবে না। তুই যদি আমার কথা মত চলিস্, তা হ'লে দু'কুড়ি কেন, না হয় আমিই বিয়েটা দেওয়ায়ে দিব।

এই কথার পর ভেকার মা একটু নরম হইয়া পড়িল। বলিল, 'তা—তা—আমি আর তোমার কথা মত চল্‌বো না, বউ ঠাক্‌রুণ—তা - তা'—

প্রভা। তবে আর একটু কাজ কর্ত্তে হবে।

ভে-মা। আবার কি কাজ বাকী রইল? ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক্ খাচ্ছে। ছোট ভাইযের নাম শুন্‌লে জ্বলে উঠে।

প্রভা। যা বল্‌ছিস্ তা বড় মিথ্যা নয়। তবে, এই সময় ঘরের জিনিস পত্রগুলি তাড়াতাড়ি একবার পৃথক্ ক'রে দিতে পাল্লে'ই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আর ঘরের মালামাল যা কিছু আছে, তাও সময় থাক্‌তে থাক্‌তে কিছু হাত কর্ত্তে হয়।

ভে-মা। তা নিজের মালামাল আবার হাত কর্ব্বে কিগো?

প্রভা। নেকি আর কি! বুঝ্‌তে পার্চ্ছিস না, এই ঘরে যে সমস্ত জিনিস পত্র আছে, এর সমস্তই তো এদের বাপের আমলের। উচিত মত ধর্ত্তে গেলে, ওরাও এর অর্দ্ধেক পেতে পারে। আমি কিন্তু ঠিক অর্দ্ধেক দিতে ইচ্ছা করি না। সরিককে ঠকাতে পাল্লে' কি ছাড়্‌তে হয়, বোন্। কি বলিস?

ভে-মা। না, না, তা ছেড় না ঠাক্‌রুণ, তা ছেড় না। কথাই আছে —'খুড়া মুরুব্বি হউক ভাই, সরিক ঠকাতে দোষ নাই।' তবে, পেরে উঠ্‌লে হয়। ওরা যে আজ কাল তোমাকে সহজে ছেড়ে দেবে, এমন তো বুদ্ধিতে কুলোয় না।

প্রভা। সে জন্য তোর ভাব্‌তে হবে না। আমি ওদের স্বভাব

বেশ জানি। দেখছিস্ না, এই কয় দিন ভাইবোনে দিনরাত্ কেবল কাঁদছে। তাই ভাবছি্ যদি জিনিস পত্রগুলো কতেক কতেক সরিয়ে রেখে, বাকীগুলোর অর্দ্ধেক্ পৃথক্ ক'রে দিতে পারি, তা হ'লে টের পেলেও কতেক মনের খেদে, কতেক চক্ষু লজ্জার ভয়ে,' মুখ ফুটে সে কথা বের কর্ত্তে পার্ব্বে না। আর জিনিস পত্রগুলি পৃথক্ ক'রে দিতে পার্লে, পুনরায় একত্র হওয়ারও কোন সম্ভাবনা থাকবে না। তবে কাজটা যত শীঘ্র ক'রে উঠা যায়, ততই ভাল। কারণ আজ কাল যতটা চক্ষুলজ্জা হবে, দু'দিন পর, আর ততটা থাক্‌বে না।

ভেকার মা কিয়ৎকাল প্রভাবতীর কথাগুলি চিন্তা করিল। তৎ-পর বলিল, 'তা হ'লে দেখ্‌ছি, দু'দিন পরে জিনিস পত্রের দাবী কর্লেও কেউ ওদের কথা বিশ্বাস কর্ব্বে না।'

তখন প্রভাবতী আদর করিয়া ভেকার মার গণ্ডস্থল টিপিয়া দিলেন। বলিলেন, 'এই দেখ দেখি, দিদিমণি আমার, এতক্ষণে তোমার বুদ্ধি হলো।'

ভে-মা। তা বউ ঠাক্‌রুণ, তোমার পেটে এত বুদ্ধিও আছে। ওদের সাধ্য কি যে তোমার সঙ্গে পেরে উঠে। তা, আমাকে কি কর্ত্তে হবে, ব'লে দেও।

প্রভা। আজ সন্ধ্যার পর আমি কতকগুলো ভাল ভাল কাপড়-লতা, তামাকাঁসা বারাণ্ডার এই জায়গায় একখানা চাচ ঢাকা দিয়ে রেখে দিব। তার পর একটু বেশী রাত্ হ'লে, সকলে যখন ঘুমুবে, তুই সেগুলো গোপনে তোর বাড়ী নিয়ে রেখে আস্‌বি। তার পর গোলমাল সব চুকে গেলে সময় মত আবার আনিয়ে নিব।

সেনবাড়ী হইতে ভেকার মার বাড়ী যাইতে রাস্তায় একটা বটবৃক্ষ ছিল। কানাই চৌকীদার বলিত, সে অনেকবার ঐ গাছে একটা

প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া ভূত দেখিয়াছে। ভেকার মা কানাই চৌকীদারের কথায় অবিশ্বাস করিত না। সুতরাং ঐ গাছ তলা দিয়া অন্ধকার রাত্রিতে যাতায়াত করিতে ভেকার মার কিছুতেই সাহস হইল না। বলিল, 'না বউ ঠাক্রুণ! আমায় আর যা কিছু কর্ত্তে বল, কর্ত্তে পার্ব্বো কিন্তু আঁধার রেতে ঐ ভুতুরে গাঁছতলা দিয়া আমি কিছুতেই যেতে পার্ব্বো না।'

প্রভাবতী ভেকার মাকে অনেক সাহস দিলেন। অনেক লোভ দেখাইলেন। ভেকার মা কিছুতেই স্বীকৃতা হইল না। অবশেষে সাত পাঁচ ভাবিয়া বলিলেন,'তবে তোর ভেকাকে দিয়েই এই কাজটা করা না। সে যদি এই কাজটুকু না করে, তা হ'লে আমিই বা তার বিয়ের জন্য এত ভেবে মরছি কেন?'

প্রভাবতীর কথা শুনিয়া ভেকার মা একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, 'কি বল্লে! বিয়ের টাকা দিবে না, না দিলে। আমার অমন্ বিয়ের কাজ নাই। বাছা আমার চিরকাল কার্ত্তিক হ'য়ে ঘরে থাক্, তাই ব'লে আমি বাছাকে ভূতের হাতে সঁপে দিতে পার্ব্ব না!'

প্রভাবতী দেখিলেন মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। সুতরাং তিনিও একটু সুর নামাইলেন। বলিলেন, 'অত চটিস্ কেন, বোন্। আমি আর তো না দেবার কথা কিছু বলিনি। ভাব্ছি এই কাজটা হ'য়ে গেলে, সাম্‌নে মাসেই ভেকারামের বিয়েটা দিয়ে দিব। দুটী পাত্রীরও সন্ধান নিয়েছি। তা এই কাজটুকু না কল্লে আর কি ক'রে চলে বল্ তো?'

ভেকার মাও কিছু নাময়া আসিল। বলিল, 'আমার কি আর অনিচ্ছা, বউ ঠাক্রুণ, কিন্তু অত রাত্রিতে ঐ ভুতুরে গাছতলটা দিয়ে পাঠা'তে বড্ড ভয় করে। সাধে কি অস্বীকার করি?'

প্রভা। তবে ঐ গাছতলাটা দিয়ে না গিয়ে, খানিকটা ঘুরে গেলেই তো হয়। জানিস্ তো বোন্, তোরা ছাড়া আমার এই কাজটা হবার আর উপায় নাই!

ভেকার মা বড়ই মুস্কিলে পড়িল। একদিকে ভেকারাম, একদিকে ভেকারামের শুভবিবাহ। ভেকারামকে অত রাত্রিতে ওরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে তাহার মন সহজে প্রবোধ মানিতে চাহিল না। অথচ, প্রভাবতী যে ভেকারামের জন্য দু'একটী পাত্রীর সন্ধান নিয়াছেন, সেই লোভও সংবরণ করিতে পারিল না। সে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'তা দেখিগে মানিককে একবার ব'লে ক'য়ে। যদি স্বীকার করে।'

প্রভাবতী এই কার্য্যের ভার ভেকার মার উপর দিতে যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। বলিলেন, 'তোর, বোন্, কোন কথা ব'লে কাজ নেই। তুই ভেকারামকে আমার কাছে গিয়ে পাঠিয়ে দে। যা বল্‌তে হয়, আমিই বল্‌বো। তারপর খানিকটা পরে আসিস্।'

ভেকার মা প্রভাবতীর কথামত কার্য্য করিতে স্বীকার করিয়া, অনতিবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

প্রভাবতী যে ভেকারামের বিবাহের টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা ভেকারাম পূর্ব্বেই জননীর নিকট শুনিতে পাইয়াছিল। সুতরাং প্রভাবতী ডাকিয়াছেন শুনিয়া, সে বিনাবাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ যাইয়া প্রভাবতীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রভাবতী ভেকারামকে মিষ্টি মিষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কি ভেকারাম এসেছ, তোমার মা তো, তোমার বিয়ের জন্য আমাকে বড়ই ধ'রে পড়েছে। আমিও স্বীকার করেছি। সাম্‌নে মাসেই তোমার বিয়েটা দিয়ে দিতে চাই। দু'টী পাত্রীও হাতে আছে। একটীর বয়স কিছু কম, তবে দেখ্‌তে বেশ

সুশ্রী। আর একটী তত সুশ্রী নয় বটে কিন্তু বেশ লায়েক। এখন বলতো কোনটীর সঙ্গে সম্বন্ধ সুস্থির করা যায়?'

লায়েক পাত্রীর কথা শুনিয়া ভেকারামের বক্ষঃস্থল একেবারে আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিল। ভাবিল, সে, সেই রাত্রিটা বাঁশী বাজাইয়া কাটাইয়া দিবে। বলিল, 'তা, মামী ঠাক্‌রুণ, তোমাদের নফরবৌ যদি একটু ডাগর ডুগর হয়, তো তোমাদেরই ভাল। এখন যে একটু কাজ কর্ম্ম কর, তাহ'লে তাও কর্ত্তে হবে না।'

ভেকারামের কথায় প্রভাবতীর অপাঙ্গে ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় সহসা একটী হাস্যরেখা দেখা দিল। কিন্তু সেই ভাব গোপন রাখিয়া তিনি বলিলেন, "তবে আর ভেবে চিন্তে কাজ নাই, বড়টীর সঙ্গেই সম্বন্ধ সুস্থির করা যাক্।'

ভেকারাম আর দ্বিরুক্তি করিল না। ক্ষণকাল পর সে বলিল, "মামী ঠাক্‌রুণ! তোমাদের গাছে অনেক গুলি সুপোরি পেকে ঝুনো হয়ে গ্যাছে। আমায় বলো, আমি পেড়ে দিয়ে যাব এখন।'

প্রভাবতীও আপনার কথা উত্থাপন করিবার অবসর খুজিতেছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন, 'তা আমার কাজ তোরাই তো কর্ব্বি। ওগুলো দুদিন গাছে থাক্‌লে তো আর পচে যাবে না। তার আগে যদি আর একটা কাজ করিস্ তো, বড্ড উপকার করা হয়।'

ভেকারাম আগ্রহ সহকারে বলিল, 'সে কি মামী ঠাক্‌রুণ! তোমার কাজ কর্ব্ব না? বল না কাজটা কি?'

তখন প্রভাবতী প্রস্তাবিত বিষয় ভেকারামকে আনুপূর্ব্বিক বুঝাইয়া দিলেন। তৎপর উপসংহারে বলিলেন, 'তোর মা তো ভূতের ভয়ে, ঐ গাছতলা দিয়ে যেতে চায় না। কাজেই তোমাকে এই কাজটা কর্ত্তেই হচ্ছে।'

ভূতের কথা শুনিয়া ভেকারাম, একেবারে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, 'ঐ গাছে ভূত আছে, কে দেখেছে? যাও যেমন হাবা। আমিই রাত্রিতে মুখোস প'রে, ঐ গাছে চ'রে ভূত ব'লে, লোককে ভয় দেখাতুম্। হাঃ হাঃ হাঃ, মজা বেশ।' অতঃপর হাসির বেগ একটু সামলাইয়া পুনরায় বলিল, 'মামী ঠাক্রুণ, তোমার আর ভাবতে হবে না। তুমি সব ঠিক্ ঠাক্ ক'রে রেখো, আমিই নিয়ে যাব এখন।'

তখন প্রভাবতী উপস্থিত কথা বন্ধ করিয়া, কথায় কথায় ভেকা-রামের নিকট পাত্রীটির কেমন মাজাবর্ণ কেমন চোরা চাউনি, কেমন বাঁশীর মত নাকটী, কেমন হাসিভরা মুখখানি, হাতে বেলোয়ারীর চুরি কেমন সুন্দর দেখায়, ইত্যাদি নানা কথাই বলিতে লাগিলেন। শুনিয়া শুনিয়া ভেকারাম একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান করিল। যাইবার সময় নিতান্ত করুণকণ্ঠে বলিল, মামী ঠাক্রুণ, দোহাই তোমার, নফরকে পায়ে রেখো।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রভাবতী রমণীরত্ন

সন্ধ্যাকাল। মিটি মিটি জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। রজনীকান্ত নিজ শয়ন ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া অনন্যমনে কত কি চিন্তা করিতেছেন; এমন সময় সুবোধচন্দ্র আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্ব খণ্ডের শেষ ঘটনার পর, সাতদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে. এই সময় মধ্যে সুবোধচন্দ্র জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট কোন বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে হঠাৎ আসিয়া রজনী-কান্তের নিকট উপবেশন করিতে দেখিয়া, প্রভাবতীর নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং কি কথাবার্ত্তা হয়, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য নিঃশব্দে দরজার নিকট উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। সুবোধচন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বলিলেন, 'তা হ'লে সাংসারিক এই গোলযোগটা মিটিয়ে দিলে ভাল হয় না?'

পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট কোন কথা বলিয়া তাঁহার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদিত করিতে হইলে সুবোধচন্দ্র, 'আপনাকে ইহা করিতেই হইবে—না করিলে ছাড়িব না' ইত্যাদি প্রকারে আবদার অভিমান করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতেন। কিন্তু আজ সেরূপ কোন কথা সুবোধচন্দ্রের মুখ দিয়া বহির্গত হইল না। কোন কথা বলিতে তাঁহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। বস্তুতঃ মনুষ্য চরিত্রের এই গতি। যেখানে ভালবাসা আছে, সেইখানেই অভিমান আছে। আমি তোমার উপর অভিমান করি, তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়া। কিন্তু ভালবাসা ফুরাইলে, সেই অভিমানটুকু দৃষ্ট হইয়া থাকে কি ?

রজনীকান্ত কনিষ্ঠভ্রাতার কথার কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। কিন্তু প্রভাবতী তাহাতে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, যখন কথা উত্থাপিত হইয়াছে, তখন তাঁহার চক্ষুকর্ণের সম্মুখে মীমাংসিত হইয়া যাওয়াই; তাঁহার পক্ষে উপস্থিত ক্ষেত্রে অধিক নিরাপদজনক। এইরূপ মনে করিয়া, তিনি দরজার অন্তরাল হইতে মুখ বহির্গত করিয়া স্বামীকে বলিলেন, 'কি গো! চুপ্ ক'রে রইলে যে? ঠাকুরপো কি বল্‌ছে শুন্‌তে পাও না?'

পূর্ব্বখণ্ডের শেষ ঘটনা হইতে রজনীকান্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছিলেন, এবং তিনিই যে সমস্ত পারিবারিক কলহোৎপাদন ও প্রভাবতীকে অপমানিতা করিবার মূল প্ররোচক, তাহা এই কয়দিনে প্রভাবতী স্বামীকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং পত্নীর কথা শুনিয়া, তিনি নিতান্ত বিরক্তির সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কি, কি বলছ?'

সুবো। আপনি ত্যক্ত বোধ না ক'রে, যদি স্থির হ'য়ে শুনেন, তা হ'লেই আমি বল্‌তে পারি।

রজনী। যা বল্‌বে ব'লে ফেল না। অত ভূমিকায় প্রয়োজন কি?

সুবো। আমি বল্‌ছিলাম কি, পারিবারিক এই বিবাদ বিসংবাদটা মিটিয়ে দিয়ে সংসারে পুনরায় সদ্ভাব সংস্থাপন করা যায় না কি?

রজনী। কেন, একে তোমাদের আরো লাঞ্ছনা দিবার ইচ্ছা আছে নাকি?

সুবো। আপনি কি বল্‌ছেন, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

রজনী। আমি বাড়ী হ'তে এক পা বেরুলেই, যখন সকলে মিলে একজনার গলাটিপে ধরা হয়, তখন আর বুঝ্‌বে কেন?

সুবো। আপনার কথার ভাবে বোঝা যাচ্ছে, যেন আমাদের চক্রান্তেই এসব ঘটনা হচ্ছে। আপনার কি তাতে বিশ্বাস হয়?

রজনী। আমার বিশ্বাস দিয়ে তুমি কর্ব্বে কি? দেশশুদ্ধ লোক কে না জানে?

সুবো। লোকের কথা ছেড়ে দিন্‌। তারা সব তামাসগীর বই তো নয়? আর কোন বিষয় তাদের তলিয়ে দেখ্‌বারই বা প্রয়োজন কি?

রজনী। হাঁ! তারা সব তামাসগীর। সকলে যা চাক্ষুষ দেখ্‌ছে, তাও সব মিথ্যা? কেবল তোমরা যা বল্‌ছ, তাই ঠিক। কেমন, এই তো বল্‌তে চাচ্ছ?

সুবোধচন্দ্র এ কথার কি উত্তর প্রদান করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলেন, 'আপনার বিবেচনায় যদি আমাদিগকেই দোষী ব'লে মনে হয়, না হয়, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনাই করুন। আপনি সকলের অভিভাবক তো বটেন।'

রজনী। আমি তোমার কোন যুক্তি শুন্‌তে চাই না। রোজ রোজ কেলেঙ্কারী আর সহ্য হয় না। পৃথক্ হওয়ার জন্য অস্থির হয়েছিলে, এখন মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আর কেন?

সুবো। আমি তো কখনো আপনার সহিত পৃথক্ হ'তে চাইনি। বরং একত্র থাক্‌বার জন্যই বরাবর বলে আস্‌ছি।

রজনীকান্ত মুখভঙ্গী করিয়া উত্তর করিলেন, 'তুমি না চেয়ে থাক, আমি চেয়েছি, এখন যাও, হয়েছে তো?'

সুবো। কৈ পূর্ব্বে আপনার মনে তো এরূপ কোন ভাব দেখ্‌তে পাইনি।

রজনী। পূর্ব্বে তোমার সহিত একত্র থাক্‌লেই সুখী হতুম্, এখন পৃথক্ হ'লেই গা জুড়ায়। বস্. এখন আপনার পথ দেখ। আর অনর্থক আমাকে জ্বালাতন কর্ত্তে এসো না।

সুবোধচন্দ্র দেখিলেন, আর অনুরোধ করা বৃথা। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া, তিনি এক পায়ে, দুই পায়ে, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সুবোধচন্দ্র চলিয়া গেলে, প্রভাবতী স্বামীকে বলিলেন, 'শুন্‌লে, কথাগুলি শুন্‌লে! একবার বলা হচ্ছে কিনা, আমি এসবের ভিতরে নই। আবার বলা হচ্ছে কিনা; না হয় আমায় মাপ করো। মাগো মা কি বহুরূপী গো।' রজনীকান্ত বলিলেন, 'তা যাই বলুক না কেন! আর মায়াকান্নায় ভুল্‌ছি নে'

প্রভা। আমার কিন্তু এদের ব্যবহারটা বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। আর একটা কাণ্ডের কথা শুনেছ? এর মধ্যেই পাড়ায় নাকি কে রাষ্ট্র করেছে, যে তুমি নাকি পৃথক্ হওয়ার সময় বাপের আমলের সমস্ত জিনিসই আত্মসাৎ করেছ। ভাইকে নাকি খাবার একখানা বাসন পর্য্যন্তও দেও নাই।

রজনীকান্ত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, 'ওসব ওদেরই কাজ। তবে কথাটা ভালই মনে করেছ। পৈত্রিক জিনিস পত্রগুলি লোকজন ডেকে শীঘ্রই বণ্টন ক'রে ফেলা উচিত। নইলে ঐগুলো হ'তে আমার নামে একটা ভারী দুর্নাম হবে, তার আর সন্দেহ নাই।'

প্রভাবতী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, 'যা কর্ত্তে হয় কর। কিন্তু কেহ তোমার নামে যে দুর্নাম কর্ব্বে, তা আমি প্রাণ থাকতে সহ্য কর্ত্তে পার্ব্ব না।'

এই বলিয়া প্রভাবতী একবার অঞ্চল দ্বারা স্বীয় চক্ষু মুছিয়া লইলেন। রজনীকান্ত পত্নীর এইরূপ পতিভক্তির প্রমাণ পাইয়া মনে মনে বড়ই সন্তোষ লাভ করিলেন। ভাবিলেন, প্রভাবতী উনবিংশ শতাব্দীর রমণীরত্ন। তিনি স্নেহপরবশ হইয়া পত্নীর করপল্লব ধারণ করিলেন এবং অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলিলেন, 'আর আমি সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন থাকছি না। তুমি সেইজন্য আর চিন্তা করো না। কালকেই আমি এর একটা কিনারা করে ফেলছি।'

প্রভাবতী আর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি ক্ষণকাল স্বামীর সহিত অন্যান্য বিষয়ের কথাবার্ত্তা বলিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপর আহারান্তে কেশকলাপে সুগন্ধি তৈল মাখিয়া, একখানা বাহোব্বা রঙের বাহোব্বা পেরে সুচিক্কণ কাপড় পরিয়া, স্বামীর পার্শ্বে যাইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। তৎপর কেমন করিয়া কোন কৌশলে তিনি স্বামীকে মনোগত সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর করিয়া লইলেন, কি প্রকারে রজনীকান্ত সুখযামিনী অতিবাহিত করিলেন, তাহা আমাদের পাঠক পাঠিকার নিকট সবিস্তারে বলিয়া, আর আমরা বাড়াবাড়ি করিতে চাহি না।

পরদিবস প্রাতঃকালে সুবোধচন্দ্রকে পৈত্রিক জিনিসের অর্দ্ধাংশ ভাগ করিয়া দিবার দস্তুরমত বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। রজনীকান্ত একজন লোক দ্বারা গ্রামের কতিপয় গণ্য মান্য প্রাচীন ভদ্রসন্তানকে ও বাচস্পতি মহাশয়কে সংবাদ দিয়া আনাইলেন। এদিকে সেন-বাড়ীর এই শুভবণ্টনকার্য্যের সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচারিত হওয়া মাত্র, সর্ব্বেশ্বরী মাসী, মঙ্গলা ঠাকুরঝি, প্রভৃতি গিন্নি সম্প্রদায় সুরবালা নৃপবালা প্রভৃতি লবঙ্গলতার দল, একে একে আসিয়া সেনবাড়ী উপস্থিত হইলেন। বাচস্পতি মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীও অদ্যকার এই শুভকার্য্যে বাটীতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। সকলে সমবেত হইলে ভেকার মা রজনীকান্তের আদেশমত জিনিস পত্রগুলি গৃহ হইতে বাহির করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে সজ্জিত করিতে লাগিল। বাচস্পতি মহাশয় একে একে তৎসমুদয়ের নাম ও সংখ্যা লিখিয়া লইয়া, এক দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিলেন। তৎপর তামা, কাঁসা, পিত্তল প্রভৃতির ওজন হইতে লাগিল। ওজনকার্য্য সমাধা হইলে, বাচস্পতি মহাশয় তালিকাদৃষ্টে, জিনিস পত্রগুলি দুইভাগে গচ্ছিত করিতে লাগিলেন। সকলে একদৃষ্টে বাচস্পতি মহাশয়ের ক্ষিপ্রকারিতা দর্শন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত প্রাচীনদের মধ্যে বণ্টনকার্য্য সম্বন্ধে যাহার মনে যে কোন বিষয় উদয় হইল, তিনিই বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট আপনার অভিমত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাহাতে বাচস্পতি মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। সেনবাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত কার্য্যোপলক্ষে আজ প্রায় একশত লোক সমবেত হইয়াছেন, তন্মধ্যে বাচস্পতি মহাশয়ই সর্ব্বপ্রধান অভিনেতা। সকলের চক্ষু, সকলের দৃষ্টিই, ঐ বাচস্পতি মহাশয়ের দিকে। বাচস্পতি

মহাশয় তালিকা লিখিতেছেন, বাচস্পতি মহাশয় বণ্টন করিতেছেন, যেন উপস্থিত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে আর কেহই বাচস্পতি মহাশয়ের সমকক্ষ নহেন। তাই যেন আজ তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানে সম্মানিত করা হইয়াছে। আহ্লাদে ডগ মগ হইয়া অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী মহিলাবৃন্দকে পশ্চাৎ করিয়া যাইতেছেন। একবার ইহার কাছে উপস্থিত হইয়া, একবার তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া, বণ্টনকার্য্যের সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রাচীনাদের মধ্যে যাহার যাহার স্বামী উপস্থিত ব্যাপারে উপস্থিত হইয়াছেন, অথচ বিশেষ কোন প্রকার অভিনয় না করিয়া, কেবল জড়পদার্থের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন, তাহাদের নিকট অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর এরূপ অভিমান বড় ভাল বোধ হইতেছে না। তাহারা স্ব স্ব স্বামীর অকৃতিত্বের প্রমাণ পাইয়া, আপনাদিগকে যেন একটু লজ্জিতা অনুভব করিতেছেন। সুতরাং অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর, স্বামীর কৃতিত্বজনিত অভিমান, এখন যে তাহাদের নিকট ভাল বোধ হইবে না, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

বণ্টনকার্য্য সমাধা হইলে, রজনীকান্ত একজন লোক দ্বারা কনিষ্ঠ-ভ্রাতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু সুবোধচন্দ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন না। তাঁহার সেই স্থানে উপস্থিত হইতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তখন বাচস্পতি মহাশয় সুবোধচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'কি হে, ভায়া, এখনো চুপ্ ক'রে রইলে যে? একবার এসে জিনিস পত্রগুলি দেখে শুনে নেও।'

সুবো। পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়! আপনি যান্, আমি ওখানে যেতে ইচ্ছা করি না।

বাচ। কষ্ট ক'রে কি হবে, ভায়া! কলির এই গতি। আমার

মতে একবার গিয়ে দেখ্‌লে ভাল হতো। আর যে রকম বণ্টন করা হয়েছে, তাতে তোমার পক্ষে ঠকাও তো হ'তে পারে।

সুবো। এর আর ঠকা জিতা কি? এ তো অপরের স'হিত বণ্টন হচ্ছে না। না হয় একজনা বেশী নিলেই। আপনি দাদাকে বলুন গিয়ে, তিনি যা ক'রে দিবেন, তাই আমার শিরোধার্য্য। তার কার্য্যে কখনো দ্বিরুক্তি করি নাই। জীবন থাক্‌তে কর্ব্বো না।

বাচস্পতি মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া, সেইরূপ রজনীকান্তের নিকট বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া রজনীকান্ত বলিলেন, 'না না, ওসব ধরিবাজিতে চল্‌বে না। তাকে বলুন্‌, সে এসে সব দেখে শুনে নিক্‌। না হ'লে এই নিয়ে পুনরায় আবার গোল বাঁধাবে। তবে তার আমার কথায় আস্‌তে অপমান বোধ হ'য়ে থাকে, গিরি এসে নিয়ে যাক্‌।'

এই বলিয়া রজনীকান্ত গিরিজাসুন্দরীর নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর গিরিজাসুন্দরী ছল্‌ ছল্‌ নেত্রে আসিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন রজনীকান্ত তাঁহাকে বলিলেন, 'নেও, এই বেলা সব ভাল ক'রে দেখে শুনে নেও। আর কোন বিষয়ে যদি কোন আপত্তি থাকে, তাও এই বেলা খুলে বল। এর পর ঠকা হয়েছে ব'লে, যেন আর কোন কথা শুন্‌তে না হয়।'

গিরিজাসুন্দরী মুহূর্ত্তের জন্য একবার জিনিস পত্রগুলির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, অনেক ভাল ভাল শাল বনাত ও বাসন বণ্টনের জন্য আদৌ উপস্থিত করা হয় নাই। প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে গিরিজাসুন্দরীর অধিক বিলম্ব হইল না। ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার মর্ম্মস্থল দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তজ্জন্য কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে তাঁহার একেবারেই প্রবৃত্তি হইল না। ক্ষণকালপর রজনীকান্ত বলিলেন, 'কেমন, বণ্টন ঠিক হয়েছে তো?'

গিরি। হাঁ, হয়েছে।

অতঃপর রজনীকান্ত ভগিনীকে বণ্টনকৃত দ্রব্যের একভাগ গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু গিরিজাসুন্দরী আর তথায় অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি এক পায়ে, দুই পায়ে, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অগত্যা প্রভাবতীর ইঙ্গিতক্রমে, ভেকার মা এক ভাগ সুবোধচন্দ্রের শয়নঘরে রাখিয়া আসিল। সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ স্ব স্ব বাটী প্রস্থান করিলেন। প্রভাবতী বুকভরা ভালবাসা লইয়া নানা প্রকারে স্বামীকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

——:০:——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

-০()০

রজনীকান্তের আত্মপ্রবোধ

অশ্রুজলে ভাসিয়া সুবোধচন্দ্র সময় ক্ষেপন করিতে লাগিলেন। যে ভ্রাতার সহিত চিরকাল সমভাবে থাকিবেন বলিয়া, তিনি মনে মনে কত সুখের আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই ভ্রাতার সহিত হঠাৎ পৃথক্ হওয়ায় সুবোধচন্দ্রের হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেল। নিদারুণ মনঃকষ্টে তিনি প্রথম প্রথম গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিলেন না। কাহাকে মুখ দেখাইতেই যেন তাঁহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। গিরিজাসুন্দরীর হস্তে যে কিছু সামান্য টাকা ছিল, তিনি তদ্দ্বারা কোন মতে সংসার খরচ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একদিন দুইদিন করিয়া, ক্রমে দিনের পর দিন গড়াইতে লাগিল। ক্রমে গিরিজাসুন্দরীর ক্ষুদ্র তহবিল নিঃশেষ হইয়া আসিল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সংসারের সমস্ত জিনিস পত্রেরই অনটন অনুভূত হইতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র শোকসন্তপ্তহৃদয়ে বৃথা কালক্ষেপ করিবার আর অবকাশ

প্রাপ্ত হইলেন না। সাংসারিক চিন্তা ধীরে ধীরে তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিতে লাগিল। কি করিলে আপনার পত্নীকে, শিশুসন্তান দুইটী সহ অনাথা ভগিনীকে, ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হইবেন, সুবোধ চন্দ্র দিবানিশি তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহাদের ভূসম্পত্তির অবস্থাও দিন দিনই শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল: মাতৃশ্রাদ্ধে ও মামলা মোকদ্দমার জন্য রজনীকান্ত যে টাকা ঋণ করিয়াছিলেন, তাহা সুদে আসলে অনেক বাড়িয়া যাওয়ায়, মহাজনগণ উভয় ভ্রাতার নামে নালিশ করিয়া ডিক্রী করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা দেইনডিক্রী হইতে কোন কোন মহাল নিলাম করাইয়া নিজ নিজ নামে ক্রয় করিয়া লইল। কোন মহাল বা বাকীরাজস্বে বিক্রীত হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে অবস্থা এতদুর গড়াইল, যে রজনীকান্তকে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়াই অবশিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইল। ঋণ পরিশোধ করিয়া রজনীকান্তের হস্তে মাত্র তিন হাজার টাকা অবশিষ্ট রহিল। রজনীকান্ত সেই টাকা গুলি নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন, এবং সুবোধচন্দ্রকে তাঁহার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ টাকা দেওয়া সঙ্গত কিনা, তদ্বিষয়ে মনে মনে নানারূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সংসারে অর্থাভাবের সঙ্গে সঙ্গে লোকের স্বভাবেরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা গিয়া থাকে। রজনীকান্তেরও তাহাই হইল। স্বচ্ছল অবস্থায় এরূপ ঘটনা ঘটিলে, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায় রজনীকান্তের মনোমধ্যে স্থান লাভ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ; কিন্তু দুরবস্থায় পড়িয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য টাকার উপর রজনীকান্তের আপনা হইতেই কেমন একটা আসক্তি জন্মিল। সুবোধচন্দ্রকে দেড় হাজার টাকা দিতে হইলে, বাকী দেড় হাজার টাকা দিয়া তিনি কেমন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, সেই চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে এতই

দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল, যে তিনি কিছুতেই সুবোধচন্দ্রকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা দেওয়ার বিষয়ে স্থির সংকল্পে উপনীত হইতে পারিলেন না। অবশেষে সাত পাঁচ ভাবিয়া, তিনি একদিবস প্রভাবতীর নিকট তদ্বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভাবতী তাহাতে চোক মুখ লাল করিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার, অত কথার প্যাঁচ বুঝি নি। তার প্রাপ্যটা হলো কি প্রকারে? এই যে তুমি এতকাল গায়ের রক্ত জল ক'রে, বিষয় আশয় শাসন কল্লে', এর জন্য যদি একজন লোক রাখা হতো, তা হ'লেও এর চতুর্গুণ টাকা ঘর হ'তে বের হ'য়ে যেতো। ধর্‌তে গেলে তাকেই এখন তোমাকে দিতে হয়।'

রজনীকান্তের মনও এইরূপ কোন একটী প্রবোধবাক্যের জন্যই লালায়িত ছিল। সুতরাং প্রভাবতীর যুক্তি, এখন তাঁহার নিকট অন্যায় বোধ হইল না। প্রভাবতী পুনরায় বলিলেন, 'আর ধর না কেন? এই যে ক'বছর ফি মাসে পড়্‌বার জন্য পঁচিশ টাকা ক'রে খরচ নিয়েছে, তুমি কি তার ভাগ পেয়েছ? তা তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর।'

রজনী। তোমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে, আমি আর তো কিছু কচ্ছি না। মনে কচ্ছিলুম অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে দি! এখন দেখ্‌ছি, তা হ'লে নিতান্তই ঠকা হবে।

প্রভাবতী আর কোন উত্তর করিলেন না। রজনীকান্ত বারংবার পত্নীর কথাগুলি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, সুবোধচন্দ্রকে এখন অর্দ্ধাংশ টাকা না দিলে, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তাঁহার কোনই দোষ হয় না।

এই প্রকারে নিজ মনকে প্রবোধ দিয়া রজনীকান্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার প্রাপ্য টাকার এক কপর্দ্দকও প্রদান করিলেন না।

এদিকে সুবোধচন্দ্রের অবস্থা এতদূর গড়াইল যে, গিরিজাসুন্দরী

ধার কর্জ্জ করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়াই তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন, 'ভাই! আর কতদিন মনঃকষ্ট ক'রে বসে থাকবে। শুন্‌ছি জমাজমী সব বিক্রয় করেছেন। যাও, তোমার টাকাটা এই বেলা চেয়ে নিয়ে এস।'

পুনরায় জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট যাইয়া কোন কথা বলিতে সুবোধ-চন্দ্রের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করেন, না গেলে জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্য উপায় নাই। সুতরাং তিনি ভগিনীর কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, অনতিবিলম্বে যাইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তৎপর মুখ অবনত করিয়া নিতান্ত কাতরকণ্ঠে বলিলেন, 'আমাদের খরচ পত্রের নিতান্ত অভাব। আমাকে কিছু টাকা দিন্।'

রজনীকান্ত মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, 'আমার কাছে টাকা চাওয়া হচ্ছে কেন? আমি টাকা দিব কোথা হ'তে?'

সুবোধ। আপনাকে নিজ হ'তে দিতে বল্‌ছি না। জমাজমী বিক্রয় ক'রে যে টাকা পাওয়া গিয়াছে, সেই টাকা হ'তে না হয় দিন্।

রজনী। তুমি দেখ্‌ছি আচ্ছা স্বার্থপর হ'য়ে উঠেছ। সেই টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে, তা কি তুমি জান না? আর যদি কিছু বেঁচেও থাকে, তার ভাগও তুমি পেতে পার না। সাংসারিক খরচ বাদে, তুমি যে এতকাল পড়্‌বার জন্য টাকা নিয়েছ, আমি কি তার ভাগ পেয়েছি? হিসাব কর্ত্তে গেলে, আমি এখনও তোমার নিকট ঢের পাওনা হই।

সুবোধচন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে এতদূর স্বার্থপর ও নীচাশয় হইয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া সুবোধচন্দ্রের অন্তঃকরণ দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পর তিনি পুনরায় বলিলেন, 'আপনার বিচারে যদি আমার কিছু পাওনাই না হয়,

তা হ'লে বরং আমাকে কতেক টাকা ধার দিন্। খরচ অভাবে হয়তো আমাদিগকে উপোষ কর্ত্তে হবে।'

রজনী। তাই ব'লে আমি কি করবো? সংসারে এতলোক যে উপোষ কর্চ্ছে, তাই ব'লে আমি তাদিগকে খেতে দিতে যাব নাকি?

সুবোধচন্দ্রের বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিল। তিনি আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া, ছল্ ছল্ নেত্রে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তৎপর কাঁদিতে কাঁদিতে ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দিদি! দিদি! আমি কি উপায় কর্ব্বো? দাদা এক পয়সাও দিবেন না। হায়! হায়! আমি কেমন ক'রে বালক বালিকা দুইটীর জীবন রক্ষা কর্ব্বো?'

গিরিজাসুন্দরীও স্থির থাকিতে পারিলেন না। কনিষ্ঠ ভ্রাতার করুণ ক্রন্দনে তাঁহারও দু'নয়নে প্রস্রবণ ছুটিল। তিনি স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার নয়ন মুছাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'ছিঃ ভাই! কেঁদ না। ভগবান্ মুখ দিয়েছেন, অবশ্যই অন্ন দিবেন। দাদা ঠকিয়েছেন, উপরে ভগবান্ আছেন, তিনিই এর বিচার কর্ব্বেন।'

অধিক কথা গিরিজাসুন্দরীর মুখে সরিল না। কিন্তু ভগিনীর প্রবোধবাক্যে আজ সুবোধচন্দ্রের মন প্রবোধ মানিল না। সুবোধচন্দ্র মনে কল্পিয়াছিলেন, যে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা একটী ঔষধালয় খুলিয়া জীবিকানির্ব্বাহের কোন প্রকার একটা সংস্থান করিবেন। কিন্তু সে আশা ভরসা সহসা বিলুপ্ত হওয়ায়, তিনি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত মাম্‌লা করিয়া নিজ টাকা আদায়

করিবার অভিপ্রায় সুবোধচন্দ্রের মনোমধ্যে ভ্রমেও স্থান লাভ করিতে পারিল না। বাঙ্গালীর শেষ আশা ভরসাস্থল চাকরী। সুবোধচন্দ্রের ডাক্তারি পরীক্ষা দিয়া উপাধি গ্রহণ করিতে এখনও এক বৎসর বাকী। এরূপ অবস্থায় চাকরীই বা কোথায় জোটে, কে দেয়? সুবোধচন্দ্র ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

-০ঃ০ঃ০-

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। সুবোধচন্দ্র শয্যার উপর অর্দ্ধশয়িত অবস্থায় আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছেন। অশ্রুজল বিন্দু বিন্দু করিয়া তাঁহার গণ্ডস্থল দিয়া ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িতেছে। হেমলতা স্বামীর পদপ্রান্তে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। পতির ম্লানমুখ ও তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া, পতিব্রতা পত্নীর দুই চক্ষে দুঃখের ধারা বহিতেছে। কেহই কোন কথা কহিতেছেন না। কিন্তু পতির ওরূপ অশ্রুসিক্ত পাণ্ডুবদন অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ করা, পতিব্রতা পত্নীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে স্বীয় চক্ষু মুছিয়া লইলেন। তৎপর একহস্তে স্বামীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া, আর এক হস্তে স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, নিতান্ত কাতরকণ্ঠে বলিলেন, 'ছিঃ আর চক্ষের জল ফেল না। তুমি কাঁদলে আমি স্থির থাকতে পারি না।'

সুবো। হেমলতা! আমি কাঁদবো না তো কাঁদবে কে? সংসারে আমার মত হতভাগা কে আছে?

হেম। ছিঃ তোমার কষ্ট কিসের?

সুবো। তুমি কি আর তা বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না? আজকার দিনও কোন মতে কেটে গেল, কিন্তু বলতো আজ রাত্‌ পোহা'লে তোমার মুখে কি দিব, দিদির মুখে কি দিব, নরেন চারুকেই বা কি খাওয়ায়ে রাখবো? তোমরা সকলে আমার মুখপানে চেয়ে আছ। আমি হতভাগা, কোন বন্দোবস্ত কর্ত্তে পেরেছি কি?

হেম। সেজন্য চিন্তা করো না। ঠানদিদির নিকট হ'তে ধার ক'রে, না হয় আরো ক'দিন সংসার চালাই। তুমিও একটী ঔষধের দোকান খুলবে ব'লে বলছিলে, ততদিন না হয় সেই চেষ্টা কর।

সুবো। তা হ'লে তো একটা কূল পাওয়া যেতো কিন্তু তত টাকা কোথায় পাব?

হেমলতা আর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্ব হইতে উঠিয়া গেলেন। হিন্দুর ঘরের গৃহলক্ষ্মীগণ শারদীয় প্রতিমার চরণস্পর্শ করাইয়া প্রতিবৎসরই কিছু না কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। গিন্নি কমলকামিনীও এ নিয়ম প্রতিপালনে, কখনো অন্যথাচরণ করেন নাই। তিনি জীবিতকাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই বিজয়ার বরণকালে, সাধ্যানুসারে কিছু কিছু করিয়া অর্থ, লক্ষ্মীর চরণসিন্দুরে রঞ্জিত করিয়া অতি ভক্তিসহকারে একটী রূপার কৌটায় ভরিয়া রাখিয়া দিতেন। সেই সঞ্চিত অর্থগুলি ক্রমে চল্লিশটী স্বর্ণ-মুদ্রায় পরিণত হইয়াছিল। মৃত্যুকালে বৃদ্ধা অর্থসহ সেই কৌটাটী হেমলতাকে প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দু বড় অভাবে না পড়িলে, কখনো এই লক্ষ্মীর কৌটায় হস্তক্ষেপ করে না। হেমলতা

আজ সেই কৌটাটী লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। তৎপর কৌটাহস্তে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'এই নেও, এই অর্থদ্বারা কার্য্য আরম্ভ কর।'

সুবোধচন্দ্রের মনঃকষ্ট সহনাতীত হইল। হেমলতার ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি বিচলিত অন্তঃকরণে বলিলেন, 'হেমলতা! হেমলতা! আমায় ক্ষমা কর। আমি দরিদ্র দীনহীন অভাজন কাঙাল। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণ থাকিতেও আমি তোমার ঐ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না।'

হেম। ছিঃ ওরূপ করো না। যা বলি, তাই শুন।

এই বলিয়া হেমলতা সেই কৌটাটী স্বামীর হস্তে প্রদান করিবার জন্য হস্ত সম্প্রসারণ করিলেন। কিন্তু সুবোধচন্দ্র তাহা গ্রহণ না করিয়া অবনত মস্তকে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। হেমলতার কান্না আসিতে লাগিল। তিনি সযত্নরক্ষিত অর্থদ্বারা স্বামীর উপস্থিত অভাব মোচনের চেষ্টা করিলেন, সুবোধচন্দ্র তাঁহার সে সাধে বাদ সাধিলেন। আপনার কার্য্য দ্বারা স্বামীর বিপদ উদ্ধার করিয়া, তিনি মনে মনে যে সুখ-সম্ভোগের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, সুবোধচন্দ্র তাঁহাকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন। হেমলতার প্রেমপূর্ণ কোমল প্রাণে এত সহিল না। সুবোধচন্দ্র পূর্ব্বে কখনো হেমলতাকে অভিমান করিতে দেখেন নাই, আজ হেমলতার বড় অভিমান হইল। তাঁহার ডব্‌ডবে চক্ষু দুইটী হইতে সহসা দুই ফোটা জল ঝরিল। গণ্ডদ্বয় ঈষৎ গোলাপী আভা ধারণ করিল। তিনি এক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে নিরীক্ষণ করিয়া স্থিরভাবে বলিলেন, 'নির্দ্দয়! কেবল আমাদিগকে কষ্ট দিবার জন্যই বুঝি বিধাতা তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। আত্মসুখ, আত্ম

অভিমান ভিন্ন বুঝি জগতে আর কিছুই তোমাদের রক্ষণীয় নহে। নিষ্ঠুর, একবার ভাবিয়া দেখিলে না, তুমি অর্থের জন্য হতাশ চিত্তে শ্রীভ্রষ্ট পাগলের মত কেবল চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে, আমি কিনা তখনও নিজকে তোমার অঙ্কলক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মী বলিয়া পরিচয় প্রদান কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্বো? অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া যখন তুমি অশ্রুজলে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিবে, আমি কিনা তখন মায়ের লক্ষ্মীরভাণ্ডার আগুলিয়া ব'সে থেকে, অলক্ষ্মীর ভ'ববিকাশের সহায়তা কর্ব্ব? তুমি রোজ রোজ এরূপ বিষাদমাখা মলিন মুখচ্ছবি লইয়া আমার নিকট আসিয়া উপবেশন করিবে, আমি পোড়ারমুখী তাহা দেখিয়াও কিনা নিজকে সৌভাগ্যবতী ব'লে মনে কর্ব্বো? (অতঃপর কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন) আশীর্ব্বাদ কর, যে দিন তোমার দৈন্য, তোমার কষ্ট দেখিয়াও নিজকে সতীলক্ষ্মীর উপযুক্ত চরণসেবিকা ব'লে মনে কর্ব্বার ভ্রম জন্মিবে, যে দিন তোমার প্রয়োজন— দীনের প্রয়োজন ব্যতীত, এ ভাণ্ডার রক্ষার অন্য কোন কারণ আছে ব'লে মনে হবে, সেই দিন তোমার শ্রীচরণে মস্তক রক্ষা ক'রে যেন দাসী জীবন বিসর্জ্জন কারিতে সমর্থ হয়।

সুবোধচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'হেমলতা! হেমলতা! আমার দোষ গ্রহণ করিও না। ভেবে দেখ, সংসারের এই দৈন্য দেখে, নিজকে লক্ষ্মীযুক্তা ব'লে মনে কর্ত্তে যদি তোমার এত সঙ্কোচ বোধ হয়, তা হ'লে ঐ স্ত্রীসম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ ক'রে, লক্ষ্মীছাড়ার পূর্ণ অবতার ব'লে নিজকে পরিচয় প্রদান কর্ত্তে, আমার কি কোনই কষ্ট হ'তে পারে না?

হেম। তা বুঝি। তোমার কষ্ট হইবে বলিয়া, আমারও কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি কর্ব্বে, আর উপায়ান্তর নাই। আর মনে ক'রে দেখ, এ ভাণ্ডার কিসের জন্য? মা—সতীশ্বরী সতীকুললক্ষ্মীর চরণসিন্দূররাগে

রঞ্জিত ক'রে, কিসের জন্য মায়ের সতীকন্যাগণ ইহা রক্ষা ক'রে থাকেন? যখন অলক্ষ্মী আসিয়া সংসারে প্রবেশ করে,—যখন দুঃখ দারিদ্র্য আসিয়া চতুর্দ্দিক্ হ'তে সংসারে শ্মশানবহ্নি জ্বালিয়ে দেয়, তখনই এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রয়োজন। কায়মনোবাক্যে আমি যদি সতী হই,—মা সত্য সত্যই, তাঁহার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যদি তাঁহার লক্ষ্মী কন্যার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়া থাকেন,—মা মঙ্গলচণ্ডিকা সতী সীমন্তিনীর সীমন্তে সিন্দূর পরা'য়ে সত্য সত্যই সে সিন্দূর যদি আপন সীমন্তে ধারণ কর্ত্তে পেরে থাকি, তা হ'লে নিশ্চয়ই এ ভাণ্ডার অফুরন্ত হবে। নিশ্চয়ই ইহা ক্রমে সর্ব্বৈশ্বর্য্যের আকর হ'য়ে উঠ্‌বে। তা যদি না হয়, তা হ'লে যেন আমি লক্ষ্মী নই অলক্ষ্মী, সতী নই অসতী।

বলিতে বলিতে হেমলতার বদনমণ্ডল সহসা এক স্বর্গীয় বিমল জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নিশ্চল হৈমপ্রতিমার ন্যায়, তিনি কৌটাটী দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুবোধচন্দ্র পুলকপ্রফুল্ল অনিমেষলোচনে পত্নীর সেই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, সত্য সত্যই লক্ষ্মীপ্রতিমা যেন, তাঁহার পত্নীমূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমতী হইয়া আজ তাঁহার সমক্ষে বিরাজমানা। সত্য সত্যই অভিন্নহৃদয়া সতী লক্ষ্মী যেন বরপ্রদায়িনী মূর্ত্তিতে তাঁহাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রদান করিবার জন্য আজ বরাভয়কর সম্প্রসারণ করিয়াছেন। শ্মশানচারী দীন দরিদ্র শিবের নিকট আজ মা অন্নপূর্ণা যেন সত্য সত্যই মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার তুলিয়া ধরিয়াছেন।

হিন্দুর ঘরের গৃহলক্ষ্মীগণ! একবার দাঁড়াও দেখি মা! লক্ষ্মীভাবের পূর্ণমূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমতী হইয়া, একবার দাঁড়াও দেখি মা! অনেক দিন দেখি নাই, আজ একবার অম্‌নি ক'রে, বরাভয়কর সম্প্রসারিত ক'রে,

দাঁড়াও দেখি মা! পতির কাজে—ঘরের কাজে,—হৃদয়ের গুপ্ত সঞ্চিত ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে, একবার দাঁড়াও দেখি মা! অন্নহীন পথের কাঙালের জন্য, একবার অন্নপূর্ণা চরিত্রের পরিপূর্ণ ভাববিকাশে মূর্ত্তিমতী হইয়া দাঁড়াও দেখি মা! আমরা তোমাদের পূজা কর্‌বো। এবার শরৎকালে মায়ের মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা না ক'রে, মায়ের জ্বলন্ত-প্রতিকৃতিরূপিণী সজীবমূর্ত্তির পূজা কর্‌বো। তোমাদেরই ত্রিদিবরাগ-রঞ্জিত অমরবাঞ্ছিত শ্রীপাদপদ্মে করপুটে সচন্দনজবাবিল্বদলে অঞ্জলি প্রদাত করতঃ আমরা সমস্বরে বল্‌বো,—

"দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে! প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি! চরাচরস্য॥"

সুবোধচন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপলক নেত্রে সেই প্রভাত-নক্ষত্রোজ্জ্বলরূপিণী বরাভয়ভাবপ্রদায়িনী সতীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি এক অননুভূত অপার্থিব আনন্দরসে যে তাঁহার মন-প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল, সুবোধচন্দ্র তাহার কিছুই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। মূর্ত্তিমতী সতীর এক অজ্ঞেয় অলক্ষিত সঞ্চালনী শক্তির প্রভাবে, তাঁহার ভ্রান্ত আত্মাকে সহসা চৈতন্যময় করিয়া তুলিল। যন্ত্রচালিত পুতুলের মত—মন্ত্রপূত শিষ্যের মত,—অভিন্নহৃদয় প্রেমিক ভোলা ভক্তের মত,—সুবোধচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, 'হেমলতা! হেমলতা! তাই হবে, তোমার ঐ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মূলধন ক'রেই একবার দারিদ্র্য রাক্ষসীর সঙ্গে যুঝে দেখ্‌বো। কায়মনো-বাক্যে লক্ষ্মীপূজা ক'রে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ কর্ত্তে একবার মনপ্রাণে চেষ্টা কর্‌বো। এস, এস, লক্ষ্মী আমার, সতী আমার, সাবিত্রী

আমার, গায়ত্রী আমার, সাধনা আমার, এই হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিতা হও। লক্ষ্মীচরিত্রের পূর্ণবিকাশে এই শ্রীহীন দগ্ধ সংসারকে আবার সুখসম্পদে পরিপূর্ণ করিয়া তুল। উত্তপ্ত হৃদয়-শ্মশানে আবার প্রীতির নন্দনকানন সৃজন কর। চৈতন্যহীন অসত্যময় মৃতদেহে আবার নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠিত হউক। গায়ত্রী সাধনায়,—সাবিত্রী মন্ত্রোচ্চারণে আবার সত্যবান্ জাগিয়া উঠুক। তাঁহাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যে বরণ করুক্।

এই বলিয়া সুবোধচন্দ্র আবেগভরে প্রিয়তমা পত্নীকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য দুই বাহু সম্প্রসারিত করিলেন। হেমলতাও স্বামীকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া, বুঝি লক্ষ্মীনারায়ণের মিলন-ভাবে বিভোর রহিয়া, সেই সুখযামিনী অতিবাহিত করিলেন। সে মিলনের আর বিচ্ছেদ ঘটিল কিনা, কে জানে?

——:——

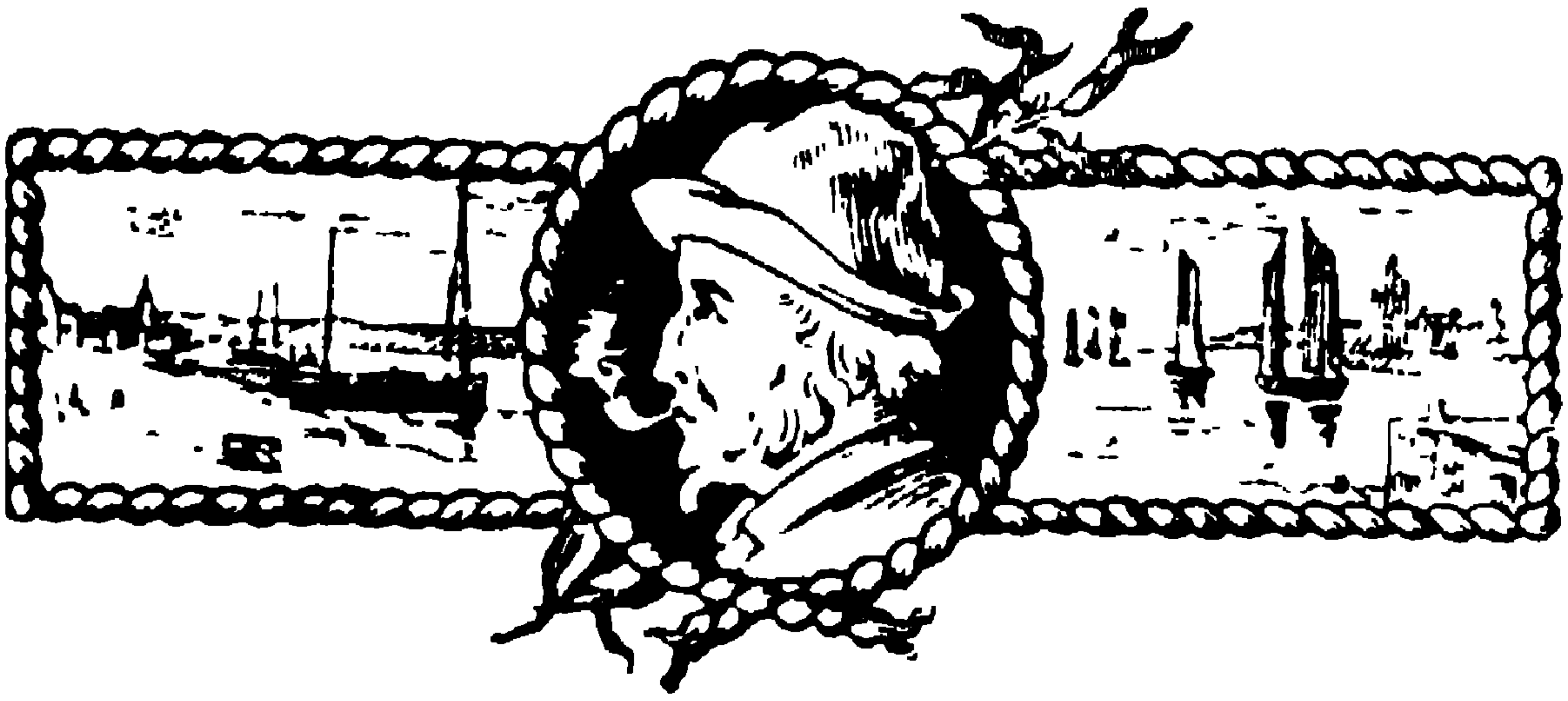

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মানবী না দেবী?

বেলা অপরাহ্ণ। চপলকুমারী নিজগৃহে বসিয়া কার্পেটের উপর রেসমের ফুল তুলিতেছেন। এমন সময় বৃদ্ধ শ্যামসুন্দর এক শিশি সুগন্ধি তৈল হস্তে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এক দৃষ্টিতে গুণবতী ভার্য্যার ঢল ঢল লাবণ্যরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন! চপলকুমারীর কারুকার্য্য, চপলকুমারীর অঙ্গুলীসঞ্চালন—চপলকুমারীর ঈষৎ মনঃসংযোগের উপর ফুটন্ত,—সেই অমিয়ময়ভাব; বৃদ্ধকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অভিনব পট প্রদর্শিত করাইতে লাগিল। বৃদ্ধ তাঁহার এই শেষ বয়সে জগদীশ্বরের অপূর্ব্ব করুণা স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পর চপলকুমারী একটু চটুল হাসি হাসিয়া স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'কি! কি দেখ্‌ছ?'

শ্যাম। তোমার রূপ, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল।

চপ। তুমি আমায় বড়ই ভালবাস, না?

বৃদ্ধ সহসা এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। প্রাণের অন্তস্তল হইতে কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইল। তিনি আদর করিয়া পত্নীর গণ্ডস্থলে ছোট রকমের একটী চুম্বন দিলেন। সে চুম্বনে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হইল। তাহাতে একটু কামনার ভাব—একটু বাসনার ভাব জড়িত ছিল। চপলকুমারীর ফুলতোলা-কার্য্য বন্ধ হইল। মুখশ্রী হঠাৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি নিতান্ত বিচলিত চিত্তে বলিলেন, 'ছিঃ তুমি এমন?'

শ্যাম। কেন, কোন অপরাধ হয়েছে কি?

চপ। মনে কর্‌লে—যথেষ্ট হয়েছে।

শ্যাম। তা যদি নিতান্তই হ'য়ে থাকে, গোলাম তো হাজিরই আছে। ভুজ-পাশে বাঁধি কর দণ্ড।

চপলকুমারীর সংসর্গে থাকিয়া বৃদ্ধও কিঞ্চিৎ সরস বাক্যবিন্যাসে অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে অনুরাগ চপলকুমারীর সঙ্গে বাক্যালাপের সময়ই অধিকাংশ সময়ে পরিস্ফুট হইত। অন্য বিষয় হইলে চপলকুমারীও ঠিক অনুরূপ হাস্য পরিহাসচ্ছলেই স্বামীর কথার উত্তর প্রদান করিতেন। কিন্তু আজ তাহার বিপরীত ঘটিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা বিরক্তির সহিত বলিলেন, 'তুমি যদি ওরূপ কর, তা হ'লে এই চুলগুলি কাঁচি দিয়ে কাট্‌বো। মুখে উল্কি দিয়ে, এই রূপের হাট ভেঙ্গে দিব। যে রূপ দেখ্‌লে লোকের ঘৃণা হয়, ইচ্ছা ক'রে সেই রূপ ধর্‌বো।

শ্যাম। কেন, এ বৃদ্ধের উপর এত দৌরাত্ম্য কেন? বিধাতা রূপ দিয়াছেন, সে কি নষ্ট কর্ব্বার জন্য?

চপ। বুঝি আমার পক্ষে তাই। যে রূপে স্বামীকে দগ্ধ করে হৃদয়ে সম্ভোগবাসনা জ্বালিয়ে দেয়, সেই রূপে প্রয়োজন? আমার

যত্নে, তা না থাকাই ভাল। আমি কি পক্ষান্তরে স্বামিপ্রাণহন্ত্রী হবো?

আবার বৃদ্ধের অস্থিপঞ্জর ভগ্ন করিয়া আর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইল। বৃদ্ধ অতি কষ্টে হৃদয় সংযত করিয়া বলিলেন, 'আজ এ কথা কেন চপল! তুমি আমার প্রাণহন্ত্রী হবে!—এও কি কখন সম্ভবপর?'

চপ। অসম্ভব কিসে? আমার মুখের দিকে তুমি যদি ওরূপ মোহের পিপাসায় তাকিয়ে থাক, এ দেহকে ভোগের সামগ্রী মনে ক'রে, যদি বাসনানলে জর্জ্জরীভূত হও, তাহা হইলে আমা হইতে আর তোমার ইষ্ট সম্ভাবনা কোথায়?

শ্যামসুন্দর রায় পত্নীর এ কথার কি উত্তর প্রদান করিবেন তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু চপলকুমারী যে প্রকৃত প্রস্তাবেই তাঁহার উপর একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি সেই সুগন্ধি তৈলের শিশিটী উপহার দ্বারা পত্নীর মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাহাতে আরও অনর্থ ঘটিল। চপলকুমারীর কখনও অভিমান হইত না। কিন্তু আজ তাঁহার নিদারুণ অভিমান জন্মিল। তিনি একটু উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কার জন্য এনেছ?'

শ্যাম। তোমারই জন্য।

চপল। কেন?—আমি কি পীড়িতা?—না আমি পিশাচিনী,—স্বভাবতঃ শরীরে দুর্গন্ধময়ী?

শ্যামসুন্দর রায় মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ভাবিলেন 'আজ কি কুক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল।' তিনি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'কেন? সুগন্ধি তৈল কি আর লোকে ব্যবহার করে না?'

চপল। যার ইচ্ছা হয় করুক। আমি কি কখনো এর জন্য আবদার করেছি?

শ্যাম। তা করনি সত্য। কিন্তু ভক্তই দেবীকে ইচ্ছামত দ্রব্য উপহার প্রদান ক'রে থাকে। দেবী কিছু বলেন না।

চপল। না। এমন পাপমাখানো ভক্তিতে দেবী কখনো সুখী হ'তে পারেন না। তোমার এরূপ ভক্তিতে, আমি সন্তুষ্ট হ'তে পার্লেম না। যার চুল নাই, তারই পরচুলার প্রয়োজন। যার শরীরে দুর্গন্ধ, তারই সুগন্ধের আবশ্যক। যে সমাজে মদ্যমাংস প্রধান খাদ্য, গলিত দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদিই যাহাদের একমাত্র রসনাতৃপ্তিকর, তাহাদেরই সুগন্ধি তৈলাদির প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু যেখানে জল বায়ু, ধর্ম্ম ও খাদ্যাদির গুণে, শরীর হ'তে স্বভাবতঃই সুগন্ধ বহির্গত হয়. মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পগন্ধযুক্তা রমণীসমাজে শ্রীঅঙ্গের সৌরভে যেখানে শ্রীমতী আদর্শ ছিলেন; সেই স্থানের রমণীগণ ব্যাধিগ্রস্ত না হ'লে আর সুগন্ধি দ্রব্যাদি মার্জ্জনা দ্বারা অঙ্গের সৌরভ সম্পাদন করিতে চাহিবেন কেন? আর পুরুষগণ কতকটা চরিত্রহীন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ না হ'লে সেই গন্ধাস্বাদনের জন্যই বা তাহারা কেন লালায়িত হ'বে?

শ্যামসুন্দর রায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ পত্নীর বাক্যাবলী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চপলকুমারী পুনরায় আর একটু দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন, 'এই যে ব্রত নিয়মাদি পালন করিতেছি, এ কিসের জন্য?—এই যে মৎস্য মাংসাদিবর্জ্জিত দেবতার প্রসাদে শরীর ধারণ করিতেছি, এ কিসের জন্য? যদি দেহ মনের পবিত্রতা সম্পাদন করিতেই না পারিলাম। মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যদি কতকটা পশুভাবাপন্ন হইয়াই থাকিতে হইল। দেবচরিত্র সম্পন্ন হইতে যদি না পারিলাম, তবে আর হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের সার্থকতা রহিল কোথায়?'

বলিতে বলিতে চপলকুমারীর সমস্ত শরীর দিয়া এক অপূর্ব্ব তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চালিত হইল। বদনমণ্ডলে কেমন একটা অপার্থিব তরল জ্যোতির তরঙ্গ ক্ষীণবিদ্যুদ্বিলসনের ন্যায় সহসা নৃত্য করিয়া উঠিল। পলকবিহীন চক্ষু দুইটি দেখিতে দেখিত বর্দ্ধিতায়তন হইল। শ্যামসুন্দর রায় মহিমময়ী পত্নীর তুলনায় নিজকে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনোমধ্যে যে মোহের ভাব উদ্রিক্ত হইয়াছিল, তাহা লোপ পাইল। তিনি নিতান্ত ভক্তিবিজড়িত প্রাণে ধীরে ধীরে তাঁহার কোমল করপল্লব ধারণ করিলেন। বলিলেন, 'আমি ভস্মদ্বারা দেবী পূজার আয়োজন করিতেছিলাম। আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না।'

চপল। তুমিই আমায় ক্ষমা কর। আমার ত্রুটিতেই বোধহয় তোমার মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্যামসুন্দর রায় আর কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি পুলকিত প্রাণে পত্নীর হস্ত ধরিয়া সেঃস্থানে বসিয়া রহিলেন। চপলকুমারী ধীরে ধীরে নিজ মস্তক স্বামিক্রোড়ে ন্যস্ত করিয়া, এক স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া মুদ্রিত নেত্রে রহিলেন। রূপ যেন তাঁহার সমস্ত শরীর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্যামসুন্দর রায় এ পর্য্যন্ত আর এমন কামনাপরিশূন্য হৃদয়ে পত্নীকে নিরীক্ষণ করেন নাই। আজ মোহমুক্তনয়নে নিজঅঙ্কে শয়িত সতীমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ পুলকে ভরিয়া উঠিল। নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যেরূপ তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল, সেরূপ এখন শান্ত স্নিগ্ধ-কৌমুদী-ধারার ন্যায় তাঁহার প্রাণে কি এক বিমল শান্তিসুধা ঢালিয়া দিতে লাগিল। বৃদ্ধ অনিমেষলোচনে সতীর সেই লাবণ্যরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—'আ, মরি, মরি,—কি সুন্দর—কি

পূর্ণ—কি অপরূপ রূপ!' সে রূপে—ফুলের সৌরভ, চাঁদের হাসি, স্বর্গের সুধা, জ্যোৎস্নার মাধুরী, সমস্তই যেন জড়ান ছিল। যাহা অপূর্ণ ছিল, তাহা যেন পূর্ণতা লাভ করিল। যে পিপাসায় মনপ্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছিল, আজ যেন সহসা তাহা পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। চপল-কুমারী একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য পতির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। বুঝি, সে নয়নে সে দৃষ্টিতে ব্যক্ত হইল,—'এমন সুখ জগতে আর আছে কি?' শ্যামসুন্দর রায়ও বুঝি মনে করিলেন, 'তিনি চিরকাল এমন সুখাস্বাদনে সমর্থ হইবেন কি?' কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না। অথচ সেইদিন,—সেই মুহূর্ত্তে, উভয়ের প্রাণে প্রাণে,—ক্ষণিক বিকশিত, ক্ষণিক মুদ্রিত নয়নে নয়নে, যে রমণ হইয়াছিল; সে রমণে, কত সুখ—সে সমাধিতে কত শান্তি, তাঁহারা পরস্পর উপভোগ করিয়াছিলেন, কত সুবাসিত পুষ্প-গন্ধে তাঁহাদের মনপ্রাণ ভরপূর হইয়াছিল; আসুরসুখাস্বাদনলোলুপ মোহান্ধ মনুষ্য তার কি বুঝিবে? শ্যামসুন্দর রায় পূতিগন্ধ লইয়া পত্নীর ভাবগঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু পবিত্র হইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—

'চপলকুমারী মানবী?—না দেবী জাহ্নবী?'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রত্নগর্ভা।

সংসারখরচ নির্ব্বাহ করিবার জন্য সুবোধচন্দ্র ভগিনীর হস্তে এক শত টাকা প্রদান করিলেন। এবং চারি শত টাকা দিয়া কলিকাতা হইতে ঔষধপত্র আনাইয়া নিজ বাটীতেই একটী ঔষধালয় খুলিলেন। প্রথম প্রথম সুবোধচন্দ্রের পসার ভাল জুটিল না। সুবোধচন্দ্রের বয়স তাদৃশ পরিপক্ক না হওয়ায়, তাঁহার চিকিৎসার উপর লোকের তত বিশ্বাস হইত না। কিন্তু সুবোধচন্দ্র তাহাতে হতাশ না হইয়া, আপনার লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া, পূর্ণ উৎসাহের সহিত বিনামূল্যে রোগীদিগকে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। হেমলতার চরিত্রপ্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে এমন একটা শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, যে তিনি কোন কার্য্যেই ভগ্নোৎসাহ হইতেন না। একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনা তাঁহার প্রতি কার্য্যের মধ্য দিয়াই যেন ফুটিয়া বাহির হইত। ক্রমে তাঁহার উপর লোকের চক্ষু পড়িল। এমন সময় বিষ্ণুপুর ও তন্নিকটস্থ পল্লীতে কলেরার বড়ই প্রাদুর্ভাব হইল। প্রত্যহ দশ পনর জন লোক, এই রোগে মারা পড়িতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া,

অনেক মুমূর্ষু রোগীকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন। এই সময় হইতে সুবোধচন্দ্রের অদৃষ্টেরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। গ্রামের গণ্য মান্য ভদ্রলোক সম্প্রদায়ও চিকিৎসার জন্য, তাঁহাকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। সুবোধচন্দ্রের আয়ও দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

এদিকে সুবোধচন্দ্রের সংসারের আয়বৃদ্ধি দেখিয়া, প্রভাবতীর গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইতে লাগিল। রজনীকান্তের হৃদয়েও পরশ্রী-কাতরতার বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। সহসা দারুণ প্রতি-যোগিতার ভাব তাঁহার মন প্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কি করিলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবেন, রজনীকান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় গ্রামের চৌকীদারি-তহশীল-পঞ্চায়তের পদ শূন্য হইল। রজনীকান্ত সেই পদটী গ্রহণ করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে গ্রামের অনেক লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু রজনীকান্ত সদরে যাইয়া ডেপুটী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পদটী গ্রহণ করিয়া আসিলেন। ইহাতে তাঁহার মাসিক দশ বার টাকা আয় বৃদ্ধি পাইল। এবং লহনার ব্যবসায়েরও অনেক সুবিধা ঘটিল। যে সমস্ত দায়িক মাস মাসে সুদ পরিষ্কার না করিত, রজনীকান্ত তাঁহার চৌকিদারী খাজানা বৃদ্ধি করিতেন। এবং তলবমত খাজনা আদায় না করিলে, তাহাদের ঘটী বাটী নিলাম করাইতেন। কাহাকে কাহাকে বা ফৌজদারী মোকদ্দমায় আটকাইয়া দিয়া সুদে আসলে টাকা আদায় করিয়া লইতেন।

এইরূপে, রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা মধ্য সময় হইতে অনেক উন্নত হইল। ব্যয় বিধান সম্বন্ধে তিনি প্রতি কার্য্যেই কনিষ্ঠ

ভ্রাতার সহিত টক্কর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইল। ক্রমে রজনীকান্তের সংসারে প্রভাবতী পুনরায় নানারূপ অশান্তি সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পৃথগন্ন হইবার পূর্ব্বে রন্ধনাদি সমস্ত গৃহকার্য্যই প্রভাবতী হেমলতার দ্বারা নির্ব্বাহ করাইয়া লইতেন। নিজে কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং এখন নিজহস্তে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রভাবতীর নিরতিশয় কষ্টবোধ হইতে লাগিল। পৃথগন্ন হইয়া, তিনি কিছুকাল গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার সহিত প্রতিযোগিতা দেখাইয়া, নিজ হস্তেই গৃহকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু অধিককাল সেরূপে চলা তাঁহার প্রকৃতিতে সহ্য হইল না। প্রভাবতীর একমাত্র কন্যা ক্ষেমদা, সর্ব্বপ্রকারে জননীর স্বভাবে গঠিতা হইয়াছিল। গৃহকার্য্যে সে এক তিলও প্রভাবতীকে সাহায্য করিত না। প্রভাবতী কোন সময় তাহাকে কোন কাজ কর্ম্ম করিতে বলিলে, সে অমনি মুখের উপর তাঁহাকে দু' চারি কথা শুনাইয়া দিত। কখন কখন বা মুখোমুখী হইয়া জননীর সহিত তুমুল বিবাদ বাঁধাইয়া দিত। প্রভাবতী মনের ক্ষোভে কখনও বা স্বামীর উপর তাহার কড়ায় গণ্ডায় প্রতিশোধ লইতেন, কখনও বা শয্যায় শয়ন করিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। সেই দিবস রজনীকান্তকেই নিজ হস্তে রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত।

একদিবস কোন কার্য্যোপলক্ষে রজনীকান্ত অতি প্রত্যূষে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিতে বেলা আড়াই প্রহর অতীত হইয়া গেল। গৃহে প্রবেশ করিয়া রজনীকান্ত দেখিতে পাইলেন, যে প্রভাবতী শয্যায় শয়ন করিয়া নেত্রাসার বর্ষণ করিতেছেন। রজনীকান্ত ভালমন্দ কিছুই না বলিয়া প্রিয়তমা ভার্য্যার নিকট স্নানা-

হারের উদ্যোগ প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভাবতী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন না অবশেষে রজনীকান্ত নিতান্ত বিরক্তির সহিত প্রভাবতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আজ আমার খাওয়া দাওয়া হবে না কি?'

প্রভা। খেতে হয়, রেঁধে খাও গিয়া, কে বারণ কর্চ্ছে?

রজনী। সে কি! আজও আবার রান্না হয়নি বুঝি? আচ্ছা মানুষ নিয়ে ঘর কর্‌ছি, যা হক্।

প্রভা। সে কথা কাকে শোনাচ্ছ? রসুয়ে বামুন্ রাখ্‌তে মোরাদ হয় না? কে তোমাকে বার মাস রেঁধে দিবে? হয় রাধুনী রাখ, নয় ছেলেকে বিয়ে করা'য়ে বৌ ঘরে আন। আমা হ'তে এসব চলে উঠ্‌বে না, বাবু।

রজনী। সে বিষয় পরে বোঝা যাবে। এখন সারাদিন যে আমার পেটে জলবিন্দু পড়েনি, সে কথার কি?

প্রভাবতী কোন উত্তর না করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করতঃ ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রজনীকান্ত একে পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী আসিয়াছেন, তাহাতে পত্নীর আচরণ দেখিয়া, তাঁহার নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং সেই দিবস তাহাকে অনাহারেই অতিবাহিত করিতে হইল। এইরূপে কভু অনশনে, কভু একাশনে রজনীকান্তের দিন কর্ত্তিত হইতে লাগিল।

এদিকে রজনীকান্তের পুত্র যতীশচন্দ্রও তাঁহাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন করিয়া তুলিল। যতীশচন্দ্রের বয়ঃক্রম এখন ষোড়শ বৎসরে পরিণত হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি এক কীলে গুরু মহাশয়ের নাক ভাঙ্গিয়া স্কুল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এবং

চতুর্দ্দশ বৎসর যাইতে না যাইতেই তাহার চরিত্রে নানারূপ দোষ দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। রজনীকান্ত প্রথম প্রথম পুত্রকে শাসন করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভাবতী তাহাকে বিশেষ কিছু বলিতে দিতেন না। রজনীকান্ত পুত্রকে কোন সময় দু' এক ঘা দিবার উপক্রম করিলে, প্রভাবতী স্বামীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া নাক ফুলাইয়া বলিতেন, 'ওমা! সাত নয়, পাঁচ নয়. ষেঠের বাছা, ষষ্ঠীর দাস, তার উপর হাত তোল? আমি এখনি বিষ খেয়ে মরবো।' সুতরাং ষষ্ঠীর দাস মায়ের সহানুভূতি পাইয়া পিতাকে আর বড় গ্রাহ্য করিতেন না। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি একেবারে স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। এই সময় হইতে তিনি নানারূপ ইতর লোকের সহিত মিশামিশি ও কুপল্লিতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মদ, গাঁজা, চণ্ডু, চরস প্রভৃতি মাদক পদার্থগুলিতে তাঁহার অভ্যাস ও আসক্তি জন্মিতে লাগিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইল। যতীশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে জননীর নিকট হইতে দু' চারি টাকা চাহিয়া লইতেন, কিন্তু তদ্দারা এখন তিনি এক দিবসের খরচও সঙ্কুলন করিয়া উঠিতে পারেন না। এই সময় হইতে তিনি চুরি করিয়া আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সুবিধা পাইলেই তিনি পিতামাতার বাক্স ভাঙ্গিয়া যাহা কিছু পাইতেন লইয়া প্রস্থান করিতেন এবং ঐ টাকা ব্যয় না হওয়া পর্য্যন্ত বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন না। রজনীকান্ত কিছু বলিলে যতীশচন্দ্র চোক মুখ লাল করিয়া তাঁহাকে তাড়া করিয়া অগ্রসর হইতেন। রজনীকান্তও 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' মনে করিয়া গুণধর পুত্রকে আর কিছু বলিতে সাহস পাইতেন না।

এদিকে প্রভাবতী, নিজহস্তে রন্ধন করিতে হয় বলিয়া পুত্রকে বিবাহ করাইবার জন্য রজনীকান্তকে দিন দিনই পীড়াপীড়ি করিতে

লাগিলেন। রজনীকান্ত প্রভাবতীর কথায় প্রথম প্রথম কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু প্রভাবতী সময় বুঝিয়', তাঁহার এক মামার ঘরের শালার সম্বন্ধীর ছেলের উদাহরণ দিয়া স্বামীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, রূপবতী স্ত্রী ঘরে আসিলে পুত্রের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। রজনীকান্তের হৃদয় টলিতে লাগিল। এদিকে ক্ষেমদাও অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিল। অগত্যা তিনি একটী পাত্র ও একটী পাত্রীর অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দু' চারিস্থলে মনোনীত হইল সত্য। কিন্তু রজনীকান্ত অশেষ চেষ্টা করিয়াও কোথায়ও কার্য্য সুস্থির করিতে পারিলেন না। যাহারা যতীশচন্দ্র ও ক্ষেমদার চরিত্র বিষয়ে, একবার অনুসন্ধান লইতে আসিলেন, তাহারাই দ্বিতীয়বার প্রত্যাগত হইলেন না। অবশেষে রজনীকান্ত এতই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, যে কাহারো নিকট পুত্র কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিতে, তাঁহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। এদিকে প্রভাবতী স্বামীকে শুভকার্য্য শীঘ্র সম্পাদন করিবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। একদিবস তিনি রজনী-কান্তকে বলিলেন, 'কি গো! তুমি যে চুপ্ করে আছ? আস্ছে মাসে, বিবাহের ভাল দিন আছে। সব যোগাড় যন্ত্র কর।'

রজনীকান্ত একটু বিরক্তিরভাবে উত্তর করিলেন। 'ঢেঁকীর সঙ্গে খোজ নেই, ধান্ বান্তে সাধ! পাত্র পাত্রীর খোজ নেই, ছেলে মেয়ের বিবাহ দিচ্ছ! বেশ রঙ্ কচ্চ্, না?'

প্রভা। তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি যোগাড় কর্ব্বে, না তো কি আমি কর্ব্ব? একরত্তি ছেলে যা পারে, তোমার সাধ্যে তাও কুলোয় না। আবার বলা হচ্ছে কিনা, রঙ্ কচ্চ্! আমি তোমার ওসব কিছু শুন্তে চাইনে। মোদ্দা আমি সাম্‌নে মাসেই ছেলে মেয়ের বিবাহ দিব। ভাল চাও তো পাত্র পাত্রী ঠিক্ করো। নইলে বুঝ্ আছে।

রজনা। তোমার যে ছেলে আর যে মেয়ে! এমন ছেলে মেয়ের সম্বন্ধ জুটবে না তো জুটবে কার? আচ্ছা রত্নগর্ভাই বট।

প্রভা। বটেরে মিন্‌ষে! আবার আমার দোষ দেওয়া হচ্ছে! আমার ছেলে মেয়ে, তোমার কি কেউ না?

রজনীকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'সেই জন্যই তো এত মাথা ব্যথা।'

অতঃপর নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন। 'মেয়েটার বিষয়ে যা হ'ক, এখনও বেশী দূর গড়ায় নি। হয়তো সংশোধন হ'লে হ'তে পারে কিন্তু ছেলেটা হয়েছে, একটা ভয়ঙ্কর মাতাল, লম্পট। তার উপর প্রকাণ্ড গণ্ডমূর্খ!'

তৎশ্রবণে প্রভাবতী বলিলেন, 'যেমনি বাপ্ তেমনি বেটা। বাপ্ পণ্ডিত হলে, ছেলেও পণ্ডিত হতো।'

রজনীকান্ত পত্নীর মধুর কথায় একেবারে আপ্যায়িত হইয়া গেলেন। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া, নিরীহ ভাল মানুষটীর মত এক পায়ে, দুই পায়ে, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নববধূ কমলকুমারী

দিনের পর দিন গডাইতে লাগিল। রজনীকান্ত পুত্র কন্যার বিবাহের আর কোন চেষ্টা করিলেন না। প্রভাবতী তদ্বিষয়ে কিছু বলিলে, রজনীকান্ত কোন উত্তর করিতেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া, প্রভাবতী বাচস্পতি মহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহার দ্বারা একজন ঘটক নিযুক্ত করাইলেন। বিবাহাদি ব্যাপারে ঘটক মহাশয়দের শক্তি অসাধারণ। তাহারা নিতান্ত অসাধ্যকেও সুসাধ্য করিতে পারেন। বিষ্ণুপুর হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বিল্বপুর গ্রামে, কোন দরিদ্র বিধবার বিবাহ যোগ্যা একটী কন্যা ছিল। সে অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত স্বীয় তনয়ার বিবাহ দিতে পারে নাই। ঘটক মহাশয় যাদুমন্ত্রদ্বারা বিধবাকে বশীভূত করিয়া, তাঁহার কন্যা কমলকুমারীর সহিত যতীশচন্দ্রের সম্বন্ধ সুস্থির করিলেন। ক্ষেমদার সম্বন্ধের জন্যও ঘটক মহাশয়কে বিশেষ ভাবনা করিতে হইল না। কোন লম্পট মদ্যপায়ী বৈদ্যসন্তানকে অর্থের

প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া, তাঁহার সহিত ক্ষেমদার সম্বন্ধ সুস্থির করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর শুভদিনে, শুভক্ষণে, যতীশচন্দ্রের ও ক্ষেমদার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

পুত্রবধূ গৃহে পদার্পণ করিবা মাত্রই প্রভাবতী সমস্ত কার্য্যভার তাঁহার উপর সমর্পণ করিয়া, নিজে অবসর গ্রহণ করিলেন। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া কমলকুমারী সংসারের সমস্ত কার্য্যই একহস্তে নির্ব্বাহ করিতেন। পুত্রবধূ বলিয়া প্রভাবতী তাঁহার উপর বিন্দুমাত্রও দয়া প্রকাশ করিতেন না। গৃহকর্ম্মে সামান্য ত্রুটি হইলেও প্রভাবতী কমলকুমারীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন। স্বামিগৃহে আসিয়া কমলকুমারী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শাশুড়ীর চরিত্র বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কমলকুমারী সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেন।

বিবাহের পর, যতীশচন্দ্র প্রথম প্রথম কমলকুমারীকে বড়ই ভালবাসা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পূর্ব্বস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, কুপল্লীতে গমনাগমন বন্ধ করিলেন এবং কমলকুমারীকে প্রায়ই চোখের আড় করিতে চাহিতেন না। স্বামীর আদর ও ভালবাসা পাইয়া কমলকুমারী হাসিতে হাসিতে গৃহের সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। শাশুড়ীর পরুষ বচনেও তাঁহার বড় কষ্ট বোধ হইত না। কিন্তু হায়! কমলকুমারী যাহাকে স্বামীর ভালবাসা মনে করিতেন, তাহা যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির লালসা মাত্র, তাহা তিনি একেবারেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল। তৎপর যতীশচন্দ্র ধীরে ধীরে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে যতীশচন্দ্র কমলকুমারীকে ভুলেও রূঢ় কথাটি বলিতেন না। এখন কটূক্তি ছাড়া তাঁহার মুখে বড় অন্যরূপ কথা শুনা যাইত না। পূর্ব্বে তিনি একে-

বারেই কমলকুমারীর কাছ ছাড়া হইতেন না। এখন অধিক রাত্রির পূর্ব্বে, প্রায়ই বাটীতে প্রত্যাগত হন না। সকলকে আহার করাইয়া কমলকুমারী প্রত্যেহ রজনীতে গৃহ অর্গলাবদ্ধ করিয়া, একাকিনী শয়ন করিয়া থাকিতেন। যতীশচন্দ্র দ্বিপ্রহর, আড়াই প্রহর, কখন বা একেবারে শেষ রজনীযোগে নেশায় বিভোর হইয়া বাটীতে উপস্থিত হইতেন। কমলকুমারীর উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতে বিলম্ব হইলে, যতীশচন্দ্র তাহাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেন। কোন কোন দিন বা অজ্ঞানাবস্থায় শয্যার উপর বমন করিয়া দিতেন। পরদিবস কমলকুমারীকেই বিছানাপত্র পরিষ্কার করিতে হইত। এই সময় হইতে তিনি প্রায় সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকিতেন। এবং তদ্দরুণ সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে, তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় আসক্তি রহিল না এবং প্রায় প্রতিকার্য্যেই ভুল চুক হইত। তাহাতে প্রভাবতী তাঁহাকে নানারূপ কর্কশ ভাষায় গালাগালি করিতেন। পূর্ব্বে প্রভাবতীর তিরস্কার কমলকুমারী নীরবে সহ্য করিতেন। এখন তিনি অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন না। গৃহকর্ম্ম করিয়া কোন সময়ে একটু অবকাশ পাইলেই কমলকুমারী নীরবে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। তাহাতে প্রভাবতীর মেজাজ আরো গরম হইয়া উঠিত। কমলকুমারীকে ক্রন্দন করিতে দেখিলে প্রভাবতী তাঁহার উপর গর্জ্জিয়া উঠিয়া নানারূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিতেন। 'বাঘিনী হেন শাশুড়ীর হাতে পড়িয়া, দুঃখিনী কমলকুমারী কাঁদিবারও স্বাধীনতা পাইতেন না।'

এইরূপে দিনের পর দিন গড়াইতে লাগিল। ক্রমে স্বামীর দোষে কমলকুমারীর শরীরে প্রমেহ, প্রদর প্রভৃতি নানারূপ উৎকট রোগের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কমলকুমারী প্রথম প্রথম সে সব

কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু রোগ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হাত পা জ্বালা, মাথাধরা প্রভৃতি উপসর্গগুলি তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় অধিকার করিতে আরম্ভ করিল এবং প্রায় সর্ব্বদাই জ্বর হইত। তজ্জন্য গৃহের কাজকর্ম্ম করিতে তাঁহার নিরতিশয় কষ্ট বোধ হইত। কিন্তু আপনার শারীরিক অবস্থা শাশুড়ীর নিকট প্রকাশ করিতে তাঁহার ভরসা হইল না। বিনা চিকিৎসায় তাঁহার শরীর দিন দিনই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে একদিবস স্বামীর নিকট আপনার পীড়ার কথ প্রকাশ করিতে হইল কিন্তু যতীশচন্দ্র ভাল মন্দ কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। এমন কি, এরূপ অবস্থায়ও তাহার হুকুম তামিল করিতে একটু বিলম্ব হইলে, তিনি কমলকুমারীকে প্রহার করিতেও ক্রটি করিতেন না। ভয়ে ভয়ে কমলকুমারী মরিয়া বাঁচিয়া সংসারের সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, যে তিনি উঠিয়া বসিতেও কষ্টবোধ করিতেন সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

একদিবস, প্রভাতে কমলকুমারীর শরীর এতই অবশ হইয়া পড়িল, যে তিনি অশেষ চেষ্টা করিয়াও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে ক্ষেমদা আসিয়া তাহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিল। কিন্তু কমলকুমারী তাহাতেও গাত্রোত্থান না করাতে ক্ষেমদার নিরতিশয় ক্রোধ জন্মিল। সে আর কালবিলম্ব না করিয়া জননীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। প্রভাবতী পুকুরপারে বসিয়া প্রভাতী বায়ু সেবন করিতেছিলেন। ক্ষেমদা তথায় উপস্থিত হইয়া, জননীকে সম্বোধন করিয়া শশব্যস্তে বলিল, 'মা! মা! দেখে যাও, বউঠাকরুণ এখনো

শুইয়ে আছে। আমি এত ডাক্‌লুম—বল্লুম্ শীগ্‌গির শীগ্‌গির উঠ, মা এসে বক্‌বে, তাতে একটু গ্রাহ্য কর্ল্লে না।'

ক্ষেমদার কথায় কমলকুমারী গাত্রোত্থান করেন নাই, শুনিতে পাইলে, প্রভাবতীর কতদূর ক্রোধ হইত বলা যায় না, কিন্তু প্রভাবতীর দোহাই শুনিয়াও যে সে গাত্রোত্থান করে নাই, তাহা শুনিতে পাইয়া প্রভাবতীর অতি অপরিমিত ক্রোধ জন্মিল। বলিলেন, 'কি, গ্রাহ্য কর্ল্লে না, চল্ দেখাচ্ছি।'

এই বলিয়া প্রভাবতী রোষকষায়িতলোচনে অনতিবিলম্বে যাইয়া কমলকুমারীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সজোরে ধাক্কা দিয়া ক্রোধভরে বলিলেন, 'কিলা, বাঁদী এখনও শুইয়ে আছিস্ যে!'

ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কমলকুমারী অতিকষ্টে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু তথা হইতে উঠিয়া যাইতে তাঁহার শক্তিতে কুলাইল না। থর্ থর্ করিয়া সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। প্রভাবতী পুনরায় বলিলেন, 'কিলা, আবার ব'সে রইলি যে! উঠ্‌লি নে? বড়ই সুখ লাগ্‌ছে, না?'

কমলকুমারী নিতান্ত শঙ্কিতভাবে উত্তর করিলেন, 'মা! আজ সকাল হ'তে, আমার বড়ই অসুখ বোধ হচ্ছে। সমস্ত শরীরটা কাঁপ্‌ছে। তাই উঠ্‌তে পাচ্ছিনে।

প্রভা। কি বল্লি! অসুখ করেছে? এ বয়সেই তোমার যত অসুখ। আমার সঙ্গে চালাকি! রসো, মজা দেখাচ্ছি।

এই বলিয়া প্রভাবতী ক্ষেমদাকে বলিলেন, 'যা তো মা! ঝাঁটা গাছটা নিয়ে আয় তো, ওর কেমন অসুখ করেছে, একবার দেখে নি।'

ক্ষেমদা এই সমস্ত কার্য্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। অধিকন্তু কমলকুমারী

সেই সময় তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর না দেওয়ায়, সে তাহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিল। সুতরাং জননীর আজ্ঞা পাওয়া মাত্র, সে দৌড়িয়া যাইয়া শতমুখী লইয়া উপস্থিত হইল।

প্রভাবতী সম্মার্জ্জনী হস্তে দানবীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুনরায় কমল-কুমারীকে বলিলেন, 'ভালস্তরে বল্‌ছি, এখনো ওঠ্। নইলে আজ তোর পিঠের চামড়া রাখ্‌বো না, বেহায়া, হারামজাদি, মাগী।'

তৎশ্রবণে রজনীকান্ত প্রভাবতীকে বলিলেন, 'কি! তুমি গালা-গালি কর্চ্ছ কাকে?'

প্রভাবতী মুখখানি ত্রিভঙ্গিমঠাম করিয়া উত্তর করিলেন, 'আর কাকে! তোমার সাধের পুত্রবধূকে।'

রজনী। ও বেচারীর আবার কি অপরাধ হলো?

প্রভা। কমই বা হয়েছে কি? গৃহস্থের বৌ, অত বেলা পর্য্যন্ত শুইয়ে থাকা কেন? কাজ কর্ম্ম পড়ে রইল, হুঁস নেই। আবার বুজ্‌রুকি ক'রে বলা হচ্ছে কিনা, অসুখ করেছে।

রজনী। অসুখ ক'রে থাকে, তোমরাই না হয় কাজ কর্ম্মটা ক'রে নিলে। ও বেচারীকে জ্বালাতন করা হচ্ছে কেন?

প্রভা। হচ্ছে আমার সখে। আহা! কথা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে যায় আর কি! আমরা সবে খাট্‌বো, আর ওহারামজাদি বসে বসে খাবে।

রজনী। এ তোমার কি রকম কথা? অসুখ হ'লে কোথায় তোমরা তার পরিচর্য্যা কর্ব্বে, না তাকেই আবার কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে বলছ!

প্রভা। কে বল্লে অসুখ করেছে! ওসব বুজ্‌রুকি আমি ঢের বুঝি। কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে হলেই আজ কালকার বাঁদীদের যত অসুখ ধরে।

রজনী। সে কি তবে মিছে কথা বল্‌ছে? ওর চেহারার দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লেই তো হয়, পূর্ব্বেই বা কি ছিল, এখনই বা কি রকম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আর বেচারী কর্ব্বেই বা কি? সারাদিনের মধ্যে একটু শ্বাস ফেল্‌বার অবকাশ পায় না। তার উপর ঐ পাষণ্ডটার জন্য কতরাত্রি জেগে থাকে, কত লাঞ্ছনা ভোগ করে। তাতে মনে একটু শান্তি নেই। এরূপ হ'লে কি মনুষ্যের শরীর ভাল থাক্‌তে পারে?

প্রভাবতী মিষ্টি মিষ্টি করিয়া বলিলেন, 'তোমার এত দরদ হ'য়ে থাকে, একজন রাঁধুনী রাখ্‌লেই তো হয়। তা হ'লে আমি আর ওকে কিছু বল্‌বো না। যে বেটার একটা বামুনের মাইনে দিবার মোরাদ নেই, তার আবার অত কথা কেন?'

রজনীকান্ত পত্নীর কথার আর কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইলেন না। প্রভাবতীর আদেশ মত কমলকুমারীকে তদ্দণ্ডেই উঠিয়া, গৃহকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। এবং এই ঘটনা হইতে কমলকুমারীর অদৃষ্ট আরো শোচনীয় হইয়া উঠিল। রজনীকান্ত পুত্র-বধূর প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য প্রভাবতীর উপর অসন্তোষ প্রকাশ করা'তে, প্রভাবতী কমলকুমারীর উপর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে তিনি কমলকুমারীকে আরো অধিক মাত্রায় যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দুঃখিনী কমলকুমারী শাশুড়ীর সমস্ত অত্যাচারই নীরবে সহ্য করিতেন। নীরবে অশ্রুবিন্দু কমলকুমারীর নয়নপ্রান্ত দিয়া গড়াইয়া পড়িত। নীরবে কমলকুমারী অঞ্চল দ্বারা তাহা মুছিয়া ফেলিয়া, আপনার দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

——০O০——

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুবোধচন্দ্রের উন্নতি, কমলকুমারীর দুর্দ্দশা।

এদিকে সুবোধচন্দ্রের পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মান সম্ভ্রমও দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গ্রামের ধনী নির্ধন ছোট বড় সকলেই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অমুকের ছেলেটির তিন রাত্রি, জ্বর বিরাম হয় নাই, সুতরাং তিনি আসিয়া সুবোধচন্দ্রের যথেষ্ট সম্মান ও সুখ্যাতি করিলেন। ভবতারিণীর চারি বছরের মেয়ে পটলা, রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে চমকে উঠে, সুতরাং ভবতারিণী আসিয়া, হেমলতার নিকট সুবোধচন্দ্রের বিস্তর গুণ বর্ণনা করিল। আফিমখোর চণ্ডী ঠাকুরদাদার বেশী নিদ্রা হয় বলিয়া চণ্ডী ঠাকুরদাদার সোহাগিনী অভিমান করিয়া বসিয়া আছেন সুতরাং চণ্ডী ঠাকুরদাদা আসিয়া সুবোধচন্দ্রের হস্ত দু'খানি যজ্ঞোপবীত দ্বারা জড়াইয়া ধরিলেন। দেও, চণ্ডী ঠাকুরদাদাকে যা হয় একটা কিছু ঔষধ দেও। এইরূপে স্বার্থের গন্ধ পাইয়া, গ্রামের স্ত্রী পুরুষ,

কেহ দুইটী মিষ্ট কথা বলিয়া, কেহ কেহ বা একটু মোসাহেবী বরফ ঢালিয়া, সুবোধচন্দ্রের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিলেন। ঝুম্‌কো পিসী মঙ্গলা ঠাকুরঝি প্রভৃতি গিন্নি সম্প্রদায়, যাহারা পূর্ব্বে প্রভাবতীর পক্ষ হইয়া হেমলতা ও গিরিজাসুন্দরীর উপর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না, তাহারও এখন অবলীলাক্রমে গিরিজা-সুন্দরী ও হেমলতার কর্ণকুহরে মধুসিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলেন। অহাতে প্রভাবতী ঝুম্‌কো পিসী প্রভৃতির উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। হেমলতা ও গিরিজাসুন্দরীর উপরও তাঁহার নিরতিশয় ক্রোধ জন্মিল। প্রভাবতী ঝুম্‌কো পিসী প্রভৃতির উপর রাগ করিয়া সহজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সুতরাং সমস্ত রাগ হেমলতা ও গিরিজাসুন্দরীর উপরই গড়াইয়া পড়িল।

এই সময় হইতে সেনবাড়ীতে পুনরায় নিত্য দ্বন্দ্ব কলহ চলিতে লাগিল। কোন না কোন একটা ছল ধরিয়া, প্রভাবতী প্রায় সর্ব্বদাই হেমলতা ও গিরিজাসুন্দরীকে গালাগালি করিতেন। ক্ষেমদাও জননীকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিত এবং ইহাতে তাহার স্ফূর্ত্তির পরিসীমা থাকিত না। গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া যে সমস্ত আবর্জ্জনা বাহির হইত, ক্ষেমদা প্রভাবতীর ইঙ্গিত অনুসারে তৎসমুদয় সুবোধ-চন্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণে ছড়াইয়া ফেলিতেন। ইহার পর প্রভাবতী ও ক্ষেমদা প্রত্যহ আহারান্তে উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও ক্রোধের উপশম না হওয়ায়, প্রভাবতী গিরিজাসুন্দরীর গৃহের সম্মুখে ভাতের মাঁড় ও রন্ধনশালার আবর্জ্জনাদি নিক্ষেপ করিবার জন্য কমলকুমারীর উপর হুকুমজারী করিলেন। কিন্তু কমলকুমারী প্রাণান্তেও শাশুড়ীর এই আদেশ পালন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তজ্জন্য কমলকুমারীকে অনেক

লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল। অগত্যা, প্রভাবতী স্বীয় তনয়ার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। প্রভাবতী কমলকুমারীকে গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার নিকট যাইতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কমলকুমারী যতদূর পারিলেন, প্রভাবতীর এ আদেশ পালন করিলেন। ক্রমে তাঁহার যন্ত্রণারাশি এতই বৃদ্ধি পাইল, যে তিনি আর একস্থানে একাকিনী বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। সুবিধা পাইলেই কমলকুমারী শাশুড়ী ও ননদিনীর অজ্ঞাতসারে হেমলতার গৃহে গমন করিতেন এবং প্রাণের আয়াস মিটাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, আপনার দুঃখভার কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়া,আসিতেন। হেমলতা ও গিরিজাসুন্দরী, উভয়েই কমলকুমারীকে ভালবাসিতেন। হেমলতা কমলকুমারীকে পাইলেই আদর করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ক্রোড়ে বসাইতেন এবং নানারূপ স্নেহমাখা বচনে তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের যত্ন করিতেন। মাতৃস্নেহের অমৃতময় আস্বাদন পাইয়া, দুঃখিনী কমলকুমারীর শোকাবেগ উথলিয়া উঠিত। তিনি হেমলতার বক্ষে বদন রক্ষা করিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে থাকিতেন।

এক দিবস বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হেমলতা গৃহে বসিয়া গিরিজাসুন্দরীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় কমলকুমারী তথায় উপস্থিত হইলেন। হেমলতা আদর করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ক্রোড়ে বসাইলেন। তৎপর বলিলেন, 'তোমার চেহারা এরূপ খারাপ দেখা যা'চ্ছে কেন মা? কোন অসুখ করেছে?'

কমলকুমারী কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। তদ্দর্শনে হেমলতা বলিলেন, 'মনঃকষ্ট ক'রে কি কর্ব্বে মা! এতে আরো শরীর খারাপ হবে

বইত নয়। ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখেন, তা'তেই তুষ্ট থাক্‌তে হয়। অদৃষ্টে থাক্‌লে, এখনো সুখ হ'তে পারে।'

কমল। না মা! আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। অনেক সহ্য করেছি, আর পারি নে। মানুষে কত সইতে পারে মা!

কমলকুমারীর কথা শুনিয়া হেমলতার বড়ই কষ্ট বোধ হইল। কমলকুমারীকে প্রবোধ দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি নিজেই অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না।

এদিকে ক্ষেমদা কমলকুমারীকে দেখিতে না পাইয়া, সে এঘরে ওঘরে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে হেমলতার ক্রোড়ে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, 'কি লা বউ! তুই এখানে বসে কি কচ্ছিস? রাখ্, মার কাছে ব'লে, আজ তোর কি হালটা করি দেখ্‌তে পাবি।'

এই বলিয়া ক্ষেমদা নিতান্ত উৎসাহের সহিত জননীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। প্রভাবতী আহারান্তে সুখনিদ্রা সম্ভোগ করিতেছিলেন। ক্ষেমদা তাঁহাকে জাগরিত করিয়া শশব্যস্তে বলিল, 'মা! শীগ্‌গির উঠে দেখে যাও। তুমি বউকে ওদের সহিত কথা বল্‌তে নিষেধ করেছ। দেখ এসে, বউ ওদের সঙ্গে কেমন ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বল্‌ছে; আর কত কি তোমার নিন্দা কর্‌ছে।'

ক্ষেমদার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই প্রভাবতী ক্রোধভরে শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং একখানা সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া হুহুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কমলকুমারী ক্ষেমদার কথা শুনিয়াই তথা হইতে চলিয়া আসিতেছিলেন। প্রভাবতী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কমলকুমারীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া গর্জ্জিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কিলা মাগী! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা। আমার

বারণ শুনিস্ নে। তোর যত পীরিত ঐ আটকুড়ীদের সঙ্গে। দেখি, কোন আটকুড়ী এখন তোকে রক্ষা করে।'

এই বলিয়া প্রভাবতী সম্মার্জ্জনী দ্বারা কমলকুমারীর বুকে, পৃষ্ঠে, মুখে, সজোরে প্রহার করিতে লাগিলেন। কমলকুমারী 'মাগো! গেলুম গো' বলিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন। রজনীকান্ত বহির্ব্বাটী হইতে উপস্থিত ব্যাপার দর্শন করিয়া, দৌড়িয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পত্নীর হস্ত হইতে সম্মার্জ্জনী গাছটি কাড়িয়া নিয়া তাঁহাকে বলিলেন,'একেবারে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হয়েছ নাকি? বউকে এরূপ ভাবে প্রহার কর্ত্তে আরম্ভ করেছ, তোমার লজ্জা করে না?'

প্রভা। বেশ করেছি। ও হারামজাদি কেমন ক'রে ওদের কাণাঘুষি কথা নেয়, আজ তা ভাল ক'রে দেখে নিব।

রজনী। তা নেবে বই কি। একটা না একটা কিছু গোলমাল না ক'রে আর তো দু' দণ্ড শান্তিতে থাক্‌তে পার না। আচ্ছা লক্ষ্মীটিই আমার ঘাড়ে চেপেছ যা হ'ক!

প্রভা। আমার বউ, আমার যেরূপ ইচ্ছা শাসন কর্ব্ব, তাতে তোমার কি?

রজনী। মেয়েটি আছে, তাকে শাসন কর্ত্তে পার না? না; তা হ'লে সমানে সমান খেতে হয়।

প্রভা। বটেরে ড্যাক্‌রা! যতই কিছু বল্‌ছিনে, ততই তোমার মুখ বেড়ে যাচ্ছে। আজ ওকে মেরে কুট্‌পাট্ কর্ব্ব। কার বাবা বেটীর সাধ্য, আমায় বারণ করে।

এই বলিয়া প্রভাবতী রোষভরে পুনরায় কমলকুমারীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু রজনীকান্তের জন্য সে সাধ, পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রজনীকান্ত কমলকুমারীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন,

'এস মা! এই বাঘিনীর কাছ থেকে, আর কেন মার খেয়ে মর্ব্বে। তোমার অদৃষ্ট খারাপ না হ'লে আর কি এই ঘরে আস!'

এই বলিয়া রজনীকান্ত কমলকুমারীকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে, প্রভাবতী গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতাকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'এই বাড়ীর চক্‌খেকো মাগীরা যে পরের ঘরের বৌকে এমন কুমন্ত্রণা দেয়, ওদের ভালবাসার ধনের মাথা খেতে, পরমেশ্বর কি ওদিগকে একটু আক্কেলও দিয়েছিল না?'

বিনা অপরাধে কমলকুমারীকে ওরূপ ভাবে প্রহার করিতে দেখিয়া, গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতা প্রভাবতীর উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এমন সময় প্রভাবতীর কটূক্তি তাঁহাদের অন্তঃকরণে লৌহশলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইল। গিরিজাসুন্দরী, আজ কিছুতেই প্রভাবতীর বাক্যবাণ নির্ব্বিবাদে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রভাবতীকে বলিলেন, 'দেখ, বড় বৌ, তুমি রোজ রোজ আমাদিগকে এত জ্বালাতন কর, তবু আমরা তোমাকে কিছু বলি না। এখন ব'লে দিচ্ছি, আর অনর্থক আমাদিগকে এরূপ গালাগালি করো না। তা হ'লে সমানে সমান শুনতে হবে।'

প্রভা। দ্যাখ্‌ ভাতারখাকী বেশী বক্‌ বক্‌ করিস্‌ নে। ফের কিছু বল্‌বি তো, আচ্ছা ক'রে দেখিয়ে দেব।

গিরি। কেন, তুমি কোথাকার কে? রোজই বল, দেখিয়ে দেবে। দেখাও তো? না দেখা'য়ে যদি ভাত খাও, তবে কিছু দিব্যি লাগে।

ঝুমকো পিসী সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। গিরিজাসুন্দরীর কথার পোষকতা করিয়া তিনি বলিলেন, 'বেশ কথা। সুধু মুখে বড়াই

কল্লে´, কি হ'য়ে থাকে। যদি ওকিছু দেখিয়ে দিতে পারে, তা হলেই আমরা পাঁচ জনে বুঝি, যে ওঁর কিছু ক্ষেমতা আছে।'

প্রভাবতী ঝুম্‌কো পিসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আমলো! এই পোড়ারমুখী ডাইনী আবার এলো কোথা হ'তে? আ মরি মরি, কি রূপের ধ্বজা!'

প্রভাবতী এই কথা বলিয়া, চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতেই 'কি, কি বল্লি' বলিয়া ঝুম্‌কো পিসী হাত নাড়িয়া প্রভাবতীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন ঝুম্‌কো পিসী ও প্রভাবতীর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। ঝুম্‌কো পিসী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রভাবতীর ব্যূহ ভেদ করিয়া ফেলিলেন। গিরিজাসুন্দরী প্রভৃতির চক্ষের উপর পরাস্ত হওয়াতে, প্রভাবতীর মনঃকষ্টের পরিসীমা রহিল না। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া চক্ষের জলে হাপুস্ হুপুস্ করিতে লাগিলেন।

-০ঃ০ঃ০ ——

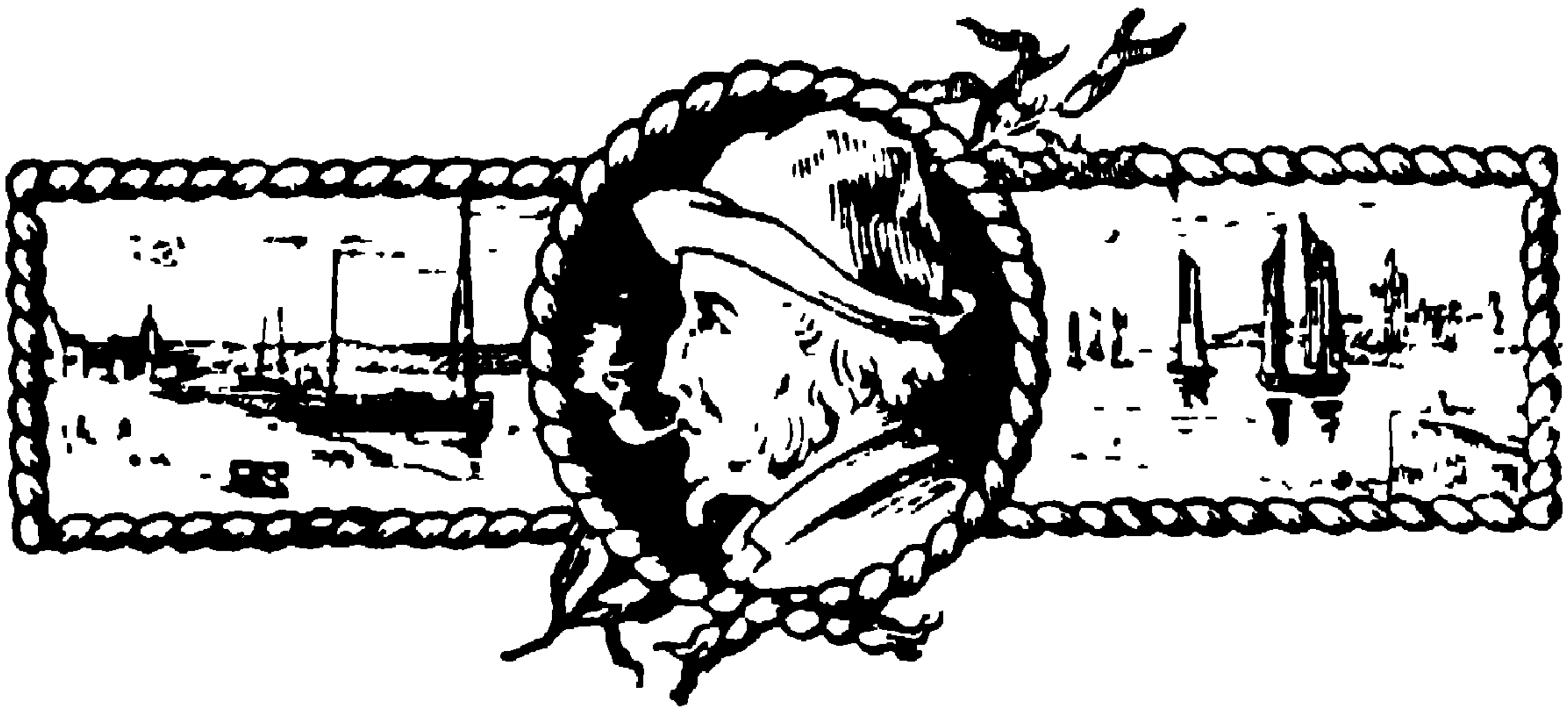

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বামী-সোহাগিনী।

ক্ষোভে দুঃখে প্রভাবতীর সারারাত্রি নিদ্রা হইল না। গিরিজাসুন্দরী তাঁহার মুখে মুখে প্রতিবাদ করাতে প্রভাবতীর মানের গোড়ায় বড়ই গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। মনের আক্রোশে প্রভাবতী গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতাকে প্রতিকার্য্যেই উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। কখন বা সুবোধচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ কটু ভাষায় গালাগালি করিতেন। গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতা, প্রভাবতীর বাক্য-বাণ অনেক সময়েই নীরবে সহ্য করিতেন। কিন্তু সুবোধচন্দ্রকে কিছু বলিলে, তাঁহাদের যন্ত্রণা অসহ্য হইত। হেমলতা অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিতেন না। সুবোধচন্দ্র ভ্রাতৃবধূর ব্যবহারে একদণ্ডও বাড়ীতে শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না; এবং প্রায় সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে থাকিতেন। তজ্জন্য গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতা, উভয়েই বড় কষ্টানুভব করিতেন।

এক দিবস, বেলা অপরাহ্ণ সময়ে সুবোধচন্দ্র সাংসারিক বিবাদ বিসংবাদে বিরক্ত হইয়া নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে বসিয়া আছেন, তদ্দর্শনে হেমলতা ধীরে ধীরে যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তৎপর তাঁহাকে বলিলেন, 'আর সর্ব্বদা মন খারাপ ক'রে থেকো না। ওতে কিছু লাভ হবে?'

সুবোধ। লাভ হবে না সত্য, কিন্তু আর সহ্য হয় না। ইচ্ছা হয়, সংসার ছেড়ে এক দিকে চলে যাই!

হেম। ছিঃ! ও কথা মুখে এনো না। সংসারে থাক্‌তে হ'লে, কত সময় কত লাঞ্ছনা ভোগ কর্ত্তে হয়।

সুবো। যদি এর একটা সীমা দেখ্‌তুম, তা হলেও মনকে কতকটা আশ্বস্ত কর্ত্তে পার্ত্তুম। তা দূরে থাক্, দিন দিনই যেন আরো বৃদ্ধি হচ্ছে।

হেম। তা ত বুঝি। তাই ব'লে দিন রাত্রি দুশ্চিন্তা কর্লে, আরো শরীর খারাপ হবে বইতো নয়? পৃথক্ হওয়ার পর বেশ কয়দিন ভাল ছিল। ভেবেছিলুম, এই হ'তে বুঝি সংসারে শান্তি এলো। আজ কাল যেন একেবারে ক্ষেপে উঠেছে।

সুবো। কেহর উপর কটূক্তি প্রয়োগ কর্ত্তে না পার্লে, উনি শান্তি লাভ কর্ত্তে পার্ব্বেন কেন? ওঁর অভ্যাস এখন প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। তোমাদের উপর মনের ক্ষোভ মিটাইতে না পারিলে, নিশ্চয়ই অন্য কাহাকে, তার ফলভোগ কর্ত্তে হবে।

হেম। দেখাও যাচ্ছে তাই। যখন ঠাকুরঝি বা অন্য কাহারো সঙ্গে কথায় পেরে না উঠে, তখন বৌটার উপর অযথা গালাগালি বর্ষণ করে। কখন বা মারে। আহা! সেই দিন বৌটা এ ঘরে এসেছিল

ব'লে, কি মারটাই না মার্‌লে। ভাগ্যে ঠাকুর এসেছিলেন, তাই রক্ষা। নতুবা মেরেই খুন কর্ত্তো।

সুবো। বউটির অদৃষ্টে যে আরো কত আছে কে বল্‌বে! যদি মরে যেত, তা হলেও বাঁচ্‌তো।

হেম। যা বল্লে, বড় মিথ্যা নয়। ছুঁড়ীটার অবস্থা দেখ্‌লে আমারও মনে তাই হয়। ছুঁড়ীটা দেখ্‌তেও যেমন, কাজ কর্ম্মেও তেম্‌নি লক্ষ্মী। দিনরাতি এত খাটে, তবু ভুলেও এক সময় ওকে দুটো মিষ্টি কথা বলে না। মেয়েটাও হয়েছে এম্‌নি, ছুঁড়ীটাকে মার খাওয়াতে পার্‌লেই যেন, ওঁর গা জুড়ায়।

সুবো। যেমন মা, তেমন ঝি। এখন মেয়েকে কিছু বল্‌ছেন না, এর পর, এর ফলভোগ কর্ত্তে হবে।

হেম। এখনই ওঁর মুখের সাম্‌নে এগুতে পারে কার সাধ্য? কথায় কথায়ই মা'র উপর তেড়ে উঠে। এই, সেই দিন রাগ ক'রে বড় দিদির উপর একটা পিকদানি ছুড়ে মেরেছিল। বউটা সাম্‌নে ছিল, পিকদানি বড়দিদির গায়ে না লেগে, ছুঁড়ীটার মুখের উপর গিয়ে পড়লো। তাতে ওষ্ঠের এক স্থান কেটে গেল। বৌটা মনঃ-কষ্টে কাঁদতে লাগ্‌লো। তাতে বড়দিদি রেগে উঠে, বউটাকে গোটা-কত লাথি লাগিয়ে দিলে।

সুবো। আর ওকথা তুল না। বউটির দুরদৃষ্টের কথা মনে হ'লে, আমি ভেবে দিশেহারা হই। বিধাতা অভাগিনীর অদৃষ্টে এত কষ্টও লিখেছিলেন।

হেম। মেয়ে মানুষ, ঝগ্‌রাটে হিংসুটে হয় সত্য কিন্তু আমি এমন কোথাও দেখি নাই। বউটা দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরেও ভাত পায় না। সকলের খাওয়া হ'লে, পাতে যা উচ্ছিষ্ট থাকে, বউটাকে

তাই খেতে দেয়। তাও সকল দিন অদৃষ্টে জোটে না। একে নানা রকম ব্যারামে ধরেছে, তাতে রীতিমত খেতে না পেয়ে, একেবারেই কাহিল হ'য়ে গেছে। বউটার মুখপানে আর চাওয়া যায় না। সেই দিন, পাতে কিছুই ছিল না ব'লে, বউটা সারাদিন উপোষ ক'রে রইল। আমি তাই জান্‌তে পেয়ে চারুকে দিয়ে গোপনে ডেকে এনে, এক বাটী দুধ্‌ খেতে দিলুম। বেচারী খেতে চাইলে না। বল্লে— না মা, আমি খাব না, আপনারা যে আমাকে দুটো মিষ্ট কথা বলেন, তাতেই আমার ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়।' কথা শুনে, আমার কান্না আস্‌তে লাগ্‌ল। আমি কত ক'রে মাথার দিব্বি দিয়ে, তারপর দুধ্‌টুকু খাওয়ালুম।

বলিতে বলিতে হেমলতার লোচন জলভারাক্রান্ত হইল। তিনি ক্ষণকাল কথা কহিতে পারিলেন না। সুবোধচন্দ্র ইত্যবসরে বলিলেন, 'ছোঁড়াটাও যদি ওকে একটু আদর কর্ত্ত, তা হলেও বেচারীর এতকষ্ট হতো না। স্বামীর ভালবাসা পেলে, স্ত্রীলোক অন্য কষ্ট বড় গ্রাহ্য করে না।'

হেম। আদর কর্ব্বেন! যদি সারাদিন কটু কথা ব'লে, জ্বালাতন না কর্ত্ত, তবু হতো। কিল লাথি জুতো ছাড়া, মুখে ভাল কথাটি নাই। বাপ্‌ মাকেও যে সব কথা ব'লে গালাগালি দেয়, তা ছোট লোকের মুখ দিয়েও বেড়োয় না। ভদ্রলোকের ছেলে পিলে যে, এমন হ'তে পারে, তা আমি জান্‌তুম্‌ না।

সুবোধ। শিক্ষায় কি না হ'তে পারে? সুশিক্ষা পেলে মনুষ্য দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, আবার কুশিক্ষায় নরকের কীট হ'তেও অধম হ'তে দেখা যায়। সর্ব্বদা কুচিন্তা, মাদক সেবন, কুলোকের সহিত মিশামিশি, কুবৃত্তির অনুশীলন কল্লে, নিতান্ত জ্ঞানী লোকের স্বভাবও ক্রমে কলুষিত হ'য়ে পড়ে। ওর হবে, তাতে আর বিচিত্র কি! এই সমস্ত

নরপিশাচেরা কর্ত্তে না পারে, সংসারে এমন কর্ম্ম কিছুই নাই। মনে করি, এসব চিন্তা আর কর্ব্ব না। কিন্তু এক রক্ত মাংসের সম্বন্ধ, মনে আপনা হ'তেই চিন্তা এসে পড়ে।

হেম। যতদিন বেচে আছি, ততদিন কিছু না কিছু ভোগ কর্ত্তেই হবে। তবে এসব দুশ্চিন্তা হ'তে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাল। ঠান্‌দিদি বলেন, জীবনের সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ কর্ল্লে, সংসারে কিছুতেই কষ্ট পেতে হয় না। এইজন্য তাঁর মুখে সদাই হাসি। আহা! আমরাও যদি ঠান্‌দিদির মত হ'তে পার্ত্তুম।

যখন সুবোধচন্দ্র ও হেমলতা পূর্ব্বোক্তরূপে কথোপকথনে মগ্ন, তখন চপলকুমারী বারাণ্ডার দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া, চুপি চুপি তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলেন। হেমলতার কথা শেষ হওয়া মাত্র, তিনি সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চপলকুমারীকে দেখিয়া, হেমলতা স্বামীর পার্শ্ব হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। চপলকুমারী তাহাতে বাধা দিয়া, হেমলতার হাত ধরিয়া, একটু কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিলেন, 'ম্যঁয়নে বুঢঢা নবাব সাহেবকো হাজ্‌রত দিলজানি বেগম সাহেবা, হুকুম ফরমাতে হেঁ, হিয়াঁ খাড়া রহো বাঁদী।'

সুবোধচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, 'তা বাঁদীকে খাড়া না রেখে, বস্‌তে বল্‌লে ভাল হয় না? কোমল পায়ে ব্যথা লাগ্‌বে যে।'

চপল। চুপ্‌ রহ বেত'মজ! দোস্‌রী বাৎ কর্‌নেছে, এক হাজার কোড়া।

সুবো। তা হ'লে আমরাও বুড়ো নবাবের কাছে এত্‌লা দেই গিয়া,—যে নবাব সাহেব, তুমি তোমার বেগমের নয়নবাণে অস্থির হয়েছ। আমরা তার কোড়ার জ্বালায় বাঁচিনে।

চপল। ম্যঁায় ঘাব্‌ড়াতে নেহিন্‌। লেকেন তোম্‌ বেগম সাহেবাকো হুঁকুম নেহি মান্‌তে হেঁ। ইয়া বাঁদী, লাগাও এই কাফেরকো এক হাজার কোড়া।

'আহা এত রঙ্গও জানিস্‌' বলিয়া হেমলতা চপলকুমারীর গণ্ডস্থলে ছোট রকমের একটি ঠকর লাগাইয়া দিলেন। চপলকুমারী খল্‌ খল্‌ হাসিতে লাগিলেন।

সুবোধচন্দ্র হাসিয়া চপলকুমারীকে বলিলেন, 'সে কি বেগম সাহেবা! বাঁদীর নিকট হার মান্‌লে যে!'

চপল। তাই তো! এই বাঁদীটার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। বসোরার বাজার হ'তে এবার আর একটা নূতন বাঁদী খরিদ ক'রে আন্‌তে হবে।

সুবো। তা হ'লে এই বাঁদীটাকে আমার নিকট বিক্রী ক'রে ফেল।

চপল। কত দাম দিবে বল।

সুবো। পাঁচ হাজার আসরফি।

চপল। তবে তোমার কাজ নয়। এমন আচ্ছা বাঁদী। যেমন গুল্‌কা রঙ্‌—গুল্‌কা ঢঙ্‌। তার দাম মোটে পাঁচ হাজার আসরফি! তার চেয়ে বুড়া নবাবকে ভেট্‌ দেই গিয়ে। বহুত বক্‌সিসি পাব।

সুবো। দোহাই তোমার, অমন কাজ করো না। আমার কলিজা ছিঁড়ে যাবে যে।

চপল। বল কি, এত দরদ! তা হ'লে বাঁদীটাকে তোমাকে অমনিই দান ক'রে যাচ্ছি।

অতঃপর হেমলতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'শুন্‌লি বাঁদী, তোকে আমি ঐ বাবুটিকে দান কল্লুম। যা ঐ বাবুর কাছে যা।'

এই বলিয়া চপলকুমারী হেমলতাকে ধাক্কা মাড়িয়া সুবোধচন্দ্রের গায়ের উপর ফেলিয়া দিলেন। হেমলতা তথা হইতে প্রস্থান করিবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। চতুরা চপলকুমারী তাহা বুঝিতে পারিয়া হেমলতার বসনাগ্রভাগ আপনার মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বলিলেন, 'মর্ ছুঁড়ী, তোকে আমি আরো পালাবার সুবিধা ক'রে দিয়েছিলুম যে!

হেম। না দিদি! তুমি যদি ওরূপ দুষ্টামি কর, তা হ'লে আর আমি এখানে থাক্‌বো না।

চপল। ভয় কি? না হয় তোকে আর কিছু নাই বল্লুম। আমি আমার নাতির সঙ্গে গোটা কত কথা বলি, তুই ব'সে ব'সে শোন্।

এই বলিয়া চপলকুমারী সুবোধচন্দ্রকে বললেন, 'তা হ'লে নাতি! আমার নাত্‌নীকে তো তোমায় দান কল্লুম। এখন তাকে কি কি গহনা দেবে বল?'

সুবো। পাঁচ হাজার আসরফিতে যত হয়।

চপল। না ঠাট্টা রাখ। লোকে বলে, তোমার বিস্তর টাকা কড়ি ধন দৌলত হয়েছে। তুমিও বলেছিলে, অবস্থা ভাল হইলেই, আমার নাতবৌকে দুহাজার টাকার গহনা দেবে। এখন সে কথার কি?

সুবো। যা বলেছি, ভগবান্ দিতে দিলে অবশ্যই দেবো। তোমার বল্‌তে হবে কেন?

চপল। তবে আর বিলম্ব ক'রে কাজ কি। স্বর্ণকার ডেকে এখনি বায়না দেও। অমন মোমের পুত্তলীটিকে সোনা দিয়ে ঢেকে রাখতে তোমার সাধ হয় না নাতি?

সুবো। হয় সত্য। তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে, একাজে আমাকে আরো কিছু দিন বিলম্ব কর্ত্তে হচ্ছে। আগে বাবা মায়ের শ্মশানের

উপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ক'রে পুত্রের কার্য্য সম্পাদন করি। তার পরে, দেখা যাবে।

চপল। এই তো তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান! আগে শিবপূজা?— না আগে শক্তিপূজা? স্ত্রী শক্তিরূপিণী। ষোড়শোপচারে শক্তিরূপিণীর পূজা কর। ব্যোমকেশ আপনিই তুষ্ট হবেন।

হেমলতা চপলকুমারীকে বাধা দিয়া বলিলেন, ওমা! তুই বলিস্ কি লো! তোর যত সব কথা!

চপলকুমারী কি বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় বাহিরে কাহার পদধ্বনি শ্রুত হইল। সকলে নিঃশব্দে সেই দিকে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিয়া জলদকোলে মিশিয়া যাইতেছিল। এইরূপ সময়ে বৃদ্ধ শ্যামসুন্দর রায়, বাটীতে চপলকুমারীকে দেখিতে না পাইয়া, লণ্ঠন-হস্তে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। বৃদ্ধ অন্য কোথাও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, সুবোধচন্দ্রের গৃহের সম্মুখে আসিয়া হেমলতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বলি, অ—নাতবৌ, তোদের এখানে এসেছে?

সুবোধচন্দ্র সে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। বলিলেন, 'কি বল্‌ছ ঠাকুর দা! কাকে খুঁজছ?

শ্যাম। আর কাকে! এখনও বুঝ্‌তে পার্চ্ছিস্ না? তোর ঠান্‌দিদিকে।

সুবো। আমার ঠান্‌দি তোমার কে হয়, ঠাকুরদা?

শ্যাম।– চুপ্ রহ ছুঁচো।

সুবো। তা হলে আসে নি।

শ্যাম। না না এসেছে বই কি! তা শীগ্‌গির ক'রে আস্‌তে বল। সেই দু'পর বেলা বেড়িয়েছে, এখনো বাড়ী ফিরে নি। বুড়োকে এমন ক'রেও কষ্ট দিতে হয়।

চপলকুমারী সুবোধচন্দ্রের কাণে কাণে বলিলেন, 'বল না, সে এখন যেতে চাচ্ছে না। না ভাই! তুমি বড় বেরসিক।'

সুবোধচন্দ্র চপলকুমারীর কথামত বলিলেন, 'শোন ঠাকুরদা! ঠান্‌দি বল্‌ছেন, যে উনি এখন যেতে পার্চ্ছেন না।'

শ্যাম। হাঃ হাঃ হাঃ। তা ছেলে মানুষ কিনা, তাই সকল বিষয়েই আবদার নেয়। বল, আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই। আকাশে বড় মেঘ। চারিদিকে ভয়ানক অন্ধকার।

সুবো। আর ঠান্‌দি আসাতে তোমার ঘরও একেবারে অন্ধকার হয়ে গ্যাছে, কেমন, ঠাকুরদা?

শ্যাম। তা—তা—কতকটা হয়েছে বই কি? জান কি, ভায়া! ওরূপের জ্যোতি না দেখ্‌লে আমার চক্ষে যেন সব অন্ধকার ব'লে বোধ হয়।

সুবো। তা হবেই তো, ঠাকুরদা। বুড়ো বয়স কিনা। তা যাই হউক্ না কেন, মোদ্দা ঠানদি এখন কিছুতেই যেতে চাচ্ছেন না।

শ্যাম। না—না—আস্‌তে বল, আস্‌তে বল। এখনি ঝড় আস্‌বে। এর পর যেতে পার্‌বে না।

সুবো। না হয়, নাই বা গেলেন। এখানেই আজ রাত্রিতে থাক্‌বেন এখন। তুমি যাও।

শ্যাম। চুপ্‌ রহ বেল্লিক,—

সুবোধচন্দ্র হাসিয়া চপলকুমারীকে বলিলেন, 'না। এখন যাওগো,

আলোকরূপিণী। ঠাকুরদাদার ঘর রোসনাই কর গিয়া। আর বিলম্ব করো না। ঠাকুরদা বড় চটেছে।'

সুবোধচন্দ্রের কথা শেষ হওয়া মাত্র চপলকুমারী সহসা দরজা খুলিয়া বহির্গত হইলেন। অমনি বিদ্যুৎ চমকিল। বৃদ্ধ ভাল করিয়া সে রূপজ্যোতি দেখিতে না দেখিতে চপলকুমারী মুখে কাপড় দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া আঁধারে মিশিয়া গেলেন। শ্যামসুন্দর রায় 'কই গো, কোথায় গেলে' বলিয়া আকুল প্রাণে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

শ্যামসুন্দর রায় চলিয়া গেলে ক্ষণকাল পর হেমলতা সুবোধচন্দ্রকে বলিলেন, 'তা হ'লে ঠাকুরের শ্মশানের উপর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, আর যা কর্ব্বে ব'লে মনন করেছ, তা ক'রে ফেল।'

সুবো। তাই ভাব্‌ছি, আগে সেই কাজটাই সম্পন্ন করি, না ঠানদি যা বল্লেন, সেই মত কার্য্য করি।

হেম। না না। তুমি ঠানদির কথা শুন না। ওঁর মুখে আড় নেই। হাস তামাসা ছাড়া একদণ্ডও থাক্‌তে পারে না।

সুবো। ঠান্‌দি যাই বলুন না কেন। তুমি আমার গৃহের লক্ষ্মী, তার আর সন্দেহ নাই। তোমার অদৃষ্টেই আমার সমস্ত হয়েছে। তাই তোমার পূজাই আগে কর্ত্তে ইচ্ছা হয়। সংসারের সমস্ত কর্ম্ম একদিকে, আর তুমি একদিকে।

হেমলতা আবেগভরে সুবোধচন্দ্রের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন,—

'সোহাগপ্রদীপ অত বাড়াইও না, আমি গলে যাব যে।'

দশম পরিচ্ছেদ।

মানবী না দানবী ?

হেমলতা স্বামীর নিকট জেদ করিয়া বসিলেন, 'হয় শ্বশুরের শ্মশানের উপর, আগে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা কর, নতুবা আমি তোমার গহনা পত্র কিছুই স্পর্শ করিব না।' সুতরাং সুবোধচন্দ্র পত্নীর কথামত অগ্রে তাহারই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে সুবোধচন্দ্র পিতামাতার শ্মশানের উপর মন্দির স্থাপন করিয়া তাহাতে মহাকালমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে শেষ পর্য্যন্ত মহা আড়ম্বরের সহিতই নির্ব্বাহিত হইল। এই কার্য্যোপলক্ষে সুবোধচন্দ্র গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ মত ভোজন করাইলেন। দীন দুঃখীদিগকে অকাতরে অর্থদান করিলেন। সকলে একবাক্যে সুবোধচন্দ্রের যশোগান করিতে লাগিল। স্ত্রীলোক মহালেও সুবোধচন্দ্রের নামে 'ধন্য ধন্য' পড়িয়া গেল।

প্রজ্বলিত আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। সুবোধচন্দ্রের যশঃ কীর্ত্তন শুনিয়া প্রভাবতীর অন্তস্তল দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। যাহাদিগকে প্রতিকার্য্যে সকলের নিকট ধিক্কৃত ও বিড়ম্বিত হইতে দেখিয়া, প্রভাবতী নিজ বক্ষ শীতল করিবেন বলিয়া, হৃদয়ে কত আশা পোষণ করিতেছিলেন, তাহারাই আবার মান সম্ভ্রম লাভ করিতে লাগিল। যে হেমলতাকে তিনি পথের ভিখারিণী করিয়া নিজে রাজরাণী হইবেন বলিয়া, এতদিন উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন, তাঁহার সংসারই আবার সুখসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ;—প্রভাবতীর কুটিল প্রাণে এত সহিল না। গিরিজাসুন্দরী যে, সেদিন তাঁহার মুখে মুখে প্রতিবাদ করিয়াছেন, প্রভাবতী তাহা ভুলিতে পারেন নাই। ঝুম্‌কো পিসী যে, সেইদিন গিরিজাসুন্দরীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, প্রভাবতী তাহাও সহ্য করিয়াছিলেন কিন্তু আর না। আর সহ্য করা প্রভাবতীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। হেমলতা ও গিরিজাসুন্দরীর হাসিমুখ তিনি অনেক দেখিয়াছেন, দেখিয়া দেখিয়া মরমে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন, এখন কান্না না দেখিতে পারিলে তাঁহার শান্তি কোথায় ?

ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া প্রভাবতী গিরিজাসুন্দরী প্রভৃতির সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য মনে মনে নানারূপ কল্পনা জল্পনা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে সমস্ত উপায়ে গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতাকে জব্দ করিয়া প্রভাবতী মনের আক্রোশ মিটাইতেন, আজ সেরূপ কোন উপায় প্রভাবতীর মনোমধ্যে একেবারেই স্থান লাভ করিতে পারিল না। প্রভাবতী আজ তাহা হইতে অনেক মহত্তর ও বৃহত্তর উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অবশেষে চক্ষের উপর মনের আক্রোশ মিটাইবার এক উৎকৃষ্ট উপায় দেখিতে পাইয়া, আহ্লাদে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ধমনী দিয়া বিদ্যুদ্বেগে শোণিতপ্রবাহ

বহিতে লাগিল। পলকবিহীন চক্ষু দুইটী দেখিতে দেখিতে বর্দ্ধিতায়তন হইল। প্রভাবতী বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, আহ্লাদে ও উৎসাহে অট্টহাসি হাসিয়া হঠাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রজনীকান্ত সম্মুখে ছিলেন। তিনি পত্নীর সেই সময়ের মূর্ত্তি দেখিয়া হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন। ত্রাস্তভাবে বলিলেন,—'একি এ!' পশ্চাৎ হইতে অমনি কে বলিয়া উঠিল,

'আমার বিভূতি—হৃদয়ের প্রতিবিম্ব মাত্র।'

রজনীকান্ত চকিতনেত্রে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে উত্তরকারিণী আর কেহ নহে,—

'তুলসী পাগলিনী।'

পাগলিনী ইত্যবসরে নাচিয়া নাচিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—

'ভয় করো না, ভয় করো না,
ভয় করো না ভাই!
ভাব্‌টী গেল, ধ্যানের গ্রামে,
রূপ্‌টী ধ'রে তাই
উঠ্‌লো ফুটে, সেই ছবিটী
ভেবে দেখ তা;
ভাবেই আমি, মূর্ত্তিমতী
হাঃ হাঃ হাঃ।'

———•○•———

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রমণী না ডাকিনী ?

মনোগত সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া প্রভাবতী আহ্লাদে ও উৎসাহে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার পর প্রভাবতী একদিবস অলক্ষিতে সুবোধচন্দ্রের ঔষধালয়ে প্রবেশ করিলেন। গৃহে টেবিলের উপর কতকগুলি ঔষধের শিশি ছিল। প্রভাবতী দেখিতে পাইলেন, তন্মধ্যে কয়েকটি শিশির গায়ে লাল অক্ষরে—'বিষ'—এই কথা লিখিত রহিয়াছে। প্রভাবতী যে জন্য গিয়াছিলেন, সেই অভিপ্রায় সহজেই সিদ্ধ হইল। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে উহা হইতে একটি শিশি লইয়া তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন। তারপর তিন মাস অতীত হইল। অকস্মাৎ একদিন গিরিজাসুন্দরীর একাদশ বৎসরের পুত্র নরেন্দ্র জ্বরাক্রান্ত হইল। সুবোধ-চন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ডাক্তারিমতে ভাগিনেয়ের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সুবোধচন্দ্র প্রায় অনেক সময়েই বাটীতে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। এইজন্য তাঁহার অনুপস্থিতিতে গিরিজাসুন্দরীই

পুত্রকে ঔষধ সেবন করাইতেন। যে শিশিতে ঔষধ থাকিত, গিরিজা-সুন্দরী সেই শিশিটি একটি সিন্দুকের উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন। প্রভাবতী দুই তিন দিন তাহা লক্ষ্য করিলেন। অতঃপর সুবিধা বুঝিয়া গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতার অনুপস্থিতিকালে, পূর্ব্ববর্ণিত বিষের শিশি হইতে কতটুকু বিষ নরেন্দ্রের ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চলিয়া আসিলেন।

গিরিজাসুন্দরী যথাসময়ে পুত্রকে ঔষধ সেবন করাইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। নরেন্দ্রনাথের শরীর ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিল। শরীরে ভয়ানক জ্বালা উপস্থিত হইল। গিরিজাসুন্দরী পীড়িত পুত্রের অবস্থার হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া যারপরনাই চিন্তাকুল হইলেন। সুবোধচন্দ্র রোগী দেখিবার জন্য অতি প্রত্যুষে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিলেন। গিরিজা-সুন্দরী আকুল প্রাণে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে নরেন্দ্রনাথের শরীরের যন্ত্রণা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া গিরিজাসুন্দরী পুত্রকে আর এক দাগ ঔষধ খাওয়াইলেন। গিরিজা-সুন্দরী সুধা মনে করিয়া পুত্রের মুখে ঔষধ তুলিয়া দিলেন, কিন্তু উহা যে বিষ, অভাগিনী দুঃখিনী জননী তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সুবোধচন্দ্র বাড়ীতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় গিরিজাসুন্দরী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'সুবু ! নরেন জানি আজ কি রকম কর্চ্ছে। তুমি এসে দেখে যাও তো।'

ভগিনীর কথা শুনিয়া সুবোধচন্দ্র তাড়াতাড়ি ভাগিনেয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। গিরিজাসুন্দরী পুনরায় বলিলেন, 'তুমি এই ঔষধটা

কখন বদ্‌লে দিয়েছ জানিনে, সেই লাল ঔষধটা বড় ভাল ছিল। আবার সেইটিই দেও।'

সুবো। বদ্‌লে দিয়েছি, কে বল্লে? দেখি?

এই বলিয়া সুবোধচন্দ্র সিন্দুকের উপর হইতে ঔষধের শিশিটী লইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—উহার রং কালো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ওরূপ রঙ পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, আঘ্রাণ লইবার জন্য শিশিটি নাসিকার নিকট ধরিলেন। অমনি তাঁহার মস্তিষ্ক ঘুরিয়া উঠিল। তিনি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দিদি! দিদি! এ ঔষধ নরেনকে খাইয়েছ নাকি? শীঘ্র বল?'

গিরি। দু'দাগ খাইয়েছি বই কি! কেন?

'হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হয়েছে,—এ যে বিষ' বলিয়া সুবোধচন্দ্র মস্তকে করাঘাত করিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। শিশিতে হাইড্রসেনিক এসিড নামক অতি উৎকট হলাহল মিশ্রিত ছিল, সুবোধচন্দ্র আঘ্রাণ লইবা মাত্রই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুবোধচন্দ্রের কথা শুনিয়া গিরিজাসুন্দরীর মস্তকে অশনি সম্পাত হইল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সুবোধচন্দ্র ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দিদি! কান্না কর্ব্বার ঢের সময় পাবে। তুমি একটু স্থির হ'য়ে ওকে ধ'রে বসো, আমি একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি।'

এই বলিয়া সুবোধচন্দ্র দৌড়িয়া নিজ ঔষধালয়ে গমন করিলেন এবং তাড়াতাড়ি কতকগুলি ঔষধের শিশি ও যন্ত্রাদি লইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল। সে অতি কষ্টে বলিল, 'মা! মা! বড় জ্বালা।'

গিরিজাসুন্দরী দুই হস্তে পুত্রকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,

'বাবা! বাবা! আমার সঙ্গে কথা কও তো বাবা! আমি বড় দুঃখিনী, আমায় ছেড়ে যেও না, বাবা।'

হেমলতা কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া গিরিজাসুন্দরীকে ধরিয়া বসিলেন। সুবোধচন্দ্র তাড়াতাড়ি একটু ঔষধ লইয়া নরেন্দ্রনাথের মুখে ঢালিয়া দিলেন কিন্তু তাহা গলাধঃকৃত হইল না। অতঃপর সুবোধচন্দ্র যন্ত্রের সাহায্যে নরেন্দ্রনাথের পাকস্থলী হইতে সমস্ত টানিয়া বাহির করিয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যন্ত্র তাঁহার মুখগহ্বর দিয়া প্রবেশ করাইতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে সুবোধচন্দ্র ভাগিনেয়ের জীবনরক্ষায় হতাশ হইয়া মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সুবোধচন্দ্রকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া গিরিজাসুন্দরী, চারু-বালা ও হেমলতা একসঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। পাড়াপ্রতি-বাসিনীরা দৌড়িয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কমলকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে সেই স্থানে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। প্রভাবতীর আশা ষোলকলায় পূর্ণ হইল। সকলকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্রনাথের শরীরে ভয়ানক পরিবর্ত্তন পরিল-ক্ষিত হইল। সুবোধচন্দ্র ভাগিনেয়কে রক্ষা করিবার জন্য আরো কত প্রকারে কত কি চেষ্টা করিলেন। গিরিজাসুন্দরী কত দেব দেবীর পূজা মানস করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দুর্ভাগ্য বালক সকলকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া দেখিতে দেখিতে মায়ের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল।

—:—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল।

নরেন্দ্রনাথের অপঘাতমৃত্যুতে গিরিজাসুন্দরীর হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেল। তাঁহার অহর্নিশ বিলাপধ্বনিতে নিতান্ত পাষাণও দ্রবীভূত হইতে লাগিল। অতঃপর ঔষধের শিশিমধ্যে কি প্রকারে বিষ আসিল, তাহা লইয়া পাড়াপ্রতিবাসিনীদের মধ্যে নানারূপ আন্দোলন চলিতে লাগিল। ঔষধের শিশিমধ্যে কেহ বিষ মিশ্রিত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না। অথচ কাহার দ্বারা এই লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পাদিত হইল, তাহা সহসা কেহই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু পাপ অধিক দিন চাপা থাকিল না। প্রভাবতীর কথাবার্ত্তায় ও তাঁহার আচরণে, অবশেষে সকলের সন্দেহই তাঁহার উপর বদ্ধমূল হইল। প্রতিবেসিনীরা সকলেই প্রভাবতীকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলে যে তাঁহাকে সন্দেহ করিতেছে প্রভাবতী তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তাহাতে

তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বরং গিরিজাসুন্দরীর উপর এইরূপে শত্রুতা সাধন করিতে সমর্থ হওয়ায়, তাঁহার মন আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভাবতী বহুকালপর আবার শান্তি ফিরিয়া পাইলেন। উৎসাহ ও মনের স্ফূর্ত্তি তাঁহার সমস্ত শরীর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। পুত্রশোকে গিরিজাসুন্দরীকে আর্ত্তনাদ করিতে দেখিলে, প্রভাবতী হেলিয়া দুলিয়া তাঁহার নিকট দিয়া গমনাগমন করিতেন এবং শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া মুচ্‌কি হাসি হাসিতেন। প্রভাবতীর এইরূপ আচরণ গিরিজাসুন্দরীর হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইত। তখন তিনি বুকে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিতেন।

এদিকে সেনবাড়ীর এইরূপ বিষপ্রয়োগে হত্যার সংবাদ লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া অনতিবিলম্বে থানায় পৌঁছিল। দারগা বাবু একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন। ন্যায় ও আইনসঙ্গত কার্য্য করিতে তিনি কখনও ত্রুটি করিতেন না। সুতরাং কথাটা উড়াইয়া না দিয়া, সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং গোপনে নানালোকের নিকট অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে দারগা বাবুর বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইল না। তদন্ত শেষ করিয়া দারগাবাবু প্রভাবতীর বিরুদ্ধে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার ও রজনীকান্তের বিরুদ্ধে তিনি পঞ্চায়ত হইয়া সেই সংবাদ থানায় না দেওয়ার অপরাধে, এক সঙ্গিন মোকদ্দমা খাড়া করিয়া বসিলেন। একজন কনেষ্টবল দ্বারা দারগা বাবু রজনীকান্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যথাসময়ে রজনীকান্ত উপস্থিত হইলেন। তিনি অপরাধ অস্বীকার করিলেন। তখন দারগা বাবু গিরিজাসুন্দরীর পক্ষে কেহ বাদী হইয়া মোকদ্দমা চালাইবে কিনা, জানিবার জন্য সুবোধচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভ্রাতৃবধূর আচরণে যদিও সুবোধচন্দ্র তাঁহার

উপর নিতান্ত বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছিলেন, তথাপি এ বিষয় লইয়া মোকদ্দমা করিয়া, সংসারে অধিকতর কলঙ্কবৃদ্ধি করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি দারগা বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও রজনীকান্ত নিষ্কৃতি পাইলেন না। দারগা বাবু এক মন্তব্য লিখিয়া পত্নীসহ তাঁহাকে চালান দিলেন। প্রভাবতী মোক্তার দ্বারা হাজির হইলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিল। অবশেষে প্রমাণাভাবে যদিও, তাহারা নিষ্কৃতি পাইলেন কিন্তু তাহাতেও রজনীকান্তের প্রায় পাচশত টাকা খরচ হইয়া গেল।

দিনের পর দিন গড়াইতে লাগিল। গিরিজাসুন্দরীর অশ্রুজলের আর বিরাম হইল না। যে বাটীতে নরেন্দ্রনাথ অকালে কালের গ্রাসে পতিত হইয়াছেন— যে বাটীতে প্রভাবতী রহিয়াছেন—সেই বাটীতে গিরিজাসুন্দরী আর শান্তি ফিরিয়া পাইলেন না। সুবোধচন্দ্রেরও নিতান্ত অশান্তি বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে অন্য কোন উপায়ে মন সুস্থির করিতে না পারিয়া তিনি গিরিজাসুন্দরী, চারুবালা ও হেমলতাকে লইয়া ৺ কাশীধামে চলিয়া গেলেন। মনে করিলেন, তথায় জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান হইতে পারিলে, আর শীঘ্র বাটীতে প্রত্যাগত হইবেন না।

সুবোধচন্দ্র চলিয়া গেলে প্রভাবতী কতিপয় দিবস বেশ নিরুদ্বেগে কাল কর্ত্তন করিলেন। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি কখনো সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। অল্প দিবস যাইতে না যাইতেই প্রভাবতীর পূর্ব্বস্বভাব পুনরায় দেখা দিল। গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতা সম্মুখে না থাকায়, এখন হইতে রজনীকান্ত ও কমলকুমারী, পূর্ণমাত্রায় তাহার ফলভোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে যতীশচন্দ্রের মদগাঁজার আসক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে ইয়ার চাটুকারের দল দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যতীশচন্দ্র অকাতরে দুই হাতে অর্থ ছিটাইতে লাগিলেন। ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্রায় পাঁচশত টাকা খরচ হওয়াতে রজনীকান্ত বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপর যতীশচন্দ্রের অবিরাম অপব্যয়ে তিনি একেবারেই নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন।

যতীশচন্দ্র ইদানীং পিতা মাতাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। রজনীকান্তের অর্থের অনটনের সঙ্গে সঙ্গে যতীশচন্দ্রের সে উপায় বন্ধ হইল। টাকা না পাওয়ায় যতীশচন্দ্র দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। অবশেষে একজন ইয়ারের পরামর্শে যতীশচন্দ্র এক দিবস পিতার বাক্স ভাঙ্গিয়া তাঁহার লগ্নিটাকার খতগুলি লইয়া প্রস্থান করিলেন। এবং দায়ীকদের নিকট যাহা পাইলেন তাহা লইয়াই খত ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। রজনীকান্তের যাহা কিছু শেষ সম্বল ছিল, তাহাও একেবারে নষ্ট হইল। ক্রমে অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইল, যে কায়ক্লেশে উদরান্ন চালাইবারও রজনীকান্তের কোন সংস্থান রহিল না।

অর্থ ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকের শারীরিক অবস্থারও অনেক সময় পরিবর্ত্তন হইতে দেখা গিয়া থাকে। রজনীকান্তেরও তাহাই হইল। ভাবনায় দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর দিন দিনই ক্ষয় পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জ্বর আমাশয়, কাশি প্রভৃতি নানারোগে জড়িত হইয়া রজনীকান্ত শয্যাশায়ী হইলেন। অর্থাভাবে রজনীকান্তের চিকিৎসা ভাল চলিতে লাগিল না। সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া রজনীকান্ত যে টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে পাঁচ শত টাকা তিনি প্রভাবতীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন।

প্রভাবতী তাহার এক কপর্দ্দকও খরচ করেন নাই। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই, এখন তিনি সেই টাকা হইতে রজনীকান্তের চিকিৎসা-খরচ নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু প্রভাবতী তাহা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। রজনীকান্ত প্রভাবতীর কোমল করপল্লব ধারণ করিয়া অনেক অনুরোধ করিলেন, অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই প্রভাবতীর মন ভিজিল না। পক্ষান্তরে, সেই গচ্ছিত টাকা হইতে, এখন সংসারখরচ নির্ব্বাহ করিতে হয় বলিয়া প্রভাবতী দিবানিশি রজনীকান্তকে বাক্যজ্বালায় দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এক এক টাকা খরচ করিতে প্রভাবতীর অস্থিপঞ্জর ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে নিজ তহবিল শূন্য হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, প্রভাবতী কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'কিরে ড্যাক্‌রা! বড়ই বিছানায় শুইয়ে শুইয়ে আরাম কর্চ্ছিস যে। আমাদের খরচপত্র দিবি নে?'

রজনী। কোথা হ'তে দি, বল?

প্রভা। সে কথা আমি কি জানি। চুরি করিস্‌, ডাকাতি কর্‌িস্‌, আজ তোকে দিতেই হবে।

রজনীকান্ত নিতান্ত কাতরভাবে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কেন মিছে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ। আমার কি উঠ্‌বার শক্তি আছে, যে কোন রকমে একটা যোগাড় যন্ত্র কর্ব্বো?'

প্রভা। তুই পুরুষ মানুষ, তুই করবি না তো কি আমি কর্‌বো? মাগকে খেতে দিতে পারিস নে, বিয়ে করেছিলি কোন মুখে?'

রজনীকান্তের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি আর কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। প্রভাবতী আরো ক্ষণকাল তাঁহার

উপর গালাগালি বর্ষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রভাবতী চলিয়া গেলে রজনীকান্ত অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিতে লাগিলেন। এতদিন পর রজনীকান্তের চক্ষু ফুটিল। পত্নীর চরিত্র ও আপনার অবিমৃষ্যকারিতা বুঝিতে পারিয়া রজনীকান্ত অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ভ্রাতৃস্নেহ থাকিয়া থাকিয়া আজ তাঁহার হৃদয়মধ্যে প্রবলবেগে আঘাত করিতে লাগিল। অনাথা ভগিনীর দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া রজনীকান্ত নিতান্ত বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে রজনীকান্তের শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা আরো খারাপ হইয়া উঠিল। রজনীকান্ত শয্যায় পড়িয়া রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। রজনীকান্তের স্ত্রীপুত্র পরিবারের মধ্যে একমাত্র কমলকুমারী ব্যতীত আর কেহই রজনীকান্তের দিকে চাহিয়া দেখিতেন না। কমলকুমারী সময়মত প্রতি দিবস শ্বশুরের পথ্য জল যোগাইতেন; এবং ক্ষিপ্র হস্তে সংসারের কাজ কর্ম্ম সমাধা করিয়া আসিয়া, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। এইরূপে এক দিবস দুই দিবস করিয়া ক্রমে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। অতঃপর প্রভাবতী রজনীকান্তের পথ্যাদির জন্য অনেক বাজে খরচ হইতেছে মনে করিয়া, তাহাও দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহাতে কমলকুমারীর বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু এ বিষয়ে শাশুড়ীকে অনুরোধ করিতে তাঁহার ভরসা হইল না। রজনীকান্তের পথ্যের সময় হইলে কমলকুমারী এক বাটি জল লইয়া শ্বশুরের নিকট গমন করিলেন এবং বাটিটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। রজনীকান্ত সহজেই প্রকৃত বিষয় বুঝিতে পারিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কমলকুমারীকে বলিলেন, 'মা! মা! কেঁদ না। আমার যেমন কর্ম্ম

তেমন ফল ভোগ কর্চ্ছি। তোমার কান্না দেখ্‌লে আমার বুক ফেটে যায়, মা!'

কমলকুমারী কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। কেবল অবিরাম ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, শ্বশুরের পদযুগল সিক্ত করিতে লাগিলেন। সেই দিবস রজনীকান্তের অদৃষ্টে পথ্য জুটিল না। শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া তিনি শয্যার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃস্নেহ

রজনীকান্তের জীবননাটকের সহসা এক ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। পথ্য ও চিকিৎসাভাবে তাঁহার শরীর প্রতিমুহূর্ত্তেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। রজনীকান্ত নিজের শারীরিক অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। আপনার স্ত্রী পুত্র কন্যার চরিত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা রহিল না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে ভ্রাতা ও ভগিনীকে দেখিয়া যাইতে তাঁহার মনোমধ্যে যারপর নাই আগ্রহ জন্মিল। রজনীকান্ত প্রাণের আবেগে উঠিয়া বসিলেন এবং কমলকুমারী দ্বারা লেখনী ও মসি সংগ্রহ করাইয়া আনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট নিজেই একখানা পত্র লিখিলেন। রজনী-কান্তের হাতে পয়সা ছিল না। সুতরাং পত্র বেয়ারিং প্রেরিত হইল। পত্র খানা এইরূপ,—

‘ভাই! তুমি বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছ পর, আমি তোমার কি গিরির নিকট কোন পত্র লিখি নাই। আর লিখিবই বা কি বলিয়া?

কুহকিনীর কুহকজালে মুগ্ধ হইয়া আমি সময় সময় তোমাদের উপর যে পশুবৎ আচরণ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে তোমাদের নিকট পত্র লিখিতেও আমার লজ্জাবোধ হয়। কিন্তু, ভাই, আর সময় নাই। প্রায় মাসাধিক হইল, আমি জ্বর ও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া এখন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি। সংসারের সমস্ত সাধ আমার ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন মৃত্যুভিন্ন আর আমার শান্তি নাই। মরিব, তাহাতে কোন কষ্ট নাই। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তোমাদিগকে দেখিয়া যাইতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। যদি পার, এ সময়ে সকলে মিলিয়া একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিও। তোমাদিগকে দেখিতে পাইলে আমি বড় সুখে মরিতে পারিব। আর তোমরা বাটী পৌঁহুছি-বার পূর্ব্বেই যদি এ ভবলীলা শেষ হইয়া যায়, তবে তোমরা সকলে মিলিয়া প্রাণ খুলিয়া আমাকে ক্ষমা করিও। তোমরা ক্ষমা না করিলে পরকালেও বুঝি, আমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না। আর আমি প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তোমরা সকলে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সতত ধর্ম্মপথে থাকিয়া, সুখে কালাতিবাহিত করিও। ইতি

তোমার

মৃত্যু শয্যায শায়িত হতভাগ্য ভ্রাতা

রজনীকান্ত।'

পত্র যথা সময়ে কাশীতে সুবোধচন্দ্রের বাসায় পৌঁহুছিল। সুবোধ-চন্দ্র এ পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে কোন পত্রাদি প্রাপ্ত হন নাই; অদ্য হঠাৎ তাঁহার চিঠি পাইয়া তিনি নিতান্ত আগ্রহ সহকারে উহা খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন কিন্তু যাহা পড়িলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তিস্ক ঘুরিয়া গেল। লোচন হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া প্রবলবেগে অশ্রু-জল বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি ভগিনীর নিকট

উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দিদি! দিদি! দাদা বুঝি আমাদিগকে ছেড়ে চল্লেন।'

এই বলিয়া সুবোধচন্দ্র গিরিজাসুন্দরীর সম্মুখে উপবেশন করিয়া মুখে কাপড় দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিজাসুন্দরী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন, 'ছিঃ অত অস্থির হয়ো না। কি হয়েছে, খুলে বল।'

সুবোধচন্দ্র ভগিনীর কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার চিঠিখানা তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। গিরিজাসুন্দরী পত্রখানা দুই তিন বার পাঠ করিলেন। রজনীকান্ত তাহাদের উপর যত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, গিরিজাসুন্দরী আজ তাহা ভুলিয়া গেলেন। প্রভাবতী কর্তৃক যে তাঁহার একমাত্র পুত্র নরেন্দ্র অকালে কালগ্রাসে প্রেরিত হইয়াছে, আজ তাহাও তাঁহার মনোমধ্যে স্থান লাভ করিল না। ভগিনী স্নেহের অমৃতময় প্রস্রবণে সহসা গিরিজাসুন্দরীর মনপ্রাণ ভরিয়া গেল। জ্যেষ্ঠভ্রাতার অমঙ্গল আশঙ্কায় আজ তাঁহার কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। গিরিজাসুন্দরী ছল্ ছল্ নেত্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'সুবু! আর মিছে চিন্তা কর্‌লে কি হবে? দাদা, তাঁহার শরীরের অবস্থা যেরূপ লিখেছেন তাহাতে সকাল সকাল বাড়ী না গেলে, দেখ্‌তে পাব কি না সন্দেহ। আর বিলম্ব করো না। যাতে সকাল সকাল বাড়ী পৌঁছিতে পারি, সেইরূপ বন্দোবস্ত কর।'

সুবো। বন্দোবস্ত আর কি কর্ব্ব! আমি বাড়ীওয়ালাকে ডেকে তার পাওনা টাকা পরিষ্কার ক'রে দিয়ে আসি। তোমরা সকলে তাড়াতাড়ি জিনিস পত্রগুলি মোট বেঁধে ফেল। আজকার গাড়ীতেই রওনা হওয়া চাই।

এই বলিয়া সুবোধচন্দ্র একখানা চাদর স্কন্ধে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বাড়ীওয়ালার হিসাব পরিষ্কার করিয়া

ফিরিয়া আসিতে সুবোধচন্দ্রের প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বিলম্ব হইল। সুবোধচন্দ্র বাসায় প্রত্যাগত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতা জিনিস পত্রগুলি সব মোট বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া সকলকে লইয়া সেই দিবসের গাড়ীতেই বাটিকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহারা সকলে বাটী পৌঁছিলেন, এবং যেই গৃহে রজনীকান্ত ছিলেন সকলে মিলিয়া বরাবর সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রজনীকান্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার চেহারা দেখিয়া সুবোধচন্দ্রের শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি 'দাদা! দাদা!' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

কনিষ্ঠভ্রাতার কণ্ঠস্বর রজনীকান্তের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিলেন এবং কনিষ্ঠভ্রাতারদিকে এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া নয়নজলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন। সুবোধচন্দ্রের মনঃকষ্ট সহনাতীত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'দাদা! দাদা! আমার অপরাধ গ্রহণ কর্ব্বেন না। আমি বাড়ী থাকলে আপনার এ দশা হতো না।' রজনীকান্ত এ কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার নিকটে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। সুবোধচন্দ্র সম্মুখে গেলে রজনীকান্ত ধীরে ধীরে আপনার মস্তক তুলিয়া কনিষ্ঠভ্রাতার ক্রোড়ে ন্যস্ত করিলেন। তৎপর নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। সুবোধচন্দ্রও ক্রন্দন করিতেছিলেন। কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ভ্রাতৃস্নেহের পবিত্র অশ্রুবারিতে উভয়ের বসন আর্দ্র হইতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

লোমহর্ষণ ঘটনা।

পরদিবস প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সুবোধচন্দ্র যথোপযুক্তরূপে জ্যেষ্ঠভ্রাতার চিকিৎসায় মনোনিবেশ করিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার পীড়ার যে এ পর্য্যন্ত চিকিৎসা হয় নাই, এবং পথ্যাভাব ও দুশ্চিন্তাতেই যে তাঁহার শরীরের এতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সুবোধচন্দ্র বাটীতে পদার্পণ করিয়াই তাহা অবগত হইয়াছিলেন। সুতরাং এখন তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, এবং যাহাতে তাঁহার মনঃকষ্টের অনেক পরিমাণে লাঘব হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। সুবোধচন্দ্র নিজ ব্যয়ে নিয়মিতরূপে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন এবং উপযুক্ত পথ্যাদির ব্যাবস্থা করিয়া দিলেন। গিরিজাসুন্দরী প্রাণপণে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্নে রজনীকান্তের প্রাণ শীতল হইয়া যাইতে

লাগিল। যে শান্তি রজনীকান্তকে বহুদিন হইল পরিত্যাগ করিয়াছে, রজনীকান্ত আবার তাহা ফিরিয়া পাইলেন এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার পীড়াও একটু একটু উপশম হইয়া আসিতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বাছিয়া বাছিয়া বলকারক ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন। রজনীকান্তের শারীরিক অবস্থা ক্রমেই ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রজনীকান্ত এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন মনে করিয়া সুবোধচন্দ্র ও গিরিজাসুন্দরী প্রভৃতির আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

এদিকে রজনীকান্ত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে না করিতেই প্রভাবতী আবার পূর্ণমাত্রায় নানারূপ অশান্তি সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সুবোধচন্দ্র ও গিরিজাসুন্দরী বাটী হইতে কাশীধামে চলিয়া গেলে, প্রভাবতী তাঁহাদের গৃহ প্রাঙ্গণাদির উপর এক চেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এখন হঠাৎ তাঁহারা আসিয়া উহা অধিকার করিয়া বসাতে প্রভাবতীর গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রভাবতী যদিও রজনীকান্তের দিকে চাহিয়া দেখিতেন না, তথাপি সুবোধচন্দ্র যে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন এবং রজনীকান্তও যে তাঁহাদের স্নেহ ও যত্নে বশীভূত হইতেছেন, প্রভাবতীর তাহা সহ্য হইয়া উঠিল না। ক্রোধে অধীর হইয়া প্রভাবতী, রজনীকান্ত গিরিজাসুন্দরী ও সুবোধচন্দ্রকে পুনরায় বাক্যবাণে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার গলাবাজির বড় বিরাম হইত না। তাহাতে এক দিবস একজন প্রতিবাসিনী চারু-বালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিলা, চারু, বড় বউ আজকাল আবার এত চেচাচ্ছে কেন?'

চারু। ওঁর স্বভাব। বাপ্‌রে, মেয়েমানুষ তো নন, যেন সাক্ষাৎ

ক্ষেমদা সম্মুখে ছিল। সে চারুবালার কথা শুনিতে পাইয়া অমনি দৌড়িয়া গিয়া জননীকে জানাইল। প্রভাবতী কালবিলম্ব না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন এবং চারুবালার উপর গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'কিলা, চারী, তোর মুখে যা আসে, সবাইকে তাই বলছিস্ যে?'

চারু। ব'লে থাকি বেশ করেছি।

প্রভা। কি বল্লি, বেশ করেছিস! তা হ'লে আমিও কেমন বাঘিনী তা দেখে নে।

এই বলিয়া প্রভাবতী চারুবালার কেশ ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। চারুবালা 'মাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চারুবালার চীৎকার শুনিয়া, গিরিজাসুন্দরী ও হেমলতা উভয়েই তাড়াতাড়ি সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রভাবতীর মুষ্টি হইতে চারুবালার কেশ ছাড়াইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভাবতীও সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি তখন চারু-বালার কেশ ছাড়িয়া দিয়া হেমলতার কেশ আকর্ষণ করিলেন এবং সজোরে তাঁহার উদরের উপর গোটাকত লাথী লাগাইয়া দিলেন। হেমলতা সপ্তম মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। লাথীর গুরুতর আঘাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। গিরিজাসুন্দরী 'হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হলো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সুবোধচন্দ্র ও পাড়াপ্রতিবেশিনীরা দৌড়িয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া হেমলতাকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ইহার অর্দ্ধ দণ্ড পর হইতেই হেমলতার রক্তস্রাব হইতে লাগিল এবং সমস্ত দিবারাত্রি অবিরাম রক্তস্রাবের পর,

লিখিতে লজ্জা বোধ হয়, স্মরণ করিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে, অভাগিনী হেমলতার গর্ভপাত হইল। এই ঘটনাতে সুবোধচন্দ্রের মন একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে যেখানে এই ঘটনার বিষয় শুনিতে পাইল সে-ই হাহাকার করিতে লাগিল। দুই দিবস পর হেমলতার জ্ঞান সঞ্চার হইল। ক্রমে তিনি একটু সুস্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। সুবোধচন্দ্র যেন হারানিধি কুড়াইয়া পাইলেন। হেমলতার জীবনরক্ষা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া, তিনি জগদীশ্বরকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে রজনীকান্তের শরীর পুনরায় খারাপ হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রভাবতীর এই ব্যবহারে রজনীকান্তের অবশ হৃদয় আরো অবশ হইয়া পড়িল। দুশ্চিন্তা ও অশান্তি তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় অধিকার করিল। যেই দিবস এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল, সেই দিন হইতে রজনীকান্তের দিবারাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তও সুনিদ্রা হইল না। এবং দু' চারি দিন মধ্যেই তিনি ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শারীরিক অবস্থার হঠাৎ এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুবোধচন্দ্রের আশঙ্কা হইতে লাগিল। তিনি অশেষ প্রকারে তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্বর উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার দু' চারি দিবস পর রজনীকান্তের দস্তুরমত বিকার উপস্থিত হইল। রজনীকান্ত বিকার অবস্থায় প্রলাপ বকিতে লাগিলেন, 'ঐ—ঐ—নিল—নিল—ঐ—ঐ—ঐ—ধর্ ধর্ ধর্। আমার সোনার প্রতিমাকে মেরে খুন কল্লে। সুবু! মার্তো হারামজাদীকে—মার্তো।'

সুবোধচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দাদা!'

রজনী। কে—কে—তোর দাদা?

সুবো। আপনি কি আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না?

রজনী। হাঁ—চিনেছি বই কি!—এইবার ঠিক্ চিনেছি। মায়ের পেটের দুই ভাই। একটি আঁধার, একটি আলো। একজন ধর্ম্ম, আর একজন অধর্ম্মের পূর্ণ অবতার। একজন প্রেতিনীর শ্মশান সহচর, আর একজন পূর্ণলক্ষ্মীর আরাধ্য দেবতা। হাঃ হাঃ হাঃ। এখনো চিনি নি?—চিনেছি বই কি?

সুবো। আপনি ওরূপ বক্‌বেন না। একটু স্থির হউন।

রজনী। কি বল্‌ছিস্?—স্থির হবো! হবো বই কি? আমার মত উন্মত্ত শ্মশানসহচরের দল জীবনে মরণে স্থির না হ'লে প্রেতিনীর তাণ্ডব ক্রীড়া ফুরা'বে কেন? মা লক্ষ্মীই বা একাধিপত্য কেমন ক'রে বিস্তার কর্ব্বেন? হাঁ হাঁ। ঠিক্ বলেছিস্—ঠিক্ বলেছিস্—স্থির হবো। স্থির হবো। একেবারে স্থির হবো।

এই বলিয়া রজনীকান্ত নয়ন মুদ্রিত করিলেন। এবং পর মুহূর্ত্তেই পুনরায় প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন। সুবোধচন্দ্র অনেক প্রকারে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে প্রলাপের আর বিরাম হইল না। এবং সেই দিবস সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই রজনীকান্তের ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কমলকুমারীর পরিণাম

রজনীকান্তের মৃত্যুর সময় যতীশচন্দ্র বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না। সুবোধচন্দ্র তাহাকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য নানাস্থানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু কেহই তাহার কোন অনুসন্ধান পাইল না। অগত্যা সুবোধচন্দ্র গ্রামবাসী কতিপয় আত্মীয় স্বজনকে সঙ্গে করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃতদেহ সৎকারার্থ শ্মশানঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

রজনীকান্তের মৃত্যু হইলে সেনবাড়ীতে আর একটী লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হইল। শাশুড়ীর অত্যাচারে কমলকুমারী পূর্ব্বে অনেক বার আত্মহত্যা করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু পীড়িত শ্বশুরের দিকে চাহিয়া তিনি সে বাসনা কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রজনীকান্তের মৃত্যু হইলে কমলকুমারী আপনার পথ মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের বিষপ্রয়োগে

হত্যা, হেমলতার গর্ভপাত এবং তজ্জনিত শ্বশুরের অকালমৃত্যু, আজ একে একে কমলকুমারীর স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। কমলকুমারী যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই সংসারের প্রতি তাঁহার ঘোরতর বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। পিতার শবদেহ সৎকার করিবার সময়ও যে যতীশচন্দ্র বাটীতে উপস্থিত হইলেন না, তাহা চিন্তা করিয়া কমলকুমারীর বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। স্বামীর চরিত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া, তাঁহার এক মুহূর্ত্তও জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা রহিল না। সেনদের পুকুরপারের অনতিদূরে এক প্রকার বিষফল জন্মিত। কমলকুমারী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন এবং তথা হইতে কতকগুলি বিষফল সংগ্রহ করিয়া, গৃহ অর্গলাবদ্ধ করিয়া ফলগুলি পেষিয়া, এক উৎকট হলাহল প্রস্তুত করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার জন্মের মত স্বামীকে দেখিয়া যাইতে কমলকুমারীর বড়ই সাধ জন্মিল। কিন্তু যতীশচন্দ্র বাটীতে উপস্থিত না থাকায়, তিনি সে সাধ পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা কমলকুমারী স্বামিপদে চিরকালের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিয়া, তাহার নিকট একখানা পত্র লিখিতে বসিলেন। লিখিতে লিখিতে পত্রখানার অনেকস্থল অশ্রুজলে মুছিয়া যাইতে লাগিল। অশ্রুজলে ভাসিয়া কমলকুমারী কোনমতে পত্র সমাধা করিলেন। তৎপর বড় বড় অক্ষরে উহার শিরোনামা লিখিলেন। শিরোনামা লিখিতে কমলকুমারী কতই কাঁদিলেন। কতবার অঞ্চলদ্বারা স্বীয় চক্ষু মুছিলেন। তৎপর বিষের পাত্রটী ক্রোড়ে ধারণ করিয়া যোড়হস্তে ঊর্দ্ধে চাহিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,

'দেবাদিদেব মহাদেব! আমি চিরদুঃখিনী অবলা রমণী। দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিয়া, আজ এই অসমসাহসিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছি; আমায় ক্ষমা করিও, প্রভো! অন্তর্যামিন্, এই জীবনে

অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি কিন্তু আর পারি না। নীলকণ্ঠ! দেখিও যেন অভাগিনীর কপালদোষে এ বিষেরও বিষত্ব লোপ না হয়।'

এই বলিয়া কমলকুমারী নিঃশেষে সমস্ত বিষ পান করিলেন এবং ক্ষণকাল পরেই চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সুবোধচন্দ্র তৎক্ষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শবদেহ লইয়া শ্মশানঘাটে প্রস্থান করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বা বাটীর অন্য কেহই কমলকুমারীর মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিলেন না।

রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় যতীশচন্দ্র নেশায় বিভোর হইয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তখন ক্ষেমদা যাইয়া তাহার নিকট পিতার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কিন্তু যতীশচন্দ্র তাহাতে ভালমন্দ কোন উত্তর না করিয়া বরাবর নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া যতীশচন্দ্র দেখিতে পাইলেন যে, কমলকুমারী স্পন্দহীন অবস্থায় শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শরীরের রঙ্ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যতীশচন্দ্রের মনে ঘোরতর সন্দেহের উদয় হইল। তিনি কমলকুমারীর শরীর ধরিয়া দু' চারিবার খুব জোরে নাড়া দিলেন। তাহাতে মৃতার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। যতীশ-চন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, কমলকুমারীর জীবনবায়ু তাঁহার নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কমলকুমারীর জন্য যতীশচন্দ্রের যদিও বিন্দুমাত্র স্নেহ মমতা বোধ ছিল না, কিন্তু তাঁহার এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি হঠাৎ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং মৃতার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতভাবে একদৃষ্টিতে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কমলকুমারী স্বামীর নিকট যে শেষ চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি ঐ শয্যার উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন। যতীশচন্দ্রের উহার উপর দৃষ্টি পড়িল। তিনি তাড়াতাড়ি ঐ চিঠিখানা তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, উহা

কমলকুমারী তাহার জন্য লিখিয়া রাখিয়াছেন। পত্রখানা এইরূপ,—

"প্রাণেশ্বর!

আমি তোমার নিকট এভাবে পত্র লিখিব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি মন্দভাগিনী—আমার কপাল দোষে শাশুড়ী ননদিনী আমার প্রতি বিরূপ। আমি কি কুক্ষণে তাঁহাদের চক্ষে পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না। আমাকে সর্ব্বদা যন্ত্রণা দিয়া কেন যে তাঁহারা এত সুখী হন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। নাথ! অনেক সহ্য করিয়াছি। জ্বলিয়া জ্বলিয়া হৃদয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর সহ্য করিতে পারি না। তাই আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার মনস্থ করিয়াছি। বিবাহের পর শ্বশুরগৃহে আসিয়া আমি যে ভাবে জীবন কাটাইয়াছি, তাহা তোমাকে লিখিয়া কত জানাইব? প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আমি দাসীর ন্যায় সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, কভু এক সন্ধ্যা আহার করিয়া, কভু বা অনশনে জীবন কাটাইয়াছি। শাশুড়ী ও ননদিনীর কিল লাথী সহ্য করা, আমার নিত্য কার্য্যের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে আমি ভ্রুক্ষেপ করিতাম না। তোমার দিকে চাহিয়া আমি সমস্তই নীরবে সহ্য করিয়াছি এবং সমস্তই নীরবে সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার কপালদোষে তুমিও আমার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। স্বামীই স্ত্রীলোকের যথাসর্ব্বস্ব—স্বামীই স্ত্রীলোকের প্রধান অবলম্বন। সেই স্বামী বিরূপ হইলে স্ত্রীলোক যে কি ভাবে জীবন-ধারণ করে, তাহা আমি তোমাকে কত জানাইব? শাশুড়ী ননদিনীর গঞ্জনা সহ্য করিয়া গৃহে আসিয়া, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তোমার আগমন প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া থাকিয়াও যখন তোমার দর্শন পাই নাই, তখন আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম

হইয়াছে। তুমি যদি আমাকে একটু আদর করিতে, যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিলে, যখন আমি অশ্রুজলে ভাসিতাম, তখন যদি একবার আসিয়া আমাকে "কমল" বলিয়া ডাকিতে, তাহা হইলে নাথ! এ নববয়সে আমি এ জীবন পরিত্যাগ করিতাম না। আমি মরিব, ক্ষতি নাই। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে জন্মের মত আর একবার তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, ইহাই বড় কষ্ট রহিয়া গেল। শ্বশুরের মৃত্যু হইলে যখন তোমাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক গেল, ভাবিলাম তুমি আসিবে কিন্তু তোমাকে পাওয়া গেল না। পিতার শবদেহ সৎকার করিবার সময়ও তুমি উপস্থিত হইলে না দেখিয়া পাড়ার সকলে তোমাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তোমার নিন্দা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল এবং সেই মুহূর্ত্তে আমার জীবনের আশা ভরসা সমস্ত ফুরাইল,—আমি এই দুষ্কর্ম্মের জন্য কৃতসংকল্প হইলাম। হৃদয়রঞ্জন! দুঃখিনীর জীবনসর্ব্বস্ব! আমি চলিলাম। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার শ্রীচরণে একটি অনুরোধ করিয়া যাইতেছি—আমার এই শেষ অনুরোধটি রক্ষা করিও—তুমি ভাল হইও। লোকে যদি বলে, কমল মরিলে কমলের স্বামী ভাল হইয়াছে, এ অধম নারী-দেহ-বিসর্জ্জনে তোমার পরমকল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে, তাহা হইলে পরকালেও বুঝি আমার সুখের সীমা থাকিবে না। আর একটী ভিক্ষা। তুমি কখন বাড়ী আসিয়া আমার মৃত্যু সংবাদ অবগত হইবে জানি না। যখনই অবগত হও, আমাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন আমি সুখিনী হই। আর কমল মরেছে ব'লে তুমি বিন্দুমাত্রও অশ্রু-নিক্ষেপ করিও না। দুঃখিনীর এই অনুরোধটিও রক্ষা করিও। ইতি—

তোমার চিরানুগতা দাসী,

কমলকুমারী।"

যতীশচন্দ্র একবার দুইবার তিনবার পত্রখানা পাঠ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে নানাভাবের উৎস ছুটিল। কমলকুমারী জীবিত থাকিতে যতীশচন্দ্র তাঁহার জন্য এক বিন্দুও অশ্রু নিক্ষেপ করেন নাই। আজ তাঁহার অভাবে যতীশচন্দ্রের দুই নয়ন সহসা অশ্রুজলে ভরিয়া গেল। যতীশচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে পত্নীর শবদেহ বাহিরে আনিলেন। তৎপর তাঁহার বক্ষের উপর লুণ্ঠিত হইয়া দুই হস্তে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া 'কমল! কমল!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যতীশচন্দ্রের ক্রন্দন শুনিয়া গিরিজাসুন্দরী হেমলতা প্রভৃতি সকলেই শঙ্কিত চিত্তে তাড়াতাড়ি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কমলকুমারীর এইরূপ আত্মহত্যার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। পাড়া প্রতিবেসিনীরা তথায় উপস্থিত হইয়া সকলেই 'হায়! হায়!' করিতে লাগিল এবং যাহার মুখে যাহা আসিল তাহাই বলিয়া যতীশচন্দ্র ও প্রভাবতীকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু প্রভাবতী আজ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। উপর্য্যুপরি পতি ও পুত্রবধূর মৃত্যুতে তাঁহার মনোমধ্যে আজ কেমন এক ভাববিপর্য্যয় উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রভাবতী আজীবন পরপীড়ন ও পরের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন। আজ মৃত্যুর পর মৃত্যু, শবের পর শব দর্শন করিয়া হঠাৎ তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। জীবের পরিণাম দর্শন করিয়া ও তৎসঙ্গে স্বকৃতদুষ্কৃতির বিষয় স্মরণ করিয়া প্রভাবতীর সমস্ত শরীর দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একদৃষ্টিতে কমলকুমারীর শবদেহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্মশানক্ষেত্রে সুবোধচন্দ্র শবদেহ-দাহ-করণোপযোগী কাষ্ঠাদি প্রস্তুত করাইয়া কেবল জ্যেষ্ঠভ্রাতার চিতাশয্যা প্রস্তুত করিতে-

ছেন, এমন সময় গিরিজাসুন্দরীর প্রেরিত একজন লোক যাইয়া তাঁহার নিকট কমলকুমারীর আত্মহত্যার বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করাইল। কমলকুমারীর কষ্ট ও যন্ত্রণায় সুবোধচন্দ্র পূর্ব্বাপরই যৎপরোনাস্তি কষ্টানুভব করিতেন। এইক্ষণ তাঁহার এইরূপ অপমৃত্যুতে সুবোধচন্দ্রের হৃদয়ে বড়ই গুরুতর আঘাত লাগিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয় একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে কমলকুমারীর মৃত্যুতে তাঁহার অবশ হৃদয় আরো অবশ হইয়া পড়িল। নিজের বংশের মধ্যে এইরূপ লোমহর্ষণ কলঙ্কপূর্ণ শোচনীয় ঘটনা সকল সংঘটিত হইতে দেখিয়া, সুবোধচন্দ্রের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি স্বীয় বাহুযুগলের মধ্যে বদন লুক্কায়িত করিয়া কেবল অবিরলধারায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু সময় অতিবাহিত হইল। অতঃপর উপস্থিত শ্মশান-বন্ধুদের মধ্য হইতে দুই তিন জন ভদ্রলোক সুবোধচন্দ্রকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া সেনবাড়ী চলিয়া গেলেন এবং কমলকুমারীর শবদেহ যতীশচন্দ্রের বেষ্টন হইতে অতি কষ্টে পৃথক্ করিয়া সৎকারার্থ শ্মশান-ক্ষেত্রে লইয়া চলিলেন। যতীশচন্দ্র 'কমল! কমল!' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিলেন। সেনবাড়ী হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত শ্মশানভূমি ছিল। হেমলতা গিরিজাসুন্দরী প্রভৃতি বাড়ীর মেয়েরাও কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যতীশচন্দ্র 'বাবা! বাবা!' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া একবার পিতার শবদেহের চরণতলে, একবার 'কমল! কমল!' বলিয়া কমলকুমারীর বক্ষের উপর লুটিয়া পড়িতে লাগিলেন। কখন বা 'কাকা! কাকা!' বলিয়া সুবোধচন্দ্রের চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। সুবোধচন্দ্রও ক্রন্দন করিতেছিলেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে

বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হেমলতা ও গিরিজাসুন্দরী কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুখ ফুলাইলেন। সেখানে যত লোক উপস্থিত ছিল, সকলেই এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

এইরূপে, তখন সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সেই ভীতিপূর্ণ শ্মশানক্ষেত্র হইতে এক হৃদয়বিদারক ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়া গগন বিচলিত করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দাহকার্য্য আরম্ভ করা হইল। যতীশচন্দ্র অগ্রে একে একে উভয় শবের মুখাগ্নি করিলেন। তৎপর সুবোধচন্দ্র ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে অগ্নি ধরিয়া উঠিল। উভয় চিতা কিঞ্চিৎ ব্যবধান হইতে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া হু হু শব্দে জ্বলিতে আরম্ভ করিল। সকলেই উদাসপ্রাণে একদৃষ্টিতে সেই শ্মশানবহ্নির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে সাড়াশব্দ নাই। সকলেই নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ। সমস্ত বসুন্ধরাময় তখন একমাত্র দৃশ্য যেন কেবল ঐ শ্মশান।

তৎপর উভয়চিতার বহ্নিরাশি যখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, প্রকৃতির অন্ধকার যখন ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, কর্ম্মময় মানব-জীবন স্বভাবতঃই যখন শবের ন্যায় নিশ্চল নিষ্ক্রিয়,—উষার আলোক-রশ্মি দেখা দিবার যখনও অনেক বাকী,—সেই নিশীথ রজনীতে—সেই বিকট পাপের দাহভূমিতে—সেই ভয়ঙ্কর শ্মশানক্ষেত্রে—সেই পাপপুণ্যের সন্ধিস্থলে—প্রভাবতী উন্মাদিনীবেশে ছুটিয়া আসিয়া, যেখানে দুইটী চিতা পাশাপাশি হইয়া মূর্ত্তিমান অনলরাশি উদ্‌গিরণ করিতেছিল, তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া 'হিঃ হিঃ' রবে অট্টহাসি হাসিয়া উঠিলেন। যতীশ-চন্দ্র 'মা মা' রবে আর্ত্তনাদ করিয়া মায়ের চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া

পড়িলেন। শ্মশানবন্ধুগণ সকলেই একদৃষ্টিতে সেই অনলচিতামধ্যগতা করালিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রভাবতী আজ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। তিনি স্থির অপলক নেত্রে, সেইরূপে শ্মশানানলের মধ্যবর্ত্তিনী থাকিয়া আপনা আপনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তুলসী পাগলিনী এমন সময় কোথা হইতে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া, পশ্চাৎ হইতে প্রভাবতীকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,

'দাউ দাউ দাউ, চিতার অনল
খুব জ্বলেছে সই!
ধূ—ধূ—ধূ, উঠ্‌ছে শিখা,
আকাশ জুড়ে ওই।
সবই লীলা, শক্তির খেলা
রোধ্‌তে, বল, তা,
কেউ পারে না, কেউ পারে না,
হাঃ হাঃ হাঃ।'

অতঃপর শ্মশানানল নির্ব্বাপিত হইল। সকলেই পবিত্র হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু প্রভাবতীর হৃদয়ক্ষেত্রে যে নারকীয় দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইল কি?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু না মুক্তি?

রজনীকান্ত ও কমলকুমারীর মৃত্যুর পর হইতে যতীশচন্দ্র ও প্রভাবতীর জীবননাটকের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইতে আরম্ভ হইল। যতীশচন্দ্র পিতা ও পত্নীর শবদেহ দাহ করিয়া আসিয়া আর কাহারো সহিত বিশেষ বাক্যালাপ করিলেন না। তাহার অপরাধেই যে কমলকুমারী আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাহা তাহার দৃঢ়রূপেই প্রতীতি জন্মিল। যতীশচন্দ্র আজীবন পত্নীর উপর যত উপদ্রব যত অত্যাচার করিয়াছেন, অশ্রুজলে ভাসিয়া তিনি দিবারাত্রি তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। আত্মদুষ্কৃতি ও পশুবৎ ব্যবহারের বিষয় স্মরণ করিয়া যতীশচন্দ্রের নিজের উপর যার পর নাই ঘৃণা ও বিদ্বেষের সঞ্চার হইতে লাগিল। যতীশচন্দ্র যেমন গুরুতর পাপ করিয়াছিলেন, আত্মগ্লানিও তাহার তেমনই অপরিমিত হইল। সুবোধচন্দ্র নিজব্যয়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও কমলকুমারীর শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করাইলেন। যতীশচন্দ্র সেই সময় পর্য্যন্ত কোন মতে বাটীতে অপেক্ষা করিলেন। তৎপর তিনি গৈরিকবসন পরিধান করিয়া কোথায় যে চলিয়া গেলেন, সুবোধচন্দ্র শত চেষ্টা করিয়াও আর তাহার কোন অনুসন্ধান পাইলেন না।

উপর্য্যুপরি সাংসারিক দুর্ঘটনায়, সুবোধচন্দ্রের হৃদয়েও ঘোরতর বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অবশেষে তিনিও, হেমলতা গিরিজা-সুন্দরী ও চারুবালাকে লইয়া পুনরায় কাশীধামে চলিয়া গেলেন। তখন প্রভাবতী স্বীয় তনয়ার সহিত সেই শূন্য পুরীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সুবোধচন্দ্র বাটী হইতে চলিয়া গেলে প্রভাবতীর দুর্গতির পরিসীমা রহিল না। প্রভাবতী যেমন গুরুতর রূপে অপরকে যন্ত্রণা দিয়াছেন, তাঁহার ভোগও তেমনই গুরুতর রূপে আরম্ভ হইল। পতি ও পুত্রবধূর মৃত্যুর পর তিনি কতিপয় দিবস উন্মাদিনীর ন্যায় কখন হাসিয়া, কখন কাঁদিয়া দিন অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার চেহারায় বিশেষ কোন স্থায়ী ভাবপরিবর্ত্তন বা অনুশোচনার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। তাঁহাকে উন্মাদরোগ আশ্রয় করিবে বলিয়া, অনেকেই আশঙ্কা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভাবতীর সেই ভাবটুকু সহজেই সারিয়া গেল এবং তখন হইতে তাঁহার ভোগও রীতিমত আরম্ভ হইল।

মনুষ্যের যখন দুঃসময় উপস্থিত হয়, তখন চতুর্দ্দিক হইতেই বিপদ রাশি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। প্রভাবতী এত যত্নে, এমন কি পীড়িত পতির চিকিৎসা ব্যয় নির্ব্বাহ না করিয়াও যে টাকা কয়টি যক্ষের ধনের ন্যায় পুটলী বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অকস্মাৎ এক দিন রাত্রিযোগে চুরি হইয়া গেল। পতি ও পুত্রবধূর মৃত্যুতে তাঁহার যত না কষ্ট হইয়াছিল, এই টাকাগুলি অপহৃত হওয়ায়, প্রভাবতীর তাহা অপেক্ষাও শতগুণে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। প্রভাবতীর শেষ সম্বল বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহেরও কোন উপায় রহিল না।

গৃহের তামা পিতল কাঁসা বিক্রয় করিয়া প্রভাবতী কতিপয় দিবস উদরান্নের সংস্থান করিলেন। প্রভাবতীর উপর গ্রামের সকলেই

নিতান্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন, সুতরাং এ সময়ে তাঁহাকে কেহ এক মুষ্টি তণ্ডুল ধার দিয়াও সাহায্য করিলেন না। প্রভাবতী চপলকুমারীর নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া কতিপয় দিবস নিজের ও স্বীয় তনয়ার আহারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেও তাঁহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল এবং সেই সময় হইতে তাঁহার অন্নকষ্টও রীতিমত আরম্ভ হইল। সুবোধচন্দ্র প্রভাবতীর টাকা অপহৃত হওয়ার বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। সুতরাং তিনিও প্রভাবতীকে কোনরূপ সাহায্য করিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রভাবতী অন্নের পরিবর্ত্তে নানাপ্রকার শাক সবজী ভক্ষণ করিয়া উদর পূরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দরুণ রক্ত দূষিত হইয়া তাঁহার শরীরে নানারূপ ব্যাধির সঞ্চার হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি ভয়ানক বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন।

এদিকে ভেকার মা আসিয়া প্রভাবতীকে ভেকারামের বিবাহের টাকা দিবার জন্য নানারূপ লাঞ্ছনা দিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে একদিন তাঁহার মুখের উপর সাত পয়জার মারিয়া চলিয়া গেল।

বিনা চিকিৎসায় প্রভাবতীর রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্ষেমদা ভুলেও জননীর প্রতি চাহিয়া দেখিত না। ইহার পর প্রভাবতীর উত্থানশক্তি রহিত হইল। শরীরের নানাস্থানে ক্ষত হইয়া তাহাতে ভয়ানক দুর্গন্ধ উপস্থিত হইল। প্রভাবতী দিবানিশি শয্যায় পড়িয়া রোগযন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। প্রভাবতী জীবনে যত পরপীড়ন ও পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন, আজ একে একে তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। প্রভাবতী স্বকৃতদুষ্কর্ম্মের জন্য এ জীবনে ভুলেও অনুতাপ করেন নাই। আজ দুঃখে পড়িয়া তাঁহার প্রাণ অনুতাপে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথের হত্যা, হেমলতার গর্ভপাত ও কমলকুমারীর আত্মহত্যার বিষয় স্মরণ করিয়া প্রভাবতী একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এক ভয়াবহ হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার কাতরোক্তি ও আর্ত্তনাদে নিতান্ত পাষাণও দ্রবীভূত হইতে লাগিল।

প্রভাবতীকে দেখিবার জন্য গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকেই অনেক সময় উপস্থিত হইতেন, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন না। বরং অনেকেই তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে সন্তোষ লাভ করিতেন। কেহ কেহ বা তাঁহার উপর নানা-রূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না।

একদিবস বেলা দ্বিপ্রহরের সময় প্রভাবতী রোগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছেন, এমন সময় ঝুম্‌কো পিসী ক্রোধে ডগমগ হইয়া আসিয়া প্রভাবতীকে বলিলেন, 'এ তোমার কি রকম আক্কেল বাছা! সারা জীবনটা লোককে জ্বালিয়ে মেরেছ, এখনও তোমার যন্ত্রণায়, কেউ যে চক্ষের পাতা বুজ্‌বে, তার যোটী নাই। তোমাকে স্পষ্ট কথা বলাই ভাল। দিনরাত্রি অত চেঁচাচেঁচি কল্লে, কেউ বরদাস্ত কর্ত্তে পার্ব্বে না!'

প্রভাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'তোমরা আমায় মেরে ফেল গো, তোমরা আমায় মেরে ফেল। আমি আর সহ্য কর্ত্তে পারি না।'

ঝুম। কেন? এখন শোক কেন? এখনও হয়েছে কি? লোককে দগ্ধে মেরেছিস্, তা কি অম্‌নি যাবে—মর্—মর্—পোড়ার-মুখী। জ্বলে পুড়ে মর। মর্-মর্। ধর্ম্ম কি নেই!

সত্য সত্যই ধর্ম্ম আছে। বিধাতার নিরপেক্ষ নিয়মে পুণ্যের পুরস্কার, পাপের দণ্ড আছে। প্রভাবতী সেই ধর্ম্মকে সমস্ত জীবন উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আজ দুঃখে পড়িয়া, ধর্ম্মের সেই

অমোঘ শাসন, তিনি এখন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন, যে পরকে যন্ত্রণা দিতে হইলে নিজেরও যন্ত্রণা পাইতে হয়। পরের হৃদয় লৌহশল্যে বিদ্ধ করিলে, নিজকেও প্রপীড়িত হইতে হয়। পাপ করিলে ইহকালে হউক, পরকালে হউক, একদিন না একদিন, তাহার ফলভোগ করিতে হয়। অন্য সময় হইলে, প্রভাবতী ঝুম্‌কো পিসীর কথার উচিত প্রত্যুত্তর তাহার মুখের উপরই শুনাইয়া দিতেন; কিন্তু আজ সেরূপ কোন কথা প্রভাবতীর মুখ দিয়া বহির্গত হইল না। তিনি কাতরদৃষ্টিতে ঝুম্‌কো পিসীর মুখেরদিকে চাহিয়া রহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে ঝুম্‌কো পিসীর পাষাণহৃদয়েও একটু দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি আর কোনরূপ বাক্যবাণ প্রয়োগ না করিয়া ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় জর্জ্জরীভূত হইয়া অভাগিনীর সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকের সহিতই প্রভাবতীর শত্রুতা বা অসদ্ভাব ছিল। কিন্তু আজ শত্রু মিত্র ভুলিয়া প্রভাবতী যাহাকে পাইলেন, তাঁহার নিকটই কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্বকীয় দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া অকপট হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিবস প্রভাবতী, চপলকুমারীকে তাঁহার শয্যার নিকটে পাইয়া দুই হস্তে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। তৎপর, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'দিদি!—দিদি! আর তো সহ্য কর্ত্তে পারি না। আমার কি উপায় হ'বে? তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা, সতীলক্ষ্মী। আমায় প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কর, 'যেন সকাল সকাল এ যন্ত্রণার শেষ হ'য়ে যায়।'

প্রভাবতীর কাতরোক্তিতে চিরহাস্যময়ী চপলকুমারীও আজ অশ্রু

সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, 'ভগবান্‌কে ডাক, দিদি! তিনিই হৃদয়ে শান্তি-বিধান কর্ব্বেন।'

প্রভা। না দিদি! আমার আর শান্তি নেই। আমি ভ্রূণহত্যা করেছি—শিশুহত্যা করেছি—স্বামিহত্যা করেছি—এমন লক্ষ্মী সোনার প্রতিমাকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে মেরেছি। আমার এ পাপের যে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই, দিদি!'

চপল। কেন থাক্‌বে না? ভগবান্ আর্ত্তের পরিত্রাতা। তাঁর মঙ্গলময় নিয়মে, কেহই চিরকাল কষ্ট ভোগ করে না। তিনিই নিজ ইচ্ছাশক্তিতে পরিচালিত হ'য়ে জীবকে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করেন. আবার তাঁরই অনুকম্পায় জীব উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। তাঁর দীনতারণ নাম কখনো মিথ্যা হ'বার নয়, বোন্!

প্রভা। কিন্তু আমি পাষাণী, ভুলেও যে তাঁর নাম করিনি, দিদি!

চপল। তাই ব'লে কি অহল্যা উদ্ধার হয়নি? তুমি আমি কে দিদি? তিনিই পাষাণী,—তিনিই করুণাময়ী। সর্ব্বত্রই এক শক্তি-চরিত্রের ক্রমিক বিকাশ। যিনি কালী, তিনিই কমলা। যিনি ক্ষেমদা, তিনিই শান্তি। যিনি তমোময়ীভাবে, এ পর্য্যন্ত তোমার হৃদয়মন্দিরে ক্রীড়াময়ী ছিলেন, তিনিই আবার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হবেন। তোমার কান্না ভোগ কখনো নিরর্থক হবে না দিদি! অনুতাপের পবিত্র অশ্রুজলে হৃদয়ের কালিমা ধৌত হ'য়ে গেলে, তাঁরই সচ্চিদানন্দময় নয়নাভিরাম রূপ জেগে উঠ্‌বে।

প্রভাবতী একাগ্রচিত্তে চপলকুমারীর বাক্যাবলী শ্রবণ করিলেন, কিন্তু করুণাময়ীর পবিত্র নাম শুনিয়া আজ তাঁহার হৃদয়ে কেমন একটা আকস্মিক ভীতির সঞ্চার হইতে লাগিল। পাপ যেমন ধর্ম্মের নামে শিহরিয়া উঠে,নরহত্যাকারী ক্রূরপ্রকৃতি অপরাধীর হৃদয়ে যেমন বিচারকের বজ্র-

কঠোর ভাবই জাগিয়া উঠে, প্রভাবতীও তেমনই মায়ের ভয়ঙ্করী ভাব নিরীক্ষণ করিয়া থর থর কম্পিত হইতে লাগিলেন। তিনি তুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে চপলকুমারীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। চপলকুমারী স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অমন ক'রে কি দেখছ ?'

চপলকুমারীর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই প্রভাবতী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'নরক নরক, কেবল নরক। ওই এলো—ওই এলো—আর রক্ষা নাই—আর রক্ষা নাই—কোথা যাই ? কোথা যাই ? যমের কিঙ্কর—যমের কিঙ্কর—লোহার মুদ্গর নিয়ে তেড়ে এলো। আগুনের চক্ষু, আগুনের চক্ষু, কি ভয়ঙ্কর ! কি ভয়ঙ্কর ! ওই—ওই—ওই—কে তোমরা ? নরেন—নরেন—কমল—কমল—মের না -মের না—আমায় মের না। উঃ কি বিষের জ্বালা ! রাক্ষসী আমি—পিশাচী আমি, আমায় ছেড়ে যাও। ওকি ! ওকি ! আবার ওকি ! রক্তের—নদী—রক্তের—নদী—তারি—উপর—মৃত শিশুমুণ্ড-ভেসে যাচ্ছে—ভেসে যাচ্ছে—কেবল ভেসে যাচ্ছে। উঃ কি ভীষণ—কি ভয়ানক - হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ, হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ —

চপলকুমারী বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভাবতী জীবনে যত অপকর্ম্ম করিয়াছেন এবং তজ্জনিত যে পাপ, যে ভয় অলক্ষিত ভাবে এতদিন তাঁহার আত্মার অন্ধতম অন্তস্তলে লুকায়িত ছিল, আজ জীবন মরণের সন্ধিস্থলে, সেই সমস্ত ভয়ের ভাবগুলি, উহার চরম পরিণতি স্বরূপ, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, একে একে তাঁহার হৃদয়দর্পণে জাগিয়া উঠিতেছে এবং তদ্দরুণ জীবিতাবস্থায়ই তাঁহার নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে। প্রভাবতীর অবস্থা দেখিয়া চপলকুমারীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া লইয়া ভগিনীর মত স্নেহে, তুই হস্তে প্রভাবতীকে নিজবক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। তৎপর বলিলেন, 'ভয় কি দিদি

আমার! ভয় কি? এই ভয়ের গ্রাম পার হ'তে পাল্লে'ই অভয়ার গ্রামে পৌছিবে। এই অস্থির. চঞ্চল, ভীতিভাবের মূর্ত্তিগুলি, ক্রমে ক্রমে —এক অক্ষর—এক রূপে বিলীন হ'লেই, উদ্ভাসিত জ্ঞানরশ্মিপ্রদীপ্ত সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী মায়ের সেই স্থির সৌদামিনী মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌বে। সেই বীজময়ী, স্বররূপা, চৈতন্যময়ী অভয়া মা আমার, ভয় ও দুঃখের শেষ মুহূর্ত্তে—আবার একাক্ষরে এক অচঞ্চল শান্তিময়ীভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রে বিরূপে স্বরূপ হ'য়ে তোমার হৃদয়মন্দির আলোকিত কর্ব্বেন।'

প্রভা। না—না—না। আমার রক্ষা নাই—রক্ষা নাই। ওই এলো—ওই এলো। ধর—ধর—ধর। রক্ষা কর—রক্ষা কর।

চপলকুমারী প্রভাবতীকে সান্ত্বনা দিতে আরো অনেক প্রকারে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভয়ের সেই মূর্ত্তিমান বিভুতিগুলি আর কিছুতেই তাঁর হৃদয় হইতে অপসারিত হইল না। এবং সেই সময় হইতে আত্মকৃত পাপের বিকট জ্বালাময় নারকীয় বিভীষিকাগুলি নিরীক্ষণ করিয়া প্রভাবতী উদ্ভ্রান্ত হতাশ চিত্তে কেবল হাহাকার করিয়া আপনার পাপের উপযুক্ত কর্ম্মফল ভোগ করিতে লাগিলেন। এবং এইরূপে, প্রভাবতীর পাপের অতি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত হইতে লাগিল।

অবশেষে দীর্ঘকাল এইরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, প্রভাবতী একাকিনী অসহায় অবস্থায় সেই গৃহমধ্যে পচিয়া গলিয়া মরিয়া রহিলেন।

তবে, যাও প্রভাবতি! ইহকালে দুর্গতির একশেষ ভোগ করিলে। পরকালে কর্ম্মফল অবসানে চৈতন্যময়ী মায়ের স্বরূপে এক হ'য়ে, বিরাজ কর।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

-ঃ০ঃ-

মহা-প্রস্থান।

প্রভাবতীর মৃত্যু হইলে সুবোধচন্দ্র সকলকে লইয়া পুনরায় বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তখন সেনদের সেই শ্মশানসদৃশ শূন্যপুরী আবার হেমলতার পাদস্পর্শে নূতন শ্রীসম্পদে পূর্ণ হইতে লাগিল।

অতঃপর সুবোধচন্দ্র ভগিনীর নির্দ্দেশক্রমে দেশে কোন শিক্ষিত-সদ্বংশজাত একটী পাত্রের সহিত চারুবালার বিবাহ দিলেন এবং নব-দম্পতীকে নিত্য নূতন আমোদে মত্ত রাখিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে,হেমলতা একটী সুকুমার পুত্র প্রসব করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহাদের সকলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। গিরিজাসুন্দরী ও চারুবালা আদর করিয়া, কখনো আঁধার ঘরের মানিক, কখনো সাত রাজার ধন, কখনো বা নন্দদুলাল বলিয়া শিশুটিকে নিত্য নূতন আখ্যায় অভিহিত করিতে লাগিলেন। চারুবালা প্রায় সর্ব্বদাই শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া রাখিতেন। নবনীত সদৃশ সুকুমার পুত্রের

সদাহাস্যময় প্রফুল্ল বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়া সুবোধচন্দ্রের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় স্নেহের সঞ্চার হইতে লাগিল। তাঁহার আঁধার সংসারে কে যেন সহসা আলো জ্বালিয়া দিল। সুবোধচন্দ্র নূতন আশা নূতন উৎসাহ বুকে লইয়া সংসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্ষেমদা সুবোধচন্দ্রের সংসারে প্রতিপালিতা হইতে লাগিল। হেমলতার সংসর্গে থাকিয়া তাহার স্বভাবেরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল।

বিবাহের আর কোন আশা ভরসা নাই দেখিয়া, ভেকারাম অনেকদিন পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তৎপর সে বাবাজি সাজিয়া একটা আখ্ড়া খুলিবার মনস্থ করিতে লাগিল। চপলকুমারী তাঁহার আদুরে স্বামী শ্যামসুন্দরকে লইয়া সুখে জীবনাতিবাহিত করিয়া উপযুক্ত সময়ে স্বামিপদে মস্তক রাখিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। চপলকুমারীর মৃত্যু হইলে, বৃদ্ধ ক্ষণকাল অনিমেষলোচনে মৃতা পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপর অঃ হঃ হঃ হঃ হঃ রবে আপনার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া প্রিয়তমার শবদেহের উপর লুটিয়া পড়িলেন। সকলে চাহিয়া দেখিল এবং দেখিয়া শুনিয়া সকলেই বুঝিল যে বৃদ্ধের প্রাণপাখী সেই সঙ্গে উড়িয়া গিয়াছে।

পরিশিষ্ট।

সারস্বত-মন্দির।

বিষ্ণুপুর হইতে চলিয়া আসিয়া যতীশচন্দ্র নিতান্ত উদাসীনের ন্যায় দেশের নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে অশান্তি অনল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা আর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইল না। আত্ম-দুষ্কৃতি ও পাপের স্মৃতি তাঁহাকে দিনরাত্রি এতই দগ্ধ করিতে লাগিল, যে তিনি আর মুহূর্ত্তের জন্যও মনকে সুস্থির করিতে পারিলেন না। যতীশচন্দ্র কত তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইলেন কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া তিনি হিন্দুর পবিত্র তীর্থ ৺ কাশীধামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যাকাল। ৺কাশীধামে বাবার পবিত্র মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। ধূপ ধূনার পবিত্র গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিক্ হইতে নরনারীগণ ভক্তিভরে বাবার আরতি দর্শন করিতেছেন। হর হর বম্ বম্ শব্দে সে দেবনিকেতন

প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কেহ বাবার বন্দনাগীতি গাইতেছেন, কেহ স্তব পাঠ করিতেছেন—কেহ ধ্যানস্থ হইয়া নিমীলিত নেত্রে সংসার কোলাহল ভুলিয়া যাইতেছেন। কি অপূর্ব্ব ভাব! যে পাপী সেও বাবার সায়ংকালীন আরতি দর্শনে ভক্তিরসে আপ্লুত হইতেছে—যে নির্ম্মম, যে ক্রূর, সেও প্রেমরসে অভিষিক্ত হইতেছে—যে সংসারী, সেও মুহূর্ত্তের জন্য সংসার কোলাহল ভুলিয়া যাইয়া এক স্বর্গীয়ভাবে বিভোর হইতেছে।

যতীশচন্দ্র মন্দিরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলেন; কিন্তু তাহার হৃদয়ে আজ বিন্দুমাত্রও ভক্তিরসের সঞ্চার হইল না। তিনি শান্তির আশায় দেবতার চরণে প্রণাম করিলেন, অমনি কমলকুমারীর বিমলিন মুখচ্ছবি তাঁহার হৃদয়দর্পণে জাগিয়া উঠিল—তিনি দেবাদিদেব আশুতোষের সদাশিবভাব ধ্যান করিতে প্রয়াস পাইলেন, অমনি হেমলতার গর্ভপাত, নরেন্দ্রনাথের হত্যা প্রভৃতি প্রভাবতীকৃত লোকভয়ঙ্কর চিত্রগুলি তাঁহার হৃদয়মন্দিরে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। যতীশচন্দ্র কত প্রকারে কত কি চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে জ্বালার কিছুতেই উপশম হইল না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া পূতসলিলা ভাগীরথী গর্ভে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া সকল জ্বালার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি তথা হইতে বহির্গত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাশীর নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে গলির পর গলি—রাস্তার পর রাস্তা অতিবাহিত করিয়া, অবশেষে প্রায় শেষ রজনীযোগে হিন্দুর সেই মহাতীর্থ দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

হায়! এই কি সেই দশাশ্বমেধ! যে স্থানের সহিত কতপুণ্যময়

স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে, দেশপূজ্য লোকবিশ্রুত মহাপুরুষদের কত অক্ষয় কীর্ত্তি, কত পবিত্রকাহিনী,—যে স্থানের সহিত অবিভাজ্যরূপে গ্রথিত রহিয়াছে, পুণ্যশ্লোক রাজা হরিশ্চন্দ্র যে মহাতীর্থে মহাসাধনাফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন—কতযোগী ঋষির মুক্ত আত্মা, যে স্থানে উপস্থিত থাকিয়া, নিয়ত সংসারশ্মশানানলদগ্ধ জীবকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছে। গঙ্গা কুলু কুলু নাদে প্রেমের লহর তুলিয়া যে স্থানের কীর্ত্তি-মহিমা দেশ দেশান্তরে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছে, হায়! এই কি সেই দশাশ্বমেধ? আর গঙ্গে! তুমিও কি ধূর্জ্জটীশিরোবিহারিণী সেই গঙ্গাপ্রবাহিনী?

যতীশচন্দ্র নদী সৈকতে দণ্ডায়মান হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গঙ্গার সেই ফেনিল তরঙ্গরাশির দিকে চাহিয়া রহিলেন। উপরে অসংখ্য নক্ষত্রখচিত নীল নভোমণ্ডল, সম্মুখে ভাগীরথীর এই উচ্ছ্বসিত সলিল রাশি। কি প্রাণারাম মনোমদ সৌন্দর্য্য। কিন্তু এ সৌন্দর্য্যে আজ যতীশচন্দ্রের মন মুগ্ধ হইল না। তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে যে অশান্তি অনল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা সমভাবেই তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে ঘাটের সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া জলের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং গঙ্গা-গর্ভে দেহবিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু যতীশচন্দ্র সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে, দুর হইতে এক ব্রহ্মচারী তাহার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া স্বীয় বাহুযুগলদ্বারা পশ্চাৎ হইতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। তৎপর স্নেহভরে বলিলেন, 'বাবা! আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যায় কাহারও অধিকার নাই।'

যতীশচন্দ্র তখন মৃত্যুর জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তাঁহার চিত্ত তখন উদ্ভ্রান্ত। হঠাৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া

ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, 'কে আপনি মহাপুরুষ? আমাকে ছেড়ে দিন্—ছেড়ে দিন্। আমাকে স্পর্শ ক'রে আপনার দেবশরীর কলুষিত কর্ব্বেন না। আমি ঘোরতর পাপী, নরাধম। পাপভার বৃদ্ধি কর্ব্বার জন্যই আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আমার পাপের পরিসীমা নাই। আমি সংসারের শত্রু— মনুষ্য সমাজের শত্রু—জগতের শত্রু। পাপের প্রজ্বলিত অনলশিখায় আমি জ্বলে পু'ড়ে মর্ছি,—তাই পূত-সলিলা ভাগীরথীগর্ভে এ দেহ বিসর্জ্জন দিয়া, সকল যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ কর্ব্বার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছি। আমায় ছেড়ে দিন্—ছেড়ে দিন্,—

ব্রহ্মচারী স্নেহবিজড়িতকণ্ঠে বলিলেন,'আর আত্মহত্যা করিলেই কি সে যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে? বাবা! পাপ কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক করে না, আর কেহই সমাজের চিরশত্রু নহে এবং কেহদ্বারাই অনন্তকাল সমাজের বিচ্ছেদ বা অকল্যাণ সংসাধিত হয় না। যে ব্যক্তি বা যে হৃদয় হিংসা, দ্বেষ ও অধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল থাকিয়া, সমাজশরীরে কলহ বিচ্ছেদ আনয়ন করে, নিয়তিচক্রে তাহাই আবার প্রীতি ও ভালবাসার নন্দনকাননে পরিণত হইয়া, সমাজকে এক অচ্ছেদ্য প্রেমের-মিলনে সঞ্জীবিত করিবার সহায়তা করে। কাল যে দস্যু ছিল, আজ সে ঋষি। কাল যে শোণিতপিপাসু নরশার্দ্দূল ছিল, আজ সে মহাত্যাগী সাধু। বৎস! অধীর হইওনা, মুহূর্ত্তের জন্য আমার আশ্রমে চল,তারপর আত্মহত্যা করিতে হয় করিও,আমি বাধা দিবনা।'

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী যতীশচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীর গম্ভীর প্রশান্তমূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, যতীশচন্দ্র একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় বিনাবাক্য ব্যয়ে, সেই মহা-

পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা নগর ছাড়িয়া এক উপবন-বাটিকার মধ্যে প্রবেশ করিলে, ব্রহ্মচারী পুনরায় বলিলেন, ‘বাবা! ইহকালেই এ জীবনের পরিসমাপ্তি হয় না। পরকালেও জীব, স্বকীয় শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া . । সুতরাং যন্ত্রণা লাঘবার্থ আত্মহত্যা করলে, জীবের ক্লেশ কোন অংশেই উপশমিত হয় না। বরং উহা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হই· থাকে। আর,—যে মৃত্যু, মুহূর্ত্ত-মধ্যেই তোমাকে আশ্রয় করিবে, তজ্জন্য আত্মহত্যা করাও কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।’

যতীশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর বাক্যার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইবে বলিয়া যে ব্রহ্মচারী ইঙ্গিত করিলেন, তদর্থও তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, অথচ এরূপ সংসার-বিরাগী মহাপুরুষ যে তাহাকে মিথ্যা বাক্‌চাতুর্য্যে আশ্বাসিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, সেই বিশ্বাসও তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল না। ব্রহ্মচারী, তাহার মনোগত বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ বলিলেন, বাবা! সন্দিহান হইও না। ‘যাহা বলি নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ কর। এ জীবন বস্তুতই মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী এবং বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, সকলকেই ঐ মুহূর্ত্তকালমধ্যে মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হইবে। বৎস! যাহা একের নিকট বৃহৎ, তাহাই অপরের নিকট ক্ষুদ্র। এক শত টাকা, দরিদ্রের নিকট কুবেরের ধন, কিন্তু তাহাই আবার ক্রোড়-পতি ধনীর নিকট অতি সামান্য। যে অলস, নিষ্ক্রিয়, তাঁহার নিকট যে সময় খুব দীর্ঘ; কর্ম্মঠ ও কর্ম্মবীরদিগের নিকট, সেই সময়ই আবার অতিক্ষুদ্র বলিয়া অনুভূত হয়। একের সময় যাইতে চাহে না—অপরে সময় খুঁজিয়া পান না। সুতরাং যে বড়, যে কর্ম্মঠ, তাঁহার ধারণায় যাহা ক্ষুদ্র; যে ক্ষুদ্র, তাহাই আবার তাঁহার ধারণায় অতি বৃহৎ।

আমরা চক্ষুর উপর দেখিতেছি, পিপীলিকাদি কত ক্ষুদ্রপ্রাণী, কতশত ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ, মুহূর্ত্তমধ্যে জন্মিতেছে, মুহূর্ত্তমধ্যে ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কার্য্যটুকু নির্ব্বাহ করিতেছে এবং ঐ মুহূর্ত্তমধ্যে মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু আমরা যাহা মুহূর্ত্ত বলিয়া অনুভব করিতেছি—উহারা ক্ষুদ্র, তাই উহারা উহাদের জীবনকে দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া ধারণা করিতেছে। আবার, আমরা যাহা বৃহৎ বলিয়া ধারণা করি. যাহারা আমাদের মধ্যে সমধিক ধারণাশক্তি সম্পন্ন, তাহারাই আবাব উহাকে ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণ বলিয়া ধারণা করেন। সুতরাং যে যত বড়, যাহার ধারণাশক্তি যত অধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে তাঁহার সময তদনুপাতে তাঁহার নিকট ততোধিক সংকীর্ণ বলিয়া অনুভূত হয়। আমাদের তুলনায় প্রজাপতি ব্রহ্মা অনেকগুণ ধারণা-শক্তিসম্পন্ন, তাই নরের ষাইট হাজার বৎসরে প্রজাপতি ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত। এইরূপে স্বকীয় ধারণাশক্তির প্রসরণ দ্বারা যিনি জীবনের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী কালকে এইরূপ মুহূর্ত্ত বলিয়া ধারণা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার জন্ম মৃত্যুতে ব্যবধান থাকে না,—পাপপুণ্য এক হইয়া যায়—তিনি সুখে আত্মহারা হন না, দুঃখেও অধীর হন না—তিনি সর্ব্বকর্ম্মে লিপ্ত থাকিযাও অনাসক্ত এবং তিনিই ধীর, তিনিই স্থির—তিনিই জিতেন্দ্রিয়। বৎস! এইরূপে. ধারণাশক্তিবৃদ্ধিদ্বারা জন্ম মৃত্যুতে একভাবাপন্ন হও—হৃদয শান্ত হইবে—আত্মহত্যার আর কোনই আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য সমস্তই এক বিরাট মিলনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।'

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী স্নেহভরে দুই হস্ত দ্বারা যতীশচন্দ্রকে নিজ বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। সেই চন্দনচর্চ্চিত সুগন্ধযুক্ত পূতশরীর স্পর্শে যতীশচন্দ্রের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিলেন, 'দেব! আমি অধম, নগণ্য কীটানুকীট। আমি ক্ষুদ্র হইয়া কিপ্রকারে জন্ম মৃত্যুতে সমভাবাপন্ন হইব? আর কি প্রকারেই বা নিজকে বিরাট-মিলনে প্রতিষ্ঠিত করিব?

ব্রহ্ম। যাঁহাদের ধ্যানধারণা করিবার শক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে—যাঁহারা মিলনগ্রামের অগ্রবর্ত্তী পথিক; তাঁহাদের প্রাণে প্রাণ মিশাও; ভাষার সাহায্যে তাঁহাদের ভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে যত্নবান্ হও।

কমলকুমারীর শোচনীয় পরিণাম হইতে যদিও যতীশচন্দ্রের বিবেকবুদ্ধি অনেকটা মার্জ্জিত হইয়া আসিতেছিল, তথাপি ভাষার সাহায্যে পরকীয় হৃদয়ের ভাব ধারণা করতঃ কিরূপে ধারণাশক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে—কি প্রকারে পাপী প্রেমের মিলন-মন্দিরে মিলিত হইতে পারে, তাহা তিনি তখনও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচারী তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বাবা! ইংরেজীতে একটা কথা আছে ('Man's appearance is but an index of his heart' অর্থাৎ) মনুষ্যের চেহারা তাহার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব মাত্র।' কথাটা বস্তুতঃই বড় ঠিক। উহা জ্ঞানীর কথা, প্রবীণের কথা, মানব জীবনের গভীরতম রহস্যবিদ্ পণ্ডিতের কথা। মনুষ্য কখনও ঈর্ষায় জ্বলিতেছে, ক্রোধে স্ফুরিত হইতেছে, প্রেমে বিগলিত হইতেছে, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতেছে; আর ঐ ঈর্ষা, ক্রোধ, প্রেম, লজ্জা যেন তাহার সমস্ত শরীর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এইরূপে, তুমি ভাবিতেছ, আমি ভাবিতেছি, লক্ষ লক্ষ লোকে লক্ষ লক্ষ রূপে ভাবনা করিতেছে, আর ঐ ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাবনাগুলি প্রত্যেকের অন্তরের প্রতিবিম্ব লইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি বা রূপে পর্য্যবসিত হইতেছে। এই হৃদয়গত পার্থক্য ও বাহিরের আকৃতির

বৈষম্যই আমার আমিত্ব, তোমার তুমিত্ব ও অপরাপরের ব্যক্তিত্ব। মনুষ্যের এই ব্যক্তিত্ব যে শক্তি দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাই তাঁহার স্বরশক্তি, মন্ত্রশক্তি বা বাক্‌শক্তি এবং তাহারই সাঙ্কেতিক নাম ভাষা।*

এ ভাষার সম্যক্ আলোচনা ধারণাশক্তি বর্দ্ধিত করে, পতিতকে উদ্ধার করে, মূর্খকে পণ্ডিত করে, অসাধুকে সাধু করে, আঁধারকে আলোক করে, নরককে স্বর্গ করে, শত্রুকে মিত্র করে। এ শক্তিমন্ত্র জপ করিতে করিতে দস্যু প্রেমিক হয়, আপন বিকাইয়া যায়, প্রতিষ্ঠার বিসর্জ্জন হয়, ধীর শান্ত প্রাণ মধুর মিলনরসে ভাসিতে থাকে। সে মিলন প্রাণের মিলন—ভাবের মিলন—জ্ঞান ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব প্রেমের মিলন—কখনো রাধাকৃষ্ণের মধুর মিলন—কখনো কৃষ্ণার্জ্জুনের আনন্দ মিলন—কখনও বা হরহরির ভৈরবমধুর মহামহাসম্মিলন। এই যে আমরা ভাষার সাহায্যে আমাদের হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করি, ইহার ব্যক্ত বা স্বরের কার্য্যটুকু ছাড়িয়া দিলে, অব্যক্ত বা অক্ষর বা রূপ কেবল স্থান জুড়িয়া থাকে, শক্তির ক্রীড়া নির্জীব হইয়া আসে, লয় আসিয়া অধিষ্ঠিত হয়। আবার যেই উহাতে স্বর সংযোজিত হইল, অমনি অব্যক্ত ব্যক্ত হইয়া পড়িল—শক্তির ক্রীড়া চলিতে লাগিল—হৃদয়ে ভাবের উৎস ছুটিল—একের হৃদয়, অপরের হৃদয়ের সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল—একের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব অপরের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল—একের প্রেমে অপরে প্রেমিক সাজিল, একের ক্রোধে অপরে ক্রোধান্বিত হইল, একের অশ্রুতে অপরের নয়নে শ্রাবণের ধারা বহিল,—প্রাণে প্রাণে এক সুর বাজিয়া উঠিল—ধারণা-

* The Shabda-Brahman assumes in the body of man the form of the Devi Kundalini, and as such is in all *prani* (breathing creatures), and in the shape of letters appears in prose and verse. (Hon'ble Sir John Woodroffe's *Introduction on Tantra of the great liberation.*)

শক্তি ক্রমে বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল—প্রাচ্য ভাবের সহিত পাশ্চাত্য ভাব মিলিত হইয়া এক নবশক্তির সঞ্চার হইল।

এইরূপে, অন্তর্জ্ঞান ও বহির্জ্ঞান লইয়া প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে—ভারতে ও ইংলণ্ডে—পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ের সহিত মিশিয়া যাইয়া এক বিরাট পূর্ণভাবের (বা Grand Etre বা Collective life এর) মিলন করিতে লাগিল,— মায়ের সারস্বত-শক্তির পূজা আরম্ভ হইল।

এস বৎস! এস পাপী, এস পতিত, এস ক্ষুদ্র, এস বিরাটের অংশ,—এই মায়ের ভাষায় সুর লাগাও; ভাবময়ী মূর্ত্তিমতী হইবে—তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে বিরাটহৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমার ক্ষুদ্রত্বের অবসান করিবে।

ঐ শুন মা ভারতী বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া, ভারতের মহাসারস্বত-মিলন মন্দিরে সকলকে সমবেত হইবার জন্য আকুল প্রাণে আহ্বান কর্চ্ছেন। মায়ের বীণার সে ঝঙ্কার শুনিয়া, ঐ দেখ পিককুল কুহরিয়া উঠিল, দয়েল আপন মনে তান ধরিল, দিক্‌বধূগণ মনের উল্লাসে আকাশমার্গে উড়িয়া চলিল, মধুকর কাননরাজি মুখরিত করিয়া নূতন বসন্তের আগমনবার্ত্তা জানাইল, উষা রজত থালায় সুবর্ণ মুকুট লইয়া প্রকৃতির মস্তকে পরাইতে গেল। প্রকৃতিদেবী হাতে ধরিয়া তাহাই আবার উষার মস্তকে পরাইয়া দিলেন।”

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী সেই নবারুণকিরণে যতীশচন্দ্রকে লইয়া প্রভাতমারুতহিল্লোলিত বিবিধবিহঙ্গকূজনকূজিত মায়ের সারস্বত মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দ্বার উদ্ঘাটিত রহিল।

সম্পূর্ণ।